সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশ ২



লেখক

থোমাস হোয়াং

থোমাস হোয়াং হচ্ছেন এন্টিয়ক মিশনস ইন্টারন্যাশনাল (এমি) এর প্রতিষ্ঠাতা। এমি এমন এক আন্তর্জাতিক মিশন সংস্থা, যা "১০/৪০ জানালা" বলে পরিচিত অঞ্চলে যাদের কাছে প্রভু যীশুর সুসমাচার পৌঁছে নাই, তাদের কাছে তাঁরই সুসমাচার পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমি সংস্থার মধ্যে রয়েছে এমি কলেজ এন্ড সেমিনারী, যা বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে ২৫ টা দেশের ৬,০০০ এরও বেশী নেতাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। থোমাস হোয়াং এখন পর্যন্ত ১৫ টা বই লিখেছেন, যেগুলো নেপালী, বার্মিজ, হোমং, কাচিন, শান, লিসু, ইংরেজী, রাশিয়ান, কম্বোডিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান, হিন্দি, বাংলা, লাও, ভিয়েতনামী, স্পেনিশ, চীনা ও জাপানী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং ৬ লক্ষেরও বেশী বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক পাশ করেন। অতঃপর, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পড়াশোনার জন্য তিনি আমেরিকা যান এবং মিসিগান স্টেটস ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শুরু করেন। পরে তিনি পিট্‌সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ ও পরে এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন। আমেরিকা ও কানাডায় একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে নিয়োজিত থাকাকালে তিনি প্রভুর পরিচর্যা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। পরে তিনি টিন্ডাল ইউনিভার্সিটি কলেজ এন্ড সেমিনারীতে পড়াশোনা করে এম,ডিভ ডিগ্রী লাভ করেন এবং কানাডার টোরোন্টো ও অন্টারিও সহ আমেরিকার ইলনয়ের ডেয়ারফিল্ডের ট্রিনিটি ইভানজেলিক্যাল ডিভিনিটি স্কুল থেকে পি,এইচ,ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।
পরবর্তীতে তিনি কানাডার ইভানজেলিক্যাল ফেলোশিপের (E.F.C) একজন সাধারণ কাউন্সিল সদস্য হিসাবে কাজ শুরু করেন এবং টিন্ডাল ইউনিভার্সিটি কলেজ এন্ড সেমিনারীতে প্রফেসর ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেন। তিনি যখন আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের নেয়াকে এ্যালাইয়েন্স থিয়োলজিক্যাল সেমিনারীতে একজন প্রফেসর হিসাবে কাজ করছিলেন, তখন ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জিসিওডাব্লিউই'৯৫ (GCOWE'95) নামের একটি সংগঠনের নির্বাহী হিসাবে নির্বাচিত হন। অতঃপর, তিনি দক্ষিণ কোরিয়াতে বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচার সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরে তার প্রতিষ্ঠিত এন্টিয়ক মিশনস ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোরিয়াতে স্থানান্তর করেন এবং সুসমাচার মিশন কাজ সক্রিয়ভাবে শুরু করেন।

এখন তিনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন মিশন বিষয়ে দক্ষ, এমি মন্ডলীর সিনিয়র পাস্টর, ২৫টা দেশে এমি ইন্টারন্যাশনাল মিনিস্ট্রির নেতৃত্বদানকারী ও একজন আত্মিক নেতা হিসাবে সুপরিচিত। তার লেখা ঈশতাত্ত্বিক বইগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমি কলেজ এন্ড সেমিনারীতে পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই বইটি ভাষান্তর করতে ও সম্পাদনা করতে যারা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিশ্বাস করি, তাদের এই পরিশ্রমের ফল বাইবেল শিক্ষার্থী এবং খ্রীষ্টিয়ান সমাজ ও মন্ডলীতে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশ ২

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশক : আলফ্রেড সুবীর দে
এমি বাংলাদেশ ট্রাস্ট
সাভার, ঢাকা
ই-মেইলঃ amibangla@outlook.com / Website: amiglobalbangla.net

লেখক : থোমাস হোয়াং
অনুবাদ ও সম্পাদনা : আলফ্রেড সুবীর দে
নকশা : গ্লোরিয়া জাং-ওন পার্ক
চিত্রাংকন : রিদিয়া যু-মি হং
প্রচ্ছদ : কেলি খিয়ং-মি শিন
মুদ্রণ :

শুধুমাত্র বিনামূল্যে সীমিত বিতরণের জন্য

WHAT IS THE PURPOSE OF CREATION?

The Seed of Woman 2

First Printing : December 2017

Publisher : Alfred Subir Dey
AMI Bangladesh Trust
: Savar, Dhaka
: E-mail: amibangla@outlook.com / Website: amiglobalbangla.net

Author : Thomas Hwang
Translation & Editing : Alfred Subir Dey
Design : Gloria Jung-Won Park
Illustration : Rydia Ju-Mi Hong
Cover Design : Kelly Kyoung-Mi Shin
Printer :

Only for Limited Free Distribution

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশ ২

থোমাস হোয়াং

এমি পাবলিকেশন

বিষয়বস্তু

পূর্বসূত্র

প্রথম অধ্যায়

খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে ঈশ্বর

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

পূর্ব সূত্র

এই বইটি মূলত আমার লেখা “সকল ধর্মের যাত্রা শুরু” (The Origin of Religions) বইটির পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে। সকল ধর্মের যাত্রা শুরু বইটিতে আমি আলোচনা করেছি কিভাবে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ক্রমাগতভাবে বাবিলীয় ধর্ম থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং আজকের দিনের ধর্মীয় বহুত্ববাদে উন্নীত হয়েছে। সকল ধর্মের যাত্রা শুরু বইটিতে একটা প্রশ্ন আমাকে উল্লেখ করতে হয়েছে– কেন খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম অন্যান্য ধর্মগুলোর পাশাপাশি প্রতিযোগীতামূলক সহাবস্থান করছে? বাইবেলের দৃষ্টিকোণে তা আসলে কি পূর্ব-নির্দিষ্ট? ঈশ্বর যদি অন্যান্য ধর্মগুলোর উদ্ভব পূর্ব-নির্দিষ্ট করে থাকেন, তাহলে কিভাবে তাদের যাত্রা শুরু হয় ও এক ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে।

“সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি,” এই নতুন বইটিতে তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা **খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর** সম্পর্কে পড়াশোনা করব। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম মূলত এক ঈশ্বরবাদ ধর্ম। যিহূদী ও ইসলাম ধর্মও দাবী করে থাকে, তারাও একেশ্বরবাদী। আমি এও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব কেন এই তিন ধর্ম একে অন্যের চেয়ে আলাদা। খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর হচ্ছেন ত্রিত্ব ঈশ্বর। ত্রিত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা যীশুর সাথে পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করব।

প্রাথমিক যুগের মন্ডলীতে ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কিত খ্রীষ্টিয়ান মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুব সহজ ছিল না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়ে আমরা দেখব কিভাবে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচয় নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ অনেকবার আক্রমণ হয়েছিল। বিশেষ করে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা অর্থাৎ যীশু সম্পর্কে বেশ কিছু ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল। চতুর্থ শতকে পাঁচটি মন্ডলী অঞ্চলের খ্রীষ্টিয়ান নেতারা ত্রিত্ব মতবাদ, খ্রীষ্টতত্ত্ব, পবিত্র আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমরা দেখতে চেষ্টা করব কিভাবে এই মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এই সব মতবাদ প্রক্রিয়ার ধাপ ও সিদ্ধান্তগুলো কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অথবা আর্থিক লাভের জন্য মানুষের তৈরী মন্ডলীগুলোতে গৃহিত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু ত্রিত্ব ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্য (যিশাইয় ৪৩:৭, ২১ দ্রষ্টব্য) জানা ও বোঝার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পালন করা, শিক্ষা দেওয়া এবং প্রচার করার মধ্য দিয়ে তা কার্যকর হয়েছিল। সব খ্রীষ্টিয়ানদেরই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করা উচিত। এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে গিয়ে আমি বিশদভাবে নির্দেশনা দিতে চেষ্টা করেছি– কিভাবে আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে পারি।

খ্রীষ্টিয়ান পাঠক-পাঠিকাদের এই বিষয় সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করার লক্ষ্যে আমি এই বইয়ে যতদূর সম্ভব এই বিষয়ের উদাহরণ পবিত্র বাইবেল থেকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। সকলের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার জন্য আমি এই বই লিখিনি। আমি এও নিশ্চিত জানি, সুসমাচার কেন্দ্রিক খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেও এমন অনেক পালক, প্রচারক, ঈশতত্ত্ববিদ পাঠক-পাঠিকা আছেন, যারা এই বইটির বিষয়বস্তু পড়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না। কিন্তু আমি এও জানি– এমন অনেকে আছেন যারা এই বই পড়ে খ্রীষ্টিয়ানদের ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিষয়ে নতুন চেতনা লাভ করবেন। আমি প্রার্থনা করি, এই শেষ সময়ের আত্মিক দুর্নীতির সময়কালে এই বইটি “লবণ” এবং “আলো” সদৃশ হবে, যেন প্রভু যীশুর নিখাঁদ সত্যতা বুঝে অনেকেই তাঁর কাছে এগিয়ে আসে।

ফেব্রুয়ারী ২০১৭
থোমাস হোয়াং

“তুমি কি বিশ্বাস কর না, আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন? যে সব কথা আমি তোমাদের বলি তা আমি নিজে থেকে বলি না, কিন্তু পিতা, যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনিই তাঁর কাজ করছেন।” (যোহন ১৪:১০ পদ)

খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে ঈশ্বর

প্রথম অধ্যায়

এক
ভূমিকা

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম এক ও একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে। যারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের সাথে অনেক দিন ধরে জড়িত তাদের কাছে এই কথা অপরিচিত নয়। তবুও এই জগতে অনেক লোকই আছেন যারা হাজার হাজার বছর ধরে বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আসছে। এই লোকদের কাছে আমরা যখন খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের কথা প্রচার করি, আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি যে, তারা খুব সহজে এক ঈশ্বরবাদ ধারণা বুঝে উঠতে পারে না; যা আসলে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের সবচেয়ে মৌলিক মতবাদ।

তাদের কাছে তিন ঈশ্বরবাদ প্রচার করা আমাদের জন্য খুবই কঠিন। সবচেয়ে কঠিন, যখন অনেক খ্রীষ্টিয়ান ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না। যেহেতু তারা ঈশ্বরকে ভালভাবে জানে না, তাই তারা সুসমাচার (সুখবর) প্রচার করতে যে শক্তি দরকার তা পায় না। তাদের পক্ষে তাদের বিশ্বাস ধরে রাখা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যখন তাদের সামনে নানারকম ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাস প্রকাশ হতে থাকে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রকৃত পরিচয় এবং ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় জানাই হচ্ছে আমাদের খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসের ভিত্তি। এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যেন তাদের খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাস খাঁটি হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে একেশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদের সংজ্ঞা এবং তাদের পার্থক্য সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব। তাছাড়াও, দেখব কেন ইসলাম, যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবার এও আলোচনা করব, খ্রীষ্টিয়ানদের ত্রিত্ব ঈশ্বরকে এবং কিভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তা বাইবেলের ভিত্তিতে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত।

দুই
খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের পরিচয়

ক) এক ঈশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদ

এই জগতে অনেক ধর্ম আছে এবং উপাসনা করার জন্য প্রত্যেক ধর্মের নিজের নিজের ঈশ্বর আছেন। আধুনিক ধর্মগুলোকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তা হচ্ছে– একেশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদ। সংজ্ঞা অনুসারে, বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম অনেক ঈশ্বরকে বা অনেক দেব-দেবতাকে বিশ্বাস করে এবং এই জগতের প্রায় অধিকাংশ ধর্ম এই শ্রেণীতে ধরা যায়। অন্যদিকে, একেশ্বরবাদী ধর্ম মূলত একজন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং যিহূদী, খ্রীষ্টিয়ান ও ইসলাম ধর্মকেও এই শ্রেণীতে ধরা যায়।

আজকাল অনেক ধর্ম রয়েছে, যাদের বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম বলা হয়। তাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, লোকজ ধর্ম, কনফুসিয়ান মতবাদ, শিন্টো মতবাদ, শিখ মতবাদ, জোরেয়াস্ত্র মতবাদ ইত্যাদি। এই সব ধর্মকে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম বলা হয়। এই সব ধর্মে তাদের প্রতিটি শ্রেণী, সমাজ ও সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়াও, বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মে জড় ও প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে প্রাণের আরোপ করা বা সর্বপ্রাণবাদের অস্তিত্ব রয়েছে। সর্বপ্রাণবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস, যেখানে বলা হয় জগতের সকল বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। উদাহরণ হিসাবে, সর্বপ্রাণবাদে দাবী করা হয়– গাছ, পাথর, উদ্ভিদ, পশু, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদির মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। এই দাবীকে নতুন চিন্তা-চেতনায় আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে– প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর (অথবা, আত্মা) আছে। এই ধারণাকে বলা হয় "নতুন যুগের আন্দোলন" এবং এই আন্দোলনে মানুষকে দেব-দেবী মনে করা হয় ও এরই ভিত্তিতে বলা হয়, মানুষও দেব-দেবতা বা ঈশ্বর হতে পারে।

নতুন যুগের অনুসারীরা আরও বিশ্বাস করে যে, এই যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি, এমন কি বিশ্বব্রহ্মান্ড হচ্ছে ঈশ্বর। তদুপরি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে– যেহেতু এই পৃথিবীর সব কিছুই বিশ্বব্রহ্মান্ডের অংশ, তাই সব কিছুই এক একটি ঈশ্বর। নতুন যুগের আন্দোলনের এই ধরনের বিশ্বাসের দাবীকে বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)।

বহু ঈশ্বরবাদ যেমন অনেক ঈশ্বরকে বা দেব-দেবতাকে বিশ্বাস করে, তেমনি করে একেশ্বরবাদ ধর্ম এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। যিহূদী ধর্ম, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মকে একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আবার, এই তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্ম একই ধর্মীয় পটভূমিকা থেকে গৃহীত হয়েছে। সেজন্য যে কেউই এটা ভেবে ভুল করতে পারে– এই তিন ধর্মই একই ঈশ্বরের উপাসনা করে।

	বহু ঈশ্বরবাদ	এক ঈশ্বরবাদ
তাদের বিশ্বাস	অনেক ঈশ্বর বা দেব-দেবতা	এক ঈশ্বর
ধর্মমত	লোকজ ধর্ম, সামান মতবাদ, কনফুসিয়ান মতবাদ, তাও মতবাদ, শিন্টো মতবাদ, বৌদ্ধ মতবাদ, হিন্দু মতবাদ, জোরেয়াস্ত্র মতবাদ, শিখ মতবাদ, নতুন যুগের আন্দোলন	যিহূদী ধর্ম খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম ইসলাম ধর্ম

তালিকা ১-১ : এক ঈশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদের তুলনা

বিশেষ করে, যে লোকেরা এই তিনটি এক ঈশ্বরবাদী ধর্মকে বিশ্বাস করে, তারা সাধারণভাবে অব্রাহামের বংশের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। যিহূদীরা অব্রাহামের প্রথম স্ত্রী সারার ছেলে ইস্‌হাকের বংশোদ্ভূত। মুসলমানেরা অব্রাহামের উপস্ত্রী হাগারের ছেলে ইশ্মায়েলের বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে, খ্রীষ্টিয়ানেরা হচ্ছে অব্রাহামের আত্মিক বংশোদ্ভূত বা নিয়মের সন্তান (রোমীয় ৯:৮; গালাতীয় ৪:২৮ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা সকলেই যেহেতু অব্রাহামের বংশের ধারাবাহিকতায় এসেছে, এজন্য তিন ধর্মের সকলেরই শাস্ত্রের চরিত্রগুলো, ঘটনাবলী এবং জড়িত সকল কাহিনীগুলো আংশিকভাবে একইরকম।
যার ফলে, বেশ অনেক লোকই মনে করে থাকে, খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর, যিহূদীদের ঈশ্বর এবং মুসলমানদের ঈশ্বর একই, অথবা প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয়– তিন ধর্মের ঈশ্বর সম্পূর্ণ আলাদা। আবার, খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর, যিহূদীদের ঈশ্বর এবং মুসলমানদের ঈশ্বরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য অবশ্যই আমাদের সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

খ) খ্রীষ্টিয়ান ও ইসলাম ধর্মের পার্থক্য

কোরাণ শরিফে এমন অনেক উদ্ধৃতি আছে যা বাইবেলের সাথে প্রায় ৭০-৮০ ভাগ মিলে যায়। পুরাতন নিয়মের অনেক চরিত্র ও ঘটনাবলী কোরাণে দেখতে পাওয়া যায়, যা অন্যভাবে বা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। যদিও বাইবেলের পুরাতন নিয়ম কোরাণের অনেক আগে লেখা হয়েছে, তবু মুসলমানেরা দাবী করে থাকে, বাইবেল বিকৃত করা হয়েছে, মশীহ হিসাবে যীশু ব্যর্থ, কোরাণ সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য, হজরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তারা যাকে বিশ্বাস করে থাকেন, সেই আল্লাহ্ হচ্ছেন একমাত্র সত্য ঈশ্বর।

আমরা যদি ইসলাম ধর্ম উত্থানের পটভূমি বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, তাদের এই দাবী প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। হজরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তার ধর্মের ঈশ্বরের নাম দেন আল্লাহ। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের মুসলমান বলা হয়।

ইসলাম পূর্ব আরবকে বলা হয় জাহেলিয়া যুগ। এই সময় বনু কুরাইজার পৌরহিত্যে সর্বপ্রথম মক্কার কাবাঘরে দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করা হয়। কাবাঘরের সর্বপ্রধান দেবতার নাম ছিল হোবাল (হুবাল) এবং তার তিন কন্যা লাত, মানাত ও উজ্জাহ। এছাড়াও, প্রাক ইসলামী যুগে দক্ষিণ আরবের স্বাধীন রাজ্যগুলোতে সূর্য ও চন্দ্র ও তারকা দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। বাবিলীয় ধর্মের প্রভাবে তখনকার আরব সমাজ বাবিলীয় তিন দেবতা সূর্য, চন্দ্র ও তারাকে অন্য সব দেব-দেবতার মূর্তির চেয়ে উঁচু মনে করা হোত। পরবর্তীতে, আরবী ভাষার হোবাল (হুবাল) নামটিরও পরিবর্তন ঘটে (যা বাবিলীয় ধর্মের চন্দ্র ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত)। অতঃপর, এই নামেরও পরিবর্তন হয়ে আল্লাহ্ নাম প্রচলিত হয়, যার মানে "একজন ঈশ্বর"। হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাবার নাম ছিল আব্দুল্লাহ (আব্দ-আল-আল্লাহ্ মানে আল্লাহ্‌র চাকর বা ক্রীতদাস)। এটা অবশ্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মেরও অনেক আগে থেকেই আরবে এক ঈশ্বরের উপাসনা চলে আসছিল। যারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, তাদের বলা হোত হানিফ সম্প্রদায়। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হজরত মুহাম্মদ (সা.) বহু ঈশ্বরবাদ প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হিসাবে আল্লাহ্ নামটি গ্রহণ করেন।

ইসলাম ধর্মে বাঁকা চাঁদকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই কারণে আজকের দিনেও সকল ইসলামী অনুষ্ঠানে এবং উপাসনার স্থানে (মসজিদে) বাঁকা চাঁদের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। আবার ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে জড় বস্তুর পূজা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। তখনকার বেদুইনেরা গাছ, কুয়া, পাথর ও গুহাকেও পবিত্র বলে মনে করত। আজও ইসলাম ধর্মে পাথর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ইসলাম ধর্ম খুব গোঁড়া একেশ্বরবাদী ধর্ম দাবী করলেও ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে, ইসলাম-পূর্ব কোন কোন প্রথা ও সংস্কৃতি তাদের আচার-অনুষ্ঠানে থেকে গেছে। তবে, খ্রীষ্টিয়ান বা যিহূদী ধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা ঢুকে পড়লেও আজ তা ভুল বলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান ও যিহূদীদের কাছে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

গ) খ্রীষ্টিয়ান ও যিহূদী ধর্মের পার্থক্য

খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর হচ্ছেন ত্রিত্ব ঈশ্বর। ইংরেজীতে Tri হচ্ছে ত্রিত্বের (Trinity) তিন এবং nity মানে unity বা ঐক্য। অর্থাৎ ত্রিত্ব মানে, ঈশ্বরের তিন সত্তা- পিতা ঈশ্বর (প্রথম সত্তা), পুত্র ঈশ্বর (দ্বিতীয় সত্তা) এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর (তৃতীয় সত্তা) মিলে এক ঈশ্বর।

খ্রীষ্টিয়ানদের মত যিহূদী মতবাদ ত্রিত্ববাদ স্বীকার করে না, কিন্তু তারা পিতা ঈশ্বরকে তাদের ঈশ্বর বলে স্বীকার করে থাকে। বলা হয়ে থাকে, যিহূদী ধর্ম অব্রাহাম (২১৬৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রেক্ষীতে বলা হয়ে থাকে, অব্রাহাম যিহূদী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন নাই, কিন্তু অব্রাহামের বংশধরেরা, যারা যিহূদী ধর্ম অনুসরণ করত তারা তাকে প্রতিষ্ঠাতা (আদি পিতা) বলে সম্মান করে থাকে। অন্যদিকে, বাইবেল অনুসারে অব্রাহামকে শুধুমাত্র যিহূদীদের জন্য নয়, কিন্তু সকল জাতিকে আশীর্বাদ করতে ও সুসমাচারের মধ্য দিয়ে উদ্ধার করতে নিয়োগ দেওয়া হয় (সমস্ত জাতির জন্য: আদিপুস্তক ১২:২-৩; ১৮:১৮; ২২:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

যিহূদীদের ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের পিতা ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। সেজন্য, যিহূদীরা খ্রীষ্টিয়ানদের পিতা ঈশ্বরকে তাদের ঈশ্বর বলে স্বীকার করে, কিন্তু তারা পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। যখন যীশু ঘোষণা দিলেন যে, তিনি ঈশ্বর পুত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা, তখন যিহূদীরা দৃঢ়ভাবে তাঁর এই দাবী অস্বীকার করে। যিহূদীরা শুধুমাত্র পিতা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, কিন্তু যীশু দাবী করলেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ৩:১৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং তিনি ও তাঁর পিতা এক (যোহন ১০:৩০ পদ দ্রষ্টব্য)।

তাই, যিহূদীরা যীশুর ঘোষণাকে তাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দা বলে ধরে নিয়েছিল (মথি ২৬:৬৫-৬৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা যীশুকে ধর্ম নিন্দুক বলে দোষী করেছিল। ধর্ম নিন্দা এক ধরনের পাপ, যা দশ আজ্ঞার তৃতীয় আজ্ঞায় (যাত্রাপুস্তক ২০:৭ পদ দ্রষ্টব্য) বলা হয়েছে, “কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের নাম নেবে না... ...।”

পুরাতন নিয়মের আইন-কানুন অনুসারে, এই আদেশ দেওয়া আছে– যদি কেউ এই পাপ করে, তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে (লেবীয় ২৪:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। এই কারণে, মহাপুরোহিত কাইয়াফা যীশুকে মৃত্যুর শাস্তি দিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন (মথি ২৬:৬৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং পরে তারা (যিহূদীরা) তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল; অথচ তিনি ছিলেন ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা (মথি ২৭:৩৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

	ইসলাম ধর্ম	যিহূদী ধর্ম	খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম
ঈশ্বর	আল্লাহ্	পিতা ঈশ্বর	ত্রিত্ব ঈশ্বর
প্রতিষ্ঠাতা	হজরত মুহাম্মদ (সা.)	অব্রাহাম	যীশু খ্রীষ্ট
বিশ্বাসী	মুসলমান	যিহূদী	খ্রীষ্টিয়ান
যীশু	স্বীকার করে না	স্বীকার করে না	উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায়

তালিকা ১-২: ইসলাম, যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের তুলনা

তিন
ঈশ্বরের ত্রিত্ব

ত্রিত্ব শব্দটি বাইবেলে পাওয়া যায় না। ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টানটিনেপলের মহাসভায় এই বিষয়ে ঈশতাত্ত্বিক মতবাদ গৃহিত হয়। প্রথম শতাব্দীর প্রাথমিক মন্ডলীগুলোকে ত্রিত্ববাদের ধারণা নিয়ে ভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলো ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে। এই আক্রমণ ততদিন পর্যন্ত চলেছে, যতদিন পর্যন্ত না ত্রিত্ব মতবাদ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে, ত্রিত্ববাদের ধারণার সাথে একেশ্বরবাদ ধারণার কিছুটা হলেও অমিল দেখা যায়। তাই যে ভ্রান্ত ধর্মমত শুধুমাত্র পিতা ঈশ্বরকে স্বীকার করে, সেই ধর্মমত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে প্রতি উত্তর দেবার লক্ষ্যে পাঁচ মন্ডলী অঞ্চলের বিশপেরা তদানীন্তন গ্রীসের রাজধানী কনস্টাটিনেপলে মিলিত হন এবং "ত্রিত্ব" নামে ঈশতাত্ত্বিক এই শব্দ চয়ন ও "ত্রিত্ব মতবাদ" প্রতিষ্ঠা করেন [এই প্রসংগে দুই অধ্যায়ে "ত্রিত্ব মতবাদের প্রতিষ্ঠা" বিষয়ে উদ্ধৃতি উল্লেখ্য]।

বাইবেল এই নিশ্চয়তা দেয় যে, প্রাথমিক যুগের মন্ডলীর প্রেরিত্দের ত্রিত্ব বিষয়ে নিখুঁত ধারণা ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২ করিন্থীয় ১৩:১৩ পদে প্রেরিত্ পৌল করিন্থীয় মন্ডলীর কাছে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার যোগাযোগ-সম্বন্ধ তোমাদের সকলের অন্তরে থাকুক।" শুধু যে প্রেরিত্ পৌল বলেছেন তা-ই নয়, প্রেরিত্ যোহন ও প্রেরিত্ পিতরের লেখা এবং নতুন নিয়মের অন্যান্য লেখকেরা ও শিষ্যেরা, যারা বিশ্বাসী হিসাবে সংখ্যায় খুবই কম তারাও ত্রিত্ব ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন (মথি ২৮:১৯; ৩:১৬-১৭; মার্ক ১:৯-১১ পদ দ্রষ্টব্য) এবং বিশ্বাসে জীবন-যাপন করেছেন।

শুধু যে নতুন নিয়মে ত্রিত্ববাদের প্রমাণ রয়েছে তা-ই নয়; আমাদের আত্মিক চোখ খুলে আমরা যদি সমগ্র পুরাতন নিয়ম পর্যালোচনা করি, তাহলে সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়ে ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রমাণ দেখতে পাই (আদিপুস্তক ১:১, ২৬; যিশাইয় ৬:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে ধারণা পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আদিপুস্তক ১:১ পদে ত্রিত্ব ঈশ্বরের কথা মূল হিব্রু ভাষায় "এলোহিম" লেখা আছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ লেখা হয়েছে ঈশ্বর। এখানে এলোহ্ মানে ঈশ্বর এবং "ইম" বলতে মূল শব্দের বহুবচন বুঝায়। সেক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে "এলোহিম" মানে অনেক ঈশ্বর বুঝায়। যাইহোক, এক অতুলনীয় উপায়ে এই বহুবচনকে কর্তৃপদ বা উদ্দেশ্য পদ ও এক বচনের ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতেই ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

আজকের খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে ত্রিত্ব ঈশ্বরকে বোঝা খুব একটা সহজ বিষয় নয়। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ মানবিক যুক্তি ও জ্ঞানে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রকৃতি বুঝতে পারি না। সেজন্য, ত্রিত্ববাদ বুঝতে হলে পবিত্র আত্মার সুনিশ্চিত পরিচালনা একান্তই প্রয়োজন।



তালিকা ১-৩: ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন সত্তার একে অন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক

ক) তিন ঈশ্বর

খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের ঈশ্বর একই ঈশ্বর, কিন্তু তিনি নিজেকে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হিসাবে প্রকাশ করেছেন। এই একই ঈশ্বরের মধ্যে তিন ব্যক্তিসত্তা রয়েছে, যারা একে অন্যের মধ্যে অবস্থান করেন। এই তিন ব্যক্তিসত্তার একে অন্যের সহাবস্থানকে গ্রীক ভাষায় পেরিকোরেসিস (Perikoresis) শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে। পিতা ঈশ্বরের মধ্যে পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর অবস্থান করেন; পুত্র ঈশ্বরের মধ্যে পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর অবস্থান করেন এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর অবস্থান করেন। তারা প্রত্যেকেই একে অন্যের প্রতি নত-নম্র, শ্রদ্ধাশীল এবং একে অন্যকে সবচেয়ে উঁচুতে তুলে ধরেন। তাদের একে অন্যের সাথে প্রগাঢ় ভালবাসার সম্পর্ক (Koinonia) ও ঘনিষ্ঠ সহভাগিতা রয়েছে এবং তারা একে অন্যের পরিচর্যাও করেন (Diakonia)।

ত্রিত্ব ঈশ্বর হচ্ছেন এক ঈশ্বরের পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ রূপ, কিন্তু এই তিন ব্যক্তিসত্তার কাজ ভিন্ন ভিন্ন। আমরা এই তিন ব্যক্তিসত্তাকে তাদের কাজ বা কাজের ধরন দেখে বুঝতে সক্ষম হই, যেমন– পিতা ঈশ্বর হচ্ছেন পরিকল্পনাকারী, পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন নির্বাহী বা কার্য সম্পাদনকারী এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হচ্ছেন ক্ষমতা বা শক্তি প্রদানকারী।

ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তা এক সাথেই কাজ করেন। ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তা একা একা কাজ করেন না। এখানেই ত্রিত্ব ঈশ্বরের ঐক্য ও একে অন্যের সমবায়ী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আদমের পতনের পর ত্রিত্ব ঈশ্বর মানুষ জাতিকে উদ্ধারের জন্য একটা সভা ডাকলেন। তখন পিতা ঈশ্বর সভাপতির ভূমিকায় থেকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। পুত্র ঈশ্বর মানুষের সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষীতে (আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ দ্রষ্টব্য) সভার সিদ্ধান্ত পালন করতে রাজি হলেন। আর পবিত্র আত্মা ঈশ্বর এই দায়িত্ব পালনের জন্য পুত্র ঈশ্বরকে ক্ষমতা বা শক্তি প্রদান করলেন।

যদিও পিতা ঈশ্বর সভাপতির ভূমিকায়, তবু তার মানে এই নয় যে, পিতা ঈশ্বর অন্য দুজনের চেয়ে উঁচু পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রত্যেকেই একই মান সম্পন্ন, একই কর্তৃত্ব ও পদ মর্যাদা সম্পন্ন, একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সমৃদ্ধ এবং সিদ্ধান্ত নিতে তারা প্রত্যেকেই সম অধিকার সম্পন্ন। একই রীতি-নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে তাঁরা সিদ্ধান্ত কার্যকর করে থাকেন।

খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর ত্রিত্ব ঈশ্বরের একজন এবং তিন ব্যক্তিসত্তার একত্র থাকা, পারস্পরিক সহভাগিতা ও পারস্পরিক কাজে একে অপরের কাছে আদর্শ। কার্য সম্পাদনে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা একে অন্যের প্রতি সমবায়ী মনোভাব প্রদর্শন করে থাকেন। এইভাবে, খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর আমাদের যুক্তিরও বাইরে এক রহস্যময় ঈশ্বর। উল্লেখিত তালিকা ১-৩ পর্যন্ত ত্রিত্ব ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে ব্যাখ্যা করা হল।

খ) ত্রিত্ব ঈশ্বরের গতিশীল সম্পর্ক

ত্রিত্ব ঈশ্বর হচ্ছেন গতিশীল। এই তিন ব্যক্তিসত্তা– পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর ভালবাসার সম্পর্কেও এক ও অভিন্ন। তারা একে অন্যকে সম্মান করেন, একে অন্যের সম্পর্কে সাক্ষ্য এবং তাদের ভালবাসার ভিত্তিতে একে অন্যকে উঁচুতে তুলে ধরেন। এই ত্রয়ী সত্তা মানুষের মধ্যে তাদের গতিশীল সম্পর্ক প্রকাশ করেন। বিশেষ করে, খ্রীষ্টিয়ান মতবাদের ভিত্তিতে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের মধ্যে এই গতিশীল সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ এই সম্পর্ক বুঝতে না পারে, তাহলে তার পক্ষে বাইবেলের শিক্ষা সঠিকভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

১) যীশু ও পিতা ঈশ্বর এক (Hen)

পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। বাইবেল এই বিষয়ে নানাভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছে। যেমন- যীশু নিজের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, "আমি ও পিতা এক" (যোহন ১০:৩০ পদ)। গ্রীক "হেন" (Hen) শব্দ নতুন নিয়মের মূল ভাষায় "এক" বুঝিয়েছে, যার মানে পুত্র ঈশ্বর ও পিতা ঈশ্বর সমমানের পদমর্যাদা প্রাপ্ত, গুণে ও মানে সম্পূর্ণভাবে এক ও অভিন্ন।

আবার অন্যদিকে, গালাতীয় ৩:২৮ পদে লেখা আছে, "যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে, দাস ও স্বাধীন লোকদের মধ্যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, কারণ খ্রীষ্ট যীশুর সংগে যুক্ত হয়ে তোমরা সবাই এক হয়েছ।" এই পদে গ্রীক শব্দ "হেইস" (Heis) মানেও "এক" বুঝায়। এই শব্দ দিয়ে ঠিক অভিন্ন এক বুঝায় না, কিন্তু আইনগতভাবে একই ব্যক্তির বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও চেহারা-ছবি চিহ্নিত করে।

সে কারণে, বুৎপত্তিগত বা মৌলিক অর্থে "হেন" (Hen) এবং "হেইস" (Heis) বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু যীশু যখন উল্লেখ করেছেন, তিনি ও তাঁর পিতা এক, তখন তিনি বলতে চেয়েছেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা বুৎপত্তিগত বা মৌলিকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে এক ও অভিন্ন, যদিও প্রত্যেকেরই আলাদা ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। নীচের তালিকাতে (তালিকা ১-৪) এই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

এক	হেন (যোহন ১০:৩০)	হেইস (গালাতীয় ৩:২৮)
পদমর্যাদা গুণ-বৈশিষ্ট্য গুণ-মান	সমান	আলাদা
সম্পর্ক	পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর	যারা খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত

তালিকা ১-৪: হেন এবং হেইস এর তফাৎ

২) ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যীশু খ্রীষ্ট

বাইবেল সাক্ষ্য দেয়, যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র (মথি ৩:১৭; ১৬:১৬ এবং ১৭:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। এই সম্পর্ক মানব সমাজের পিতা ও পুত্রের সাধারণ সম্পর্কের চেয়ে আলাদা। বাইবেলে যখন পুত্র শব্দটি বলা হয়ে থাকে তখন গ্রীক ভাষায় হুইয়স (Huios) শব্দ ব্যবহার করা হয় (ইংরেজীতে বড় হাতের 'এইচ' ব্যবহার করা হয়)। এই শব্দের মানে হচ্ছে "একই (ব্যক্তি)"। তার মানে পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন পদমর্যাদা, গুণ-বৈশিষ্ট্যে ও গুণ-মানে এক এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের কোন পার্থক্য নেই, তবে শুধুমাত্র ত্রিত্বের ব্যক্তিসত্তায় তাদের পার্থক্য রয়েছে। অন্যভাবে বলতে হয়, পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন **প্রভু যীশুর মানবীয় প্রকাশ**।

অন্যদিকে, রোমীয় ৮:১৪ পদে পুত্র শব্দটির বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন- "কারণ যারা ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনায় চলে তারাই ঈশ্বরের সন্তান।" এই পদে গ্রীক ভাষায় বহুবচন বোধক সন্তান শব্দটি "হুইয়স" (huios) বলা হয়েছে (কিন্তু সবই ছোট হাতের অক্ষরে লেখা)। এখানে সন্তান শব্দ দিয়ে ঈশ্বরের পুত্র যীশুকে বলা হয় নাই; বরং এই পদে যীশুর দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত সকল খ্রীষ্টিয়ানকে ঈশ্বরের দত্তক পুত্র বলা হয়েছে।

৩) যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন মনুষ্যপুত্র

যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র হিসাবে বিবৃতি দিয়েছেন। ইংরেজীতে বড় হাতের প্রথম অক্ষর দিয়ে বাইবেলে মনুষ্যপুত্র বা the Son of Man বলা হয়েছে। এভাবে বলার অর্থ, "যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন", "তিনি মনুষ্য সমতুল্য" (যোহন ৩:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। এখানেই যীশুর সত্যিকার মানবীয় প্রকাশ। তিনি নিজে স্বভাবজাতভাবে ঈশ্বর হয়েও পিতা ঈশ্বরের সমান না ভেবে নিজেকে শূন্য করলেন [গ্রীক শব্দ কেনো-ও (Keno)], তার মানে– তিনি তাঁর ঈশ্বরীয় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে খাঁটি মানবিক স্বভাব প্রকাশ করলেন (ফিলিপীয় ২:৫-৭ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য অতি নম্রভাবে তাঁকে "মনুষ্যপুত্র" বলে অভিহিত করা হয়।

পিতা ঈশ্বর এবং যীশু মৌলিকভাবে একই। তাদের দুজনেরই একই ক্ষমতা ও পদমর্যাদা। কিন্তু পিতা ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্কের কারণে তিনি নিজেকে নত করে বললেন যে, পিতা ঈশ্বর তাঁকে এই জগতে পাঠিয়েছেন। যোহন ৮:৪২ পদে যীশু নিজেই এ কথা বলেছেন, "সত্যিই যদি ঈশ্বর আপনাদের পিতা হতেন তবে আপনারা আমাকে ভালবাসতেন, কারণ আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি আর এখন আপনাদের মধ্যে আছি। আমি নিজ থেকে আসি নি, কিন্তু তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।" এক্ষেত্রে আমরা হয়তোবা ভুল বুঝতে পারি যে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে যীশু পিতা ঈশ্বরের চেয়ে সম্পর্কে নীচে। তবে এটা অবশ্য আমাদের বুঝতে হবে, যীশু পিতা ঈশ্বরকে উঁচুতে তুলে ধরার জন্য ও সম্মান দেখানোর জন্যই এইভাবে কথা বলেছেন।

যীশু এও বলেছেন, শুধু যে তিনিই পিতা ঈশ্বরকে সম্মান দেখিয়েছেন তা-ই নয়, কিন্তু পিতা ঈশ্বরও তাঁর মধ্য দিয়েই পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন (যোহন ১৪:১৬, ২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তা একে অন্যের সাথে সক্রিয় সম্পর্ক বজায় রেখেই নম্রভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আরও দেখতে পাই যে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তা একে অন্যের সাথে সহভাগিতা (কৈননীয়া) বজায় রেখে তাদের পরিচর্যা কাজ (দিয়াকনিয়া) করে যাচ্ছেন।

৪) যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন একজাত পুত্র

তাছাড়াও, বাইবেলে যীশুকে একজাত পুত্র (একমাত্র পুত্র) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শব্দটি মূলত ইংরেজিতে ONLY BEGOTTEN এবং গ্রীক শব্দে মনোজেনেস (MONOGENES) বলা হয়। ইংরেজিতে 'মনো' মানে 'একমাত্র' এবং 'জেনেস' মানে মূলত শ্রেণি বা প্রজাতি বুঝানো হয়েছে। বাংলা বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে সেজন্য 'একমাত্র' বা 'একজাত' বলা হয়েছে।

আক্ষরিক অর্থে মনোজেনেস মানে 'তারা শুধুমাত্র একই রকমের'। এভাবেও বোঝা যায় যে পিতা ও পুত্র গুণে, মানে ও পদমর্যাদায় এক ও অভিন্ন। অন্যভাবে বলা যায়, একমাত্র পিতা ঈশ্বর ও এক মাত্র পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন দুই ব্যক্তিসত্তা এবং একই সাথে একই ঈশ্বর হিসাবে অস্তিত্বপ্রাপ্ত। তারা মূলত একই ঈশ্বর, কিন্তু ত্রিত্বের দুই আলাদা ব্যক্তিসত্তা। এভাবেই মনোজেনেস বা একমাত্র (একজাত) শব্দটি তাদের (পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর) উভয়ের অতুলনীয় সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা হয়।

এই বিষয় সুস্পষ্ট করে বোঝা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম বুঝতে হলে এটি আমাদের জন্য একেবারে গভীরের কেন্দ্রীয় বিষয়। যদি কেউ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের মধ্যেকার প্রকৃত অর্থ বিকৃত করে এবং পিতা ঈশ্বরকে পুত্র ঈশ্বরের চেয়ে বড় করে, তাহলে তা তার জন্য ভুলই হবে। এমন অনেক ঈশতত্ত্ববিদ আছেন যারা এই অতুলনীয় সম্পর্ক বোঝে না এবং তারা পিতা ঈশ্বরের চেয়ে পুত্র ঈশ্বরকে নীচু করে দেখে। এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই বিষয় আরও ব্যাপকভাবে আলোচনা করব।

মূল বাক্যের ধারা	পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের গতিশীল সম্পর্ক	প্রকাশিত ভাবার্থ
হেন (Hen)	আমি আর পিতা এক (যোহন ১০:৩০)	গুণে, মানে ও পদ মর্যাদায় এক ও অভিন্ন
হুইয়স (Huios)	আপনি সেই মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র (মথি ১৬:১৬)	ঈশ্বরের পুত্র, যীশুর খাঁটি ঈশ্বরত্ব
কেনো-ও (Keno-o)	আসলে তিনি ঈশ্বরই রইলেন, কিন্তু ঈশ্বরের সমান থাকা তিনি আঁকড়ে ধরে রাখবার মত এমন কিছু মনে করেন নি। তিনি বরং দাস হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সীমিত করে রাখলেন (ফিলিপীয় ২:৬-৭)	মনুষ্যপুত্র (যোহন ৩:১৩), যীশুর খাঁটি মনুষ্যত্ব
মনোজেনেস (Monogenes)	ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় (যোহন ৩:১৬)	তারা শুধুমাত্র অভিন্নভাবেই একই রকমের

তালিকা ১-৫: পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের মধ্যেকার গতিশীল সম্পর্ক

গ) ঈশ্বরের ত্রিত্বের মধ্যেকার পারস্পরিক সাক্ষ্য এবং তাদের কাজ

ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তা সব সময়ই একে অন্যকে উঁচুতে তুলে ধরছেন, একজন অন্যজন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, একজন অন্যজনের মাহাত্ম প্রকাশ করছেন (যোহন ১০:২৯ পদ দ্রষ্টব্য)। এই কারণে ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তা নিজের নিজের সম্পর্কে কখনই সাক্ষ্য দেন নাই। যীশু দুবার এই বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রথমত, তিনি বলেছেন, "আমি যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্যি নয়" (যোহন ৫:৩১ পদ)।

দ্বিতীয়ত, ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তা প্রত্যেকেই খুবই ভদ্র ও নম্র; কেউই কাউকে বাদ দিয়ে নিজেকে উঁচু করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন না। যীশু বলেছেন, "যে নিজ থেকে কথা বলে সে তার নিজের প্রশংসারই চেষ্টা করে, কিন্তু যিনি পাঠিয়েছেন, কেউ যদি তারই প্রশংসার চেষ্টা করে তবে সে সত্যবাদী এবং তার মনে কোন ছলনা নেই" (যোহন ৭:১৮ পদ)।

সেজন্য, ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তা প্রত্যেকেই একে অন্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তারা সকল সৃষ্টির কাছে প্রকাশ করেছেন যে, তারা একে অন্যের পরিচর্যা (দিয়াকনিয়া) করে থাকেন। এখন আমরা দেখি, কিভাবে এই ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তা একে অন্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেন ও পরিচর্যা কাজ করেন।

১) পিতা ঈশ্বর নিজেই পুত্র ঈশ্বর যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন

যীশু যখন বাপ্তিস্ম নিয়ে জল থেকে উঠে এসেছিলেন, তখন পবিত্র আত্মা কপোতের মত নেমে এসেছিলেন এবং স্বর্গ থেকে পিতা ঈশ্বরের বাণী শোনা গিয়েছিল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট" (মথি ৩:১৭ পদ)। এটাই ছিল পুত্র ঈশ্বরের সম্পর্কে পিতা ঈশ্বরের সাক্ষ্য।

তাছাড়াও, যীশুর গণ-প্রচার কালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মনুষ্যপুত্র কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে?" পিতর উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনি সেই মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।" পিতরের উত্তর শুনে যীশু বলেছিলেন, পিতর এই স্বীকারোক্তি দেন নাই, কিন্তু স্বর্গের পিতা ঈশ্বরই পিতরের মুখ দিয়ে এই স্বীকারোক্তি বের করেছিলেন যেন পিতরের মুখ থেকে যীশুর পরিচিতি প্রকাশ পায় (মথি ১৬:১৬-১৭ পদ দ্রষ্টব্য)। এই দৃশ্যপট সুস্পষ্টভাবে বলে, পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন।

আবার, যীশু যখন তাঁর তিনজন শিষ্য নিয়ে উঁচু পাহাড়ে উঠেছিলেন, তখন মেঘের মধ্য থেকে এক বাণী শোনা গিয়েছিল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন" (মথি ১৭:৫ পদ)।

এভাবে পিতা ঈশ্বর তিন বার যীশুর পরিচয় যীশুর শিষ্যদের কাছে তুলে ধরেছিলেন, কারণ পরবর্তীতে তারাই সমস্ত জগতে যীশুর সুসমাচার মিশন পরিচালনা করবে ও শিক্ষা দেবে। এই কথা সমর্থন করতে যীশু নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের পরিচয় তাঁরই শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেছেন (যোহন ৫:৩৭; ৮:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

২) পুত্র ঈশ্বর যীশু নিজেই পিতা ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন

পিতা ঈশ্বর নম্রভাবে পুত্র ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন ও তাঁর পক্ষে কাজও করেছেন। স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজের দ্বারা পুত্র ঈশ্বরও পিতা ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন ও পরিচর্যা কাজও করেছেন। বাইবেলে এমন বেশ কটি দৃশ্যপট রয়েছে যেখানে পুত্র ঈশ্বর যীশু পিতা ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

তাছাড়াও, ফরীশীরা যখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– তাঁর পিতা কোথায়, তখন যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনারা আমাকেও জানেন না আর আমার পিতাকেও জানেন না। যদি আমাকে জানতেন তবে আমার পিতাকেও জানতেন" (যোহন ৮:১৯ পদ)।

যীশুর একজন শিষ্য ফিলিপ তাঁকে বলেছিলেন, "প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হব" (যোহন ১৪:৮ পদ)। এই কথার উত্তরে যীশু তাকে বলেছিলেন, "ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে জানতে পার নি? যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। তুমি কেমন করে বলছ, 'পিতাকে আমাদের দেখান'?" (যোহন ১৪:৯ পদ)। এভাবেই যীশু পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

অতি সাধারণ প্রাণী মানুষ সরাসরি পিতা ঈশ্বরকে দেখতে পায় না; বরং পিতা ঈশ্বরের পাঠানো পুত্র ঈশ্বরকে দেখে পিতা ঈশ্বরকে দেখতে পায়। সেইজন্য যীশু বলেছেন, "ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখে নি। তাঁর সংগে থাকা সেই

একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন” (যোহন ১:১৮ পদ)। তাছাড়াও, ইব্রীয় ১:৩ পদে যীশুর প্রতিকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে, “ঈশ্বরের সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি।”

৩) যীশু নিজেই পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন

যীশু পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কেও সাক্ষ্য দিয়েছেন। পবিত্র আত্মাকে সাহায্যকারী বা পরামর্শদাতা (গ্রীক ভাষায়, প্যারাক্লেটস) বলা হয়। এই পরামর্শদাতা নিজে নিজে আমাদের কাছে আসেন না। যীশু যখন পিতা ঈশ্বরকে বলবেন, তখন পিতা ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পাঠিয়ে দেবেন। তার মানে, পুত্র ঈশ্বর যীশুর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে পাঠিয়ে দেন (যোহন ১৪:১৬; ১৫:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

শেষ উদ্ধার-পর্বের ভোজ, পক্ষান্তরে প্রভুর ভোজ পালনের সময়ে যীশু বলেছিলেন, “আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা” (যোহন ১৪:১৬-১৭ক পদ)। যেমন করে তিনি এই কথা বলেছেন, ঠিক একইভাবে তিনি পবিত্র আত্মার পরিচয়ও প্রকাশ করেছেন যে, পবিত্র আত্মা হচ্ছেন সত্যের আত্মা– তিনিই হচ্ছেন পিতা ঈশ্বরের আত্মা (মথি ১০:২০; ১৬:১৭; রোমীয় ৮:১১ পদ দ্রষ্টব্য) এবং তিনিই আবার পুত্র ঈশ্বর (প্রেরিত্ ১৬:১৭; রোমীয় ৮:৯; ১ পিতর ১:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। পবিত্র আত্মা যীশুর সম্পর্কে সব কিছুই আমাদের শিক্ষা দেন এবং মনে করিয়ে দেন। যীশু কে, কি তাঁর পরিচয়, তিনি কি করেছেন, সবই তিনি মনে করিয়ে দেন (যোহন ১৪:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

আমরা যখন পুত্র ঈশ্বর যীশুর নামে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি (মথি ৬:৯; যোহন ১৬:২৩-২৪ পদ দ্রষ্টব্য), পিতা ঈশ্বর তখন পুত্র ঈশ্বর যীশুর মধ্য দিয়ে তাঁরই অনুরোধে আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন। এই-ই হচ্ছে ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তার একে অন্যের প্রতি সম্মানজনক ও কার্যকর পরিচর্যার গতিশীল সম্পর্ক।

৪) পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন

বাইবেল এই সত্য প্রকাশ করেছে যে, পবিত্র আত্মা যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে (যোহন ১৫:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। পুনরুত্থানের পর যীশু চল্লিশ দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদের তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য চার বার “মহান নিয়োগ” প্রদান করেছিলেন (মথি ২৮:১৯-২০; মার্ক ১৬:১৫; লূক ২৪:৪৭ এবং যোহন ২০:২১ পদ দ্রষ্টব্য)। যিরূশালেম থেকে তাঁর স্বর্গে উঠে যাবার আগে তিনি শেষবারের মত আবার “মহান নিয়োগ” এর আদেশ ঘোষণা করেছিলেন, “তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরূশালেম, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে” (প্রেরিত্ ১:৮ পদ)।

শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার সাহায্যে সারা পৃথিবীর সকল জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা যেতে পারে এবং এই সুসমাচার মানে যীশু বিষয়। এভাবেই ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তার একে অন্যের সাথে সম্পর্ক বোঝা যায় এবং একে অন্যের সাথে সহভাগিতা, পরিচর্যা ও সাক্ষ্য দেবার সম্পর্কের সংগতি বা মিল লক্ষ্য করা যায়।

ঘ) যীশু পিতা ঈশ্বরকে সম্মানের শীর্ষে তুলে ধরেছেন

ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তার একজন হয়েও যীশু নিজেকে নত করে পিতা ঈশ্বরকে সম্মানের সাথে উঁচুতে তুলে ধরেছেন। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখতে পাই যে, যীশু ঈশ্বরকে সব সময়ই গৌরবান্বিত করেছেন। মোট আট ভাগে আমরা এটা বিশ্লেষণ করতে পারি।

১) পিতা ঈশ্বর সকলের চেয়ে বড়

পুত্র ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন (যোহন ১:৩; কলসীয় ১:১৬; ইব্রীয় ১:২ পদ দ্রষ্টব্য)। পিতা ঈশ্বর হচ্ছেন পরিকল্পনাকারী এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হচ্ছেন শক্তিপ্রদানকারী, কিন্তু পুত্র ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির কাজ

ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করেন। তবু পুত্র ঈশ্বর যীশু নিজেকে সম্মানের শীর্ষে তুলে ধরেন নাই, বরং তিনি পিতা ঈশ্বরকে সব কিছুর উপরে তুলে ধরার ঘোষণা দিয়েছেন।

"আমার মেষগুলো আমার ডাক শোনে। আমি তাদের জানি আর তারা আমার পিছনে পিছনে চলে। আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান। কেউই পিতার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে না" (যোহন ১০:২৭-২৯ পদ)। যেহেতু পিতা ঈশ্বর সকলের চেয়ে বড় ও মহান, সেহেতু যীশুর দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্তদের কাউকেই কেউই কেড়ে নিতে পারে না, কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁর হাতেই তাদের সকলকে ধরে রাখেন। যদিও যীশু নিজে তাঁর স্বর্গীয় পিতার মতই গৌরব ও সম্মানে অনেক উঁচুতে, তবুও তিনি নিজেকে নীচু করে তাঁর পিতাকে সবচেয়ে উঁচুতে তুলে ধরেছেন।

২) পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতই যীশু নিজে সকল সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছেন

আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি, নত-নম্র পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যিনি তাঁর বাক্যে ও নিজ হাতে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সকল প্রাণীদের সৃষ্টি করেছেন। যদিও ত্রিত্বের এই তিন ঈশ্বরই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, তবুও পুত্র ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে এই সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই সত্য যোহন এবং পৌলের লেখা শাস্ত্রাংশে লেখা হয়েছে: "আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি" (যোহন ১:৩ পদ)।

"কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। মহাকাশে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" (কলসীয় ১:১৬ পদ)।

"কিন্তু এই দিনগুলোর শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে সব কিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন" (ইব্রীয় ১:২ পদ)।

আমরা যখন বাইবেল থেকে এই শাস্ত্রাংশগুলো পড়ি, তখন এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পুত্র ঈশ্বর নিজেই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যীশু নিজে কখনই ঘোষণা করেন নাই যে তিনি নিজে এই সব সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছেন, বরং তিনি নত-নম্র ভাবে বলেছেন– তিনি পরিকল্পনাকারী পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও নির্দেশ মতই সব কিছু করেছেন। এখানে পুত্র ঈশ্বরের এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে, যিনি নিজেকে কখনও উঁচুতে না তুলে পিতা ঈশ্বরকে সম্মানের শিখরে তুলেছেন।

৩) পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন

আদম যখন পাপ করেছিলেন, তখন ত্রিত্ব ঈশ্বর আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পুত্র ঈশ্বর 'স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশে' মাংসিকভাবে জন্মগ্রহণ করবেন। "আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে" (আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ)। এই পদের আলোকে এটাই সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, ত্রিত্ব ঈশ্বর পাপে পতিত মানুষজাতিকে উদ্ধার করতে ৪০০০ বছরের এক মহা উদ্ধার পরিকল্পনার নকশা তৈরী করেন (এই প্রসংগে "মহা উদ্ধার পরিকল্পনা" বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ঈশ্বর নবী যিশাইয়ের কাছে তাঁর এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন: "কাজেই প্রভু নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন কুমারী কন্যা গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল" (যিশাইয় ৭:১৪ পদ)।

পরবর্তীতে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল, যখন পিতা ঈশ্বর এই পৃথিবীতে পুত্র ঈশ্বর অর্থাৎ মনুষ্য পুত্রকে পাঠালেন। "কারণ তার গর্ভে যা জন্মেছে তা পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মেছে। তার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু

রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন। এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়" (মথি ১:২০খ-২২ পদ)।

পুত্র ঈশ্বর তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, তিনি কিভাবে মানুষ হয়ে আসলেন, তাঁর আসার উদ্দেশ্য কি ছিল এবং কে তাঁকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যীশু বলেছেন, "আমি নিজে থেকে আসি নি, কিন্তু তিনিই (পিতা ঈশ্বর) আমাকে পাঠিয়েছেন" (যোহন ৮:৪২খ পদ)। "জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন আর তাঁরই দরুন আমি জীবিত আছি। ঠিক সেইভাবে যে আমাকে খায় সেও আমার দরুন জীবিত থাকবে" (যোহন ৬:৫৭ পদ)। 'পরে যীশু আবার তাদের বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক। পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি" (যোহন ২০:২১ পদ)।

যীশু তাঁর কথার দ্বারা অনেক বার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন কারণ পিতা তাঁকে পাঠিয়েছেন (যোহন ৩:১৬; ৫:৩৬-৩৭; ১০:৩৬; ১১:৪২; ১৪:২৪ এবং ১৭:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)। এখানেও আমরা আমরা দেখতে পাই কিভাবে তিনি পিতা ঈশ্বরকে সম্মানের সাথে উঁচুতে তুলে ধরেছেন।

৪) পিতা ঈশ্বর তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট ঈশ্বরের সন্তানদের যীশুর কাছে পাঠিয়েছেন

নত-নম্র যীশু বলেছেন যে, পিতা ঈশ্বর তাঁর আগে থেকে ঠিক করে রাখা তাঁর সন্তানদের যীশুর কাছে পাঠিয়েছেন। পিতা ঈশ্বর সৃষ্টির আগেই তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট ও মনোনীত সন্তানদের বেছে নিয়েছেন (ইফিষীয় ১:৩-৪ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি প্রভু যীশুর কাছে তাদের এনে দিয়েছেন। "পিতা আমাকে যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। যে আমার কাছে আসে আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দেব না" (যোহন ৬:৩৭ পদ)।

এভাবেই পিতা ঈশ্বর তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট সন্তানদের যীশুর কাছে এনে দেন। "আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি টেনে না আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না। আর আমি তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। নবীদের বইতে লেখা আছে, 'তারা সবাই ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাবে।' যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনে শিক্ষা পেয়েছে সে-ই আমার কাছে আসে" (যোহন ৬:৪৪-৪৫ পদ)।

ঈশ্বর পুত্র যীশু, যারা তাঁর কাছে এসেছে তাদের কাছে পিতা ঈশ্বর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। "জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ আমি তাদের কাছে তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, আর তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার কথার বাধ্য হয়ে চলেছে" (যোহন ১৭:৬ পদ)।

৫) যীশু এসে পিতা ঈশ্বরের নাম প্রকাশ করেছেন

মানুষের মত হয়ে এই পৃথিবীতে যীশুর আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির কাছে পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করা, যেন সৃষ্টি পরিত্রাণ বা উদ্ধার পায়। "ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (যোহন ৩:১৬ পদ)। "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে" (যোহন ৫:২৪ পদ)।

এভাবে যীশু কখনও নিজেই নিজেকে উপরে উঠান নাই, বরং পিতা ঈশ্বরকে উপরে তুলেছেন। পিতা ঈশ্বর এই পৃথিবীকে ভালবেসেছেন এবং তিনিই অনন্ত জীবন দেন বলে কাউকে দোষী করেন না– যীশু তাঁর শিষ্যদের এটাই শিক্ষা দিয়েছেন।

নত-নম্র যীশু তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন, যখন তারা প্রার্থনা করে তখন তাদের উচিত পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা (মথি ৬:৯ পদ দ্রষ্টব্য)। তবে যীশুকে সম্বোধন করে প্রার্থনা করলেও যীশু তা শুনবেন। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের শিখিয়েছেন যেন তারা যীশুর নামে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। তিনি এটাও বলেছেন যে, তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে বিনতি রাখবেন। এখানেও আমরা দেখি, যীশু নিজেকে নম্র করেছেন এবং পিতা ঈশ্বরকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন (যোহন ১৬:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

৬) পিতা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থেকেই যীশু কাজ করেছেন

পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিলেন বলেই তাঁর নিজের ইচ্ছামত সব কাজ সম্পন্ন করেন নাই। বরং সব কিছুই পিতার মধ্য দিয়ে, পিতার ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে করেছেন; ঠিক যেভাবে পিতার দ্বারা পুত্র (HUIOS) হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন। পিতা ও পুত্র একত্রে সংযুক্ত থেকে সব সময় কাজ করে থাকেন তার চারটি ক্ষেত্র নীচে দেওয়া হচ্ছে:

এক] পিতা ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেছেন, যীশু তা-ই করেছেন। "কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি" (যোহন ৬:৩৮ পদ)।

দুই] যীশু পিতা ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে কাজ করেন। "তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন? যে সব কথা আমি তোমাদের বলি তা আমি নিজে থেকে বলি না, কিন্তু পিতা, যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনিই তাঁর কাজ করছেন" (যোহন ১৪:১০ পদ)। 'পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং প্রার্থনা করে বললেন, আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে দূরে যাক। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামতই হোক" (মথি ২৬:৩৯ পদ)।

তিন] পিতা যা আদেশ করেন, যীশু তা-ই বলেন। "কারণ আমি তো নিজে থেকে কিছু বলি নি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতা নিজেই আমাকে আদেশ করেছেন কি কি বলতে হবে" (যোহন ১২:৪৯ পদ)।

চার] পিতা ঈশ্বর যা কিছু করবেন বলে স্থির করেন তার সব কিছু যীশুকে দেখান। "পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তিনি নিজে যা কিছু করেন সমস্তই পুত্রকে দেখান। তিনি এগুলোর চেয়ে আরও মহৎ মহৎ কাজ পুত্রকে দেখাবেন, যেন পুত্রকে সেই সব কাজ করতে দেখে আপনারা আশ্চর্য হন" (যোহন ৫:২০ পদ)। এভাবেই পুত্র ঈশ্বর যীশু পিতা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থেকে সব কিছু করেন। তারা একে অন্যকে সম্মান ও ভক্তি করে থাকেন।

৭) পিতা ঈশ্বর সব কিছুর দায়িত্বভার পুত্র ঈশ্বরকে দিয়েছেন

আমরা যীশুর নম্রতা সম্বন্ধে আরও কিছু খুঁজে বের করতে পারি। যদিও পিতা ঈশ্বর যীশুকেই স্বর্গের (প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্বর্গের) এবং পাতাল বা অতল গর্তসহ পৃথিবীর সব কিছুর উপরে ক্ষমতা দিয়েছেন; তবু যীশু নিজেই বলেছেন যে, সব ক্ষমতা তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকেই পেয়েছেন। 'তখন যীশু কাছে এসে তাদের এই কথা বললেন, "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে" ' (মথি ২৮:১৮ পদ)। "তুমি তাঁকে সমস্ত মানুষের উপরে অধিকার দিয়েছ, যেন যাদের তুমি তাঁর হাতে দিয়েছ তাদের সবাইকে তিনি অনন্ত জীবন দিতে পারেন" (যোহন ১৭:২ পদ)।

যীশুর ক্ষমতা সমস্ত সৃষ্টির উপরে, এমন কি অ্যাবিস (সিয়োল, অতল গর্ত) বা পাতালের উপরেও রয়েছে। যীশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার তিন দিন পর তাঁর পুনরুত্থানের আগে পর্যন্ত, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অ্যাবিসে নেমে যান এবং যারা উদ্ধার বা পরিত্রাণ পাবার জন্য আগে থেকেই মনোনীত, তাদের মুক্ত করেন। বাইবেলে এই বিষয় লেখা আছে: "পবিত্র শাস্ত্রে এইজন্য লেখা আছে, তিনি যখন স্বর্গে উঠলেন, তখন বন্দীদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন, আর তিনি লোকদের অনেক দানও দিলেন। তিনি উঠলেন, এই কথা থেকে কি এটাই বোঝা যায় না যে, খ্রীষ্ট পৃথিবীর গভীরে নেমেছিলেন? যিনি নেমেছিলেন তিনিই সব কিছু পূর্ণ করবার জন্য আবার আকাশ থেকেও অনেক উপরে উঠেছেন" (ইফিষীয় ৪:৮-১০ পদ)।

"খ্রীষ্টও পাপের জন্য একবারই মরেছিলেন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সেই নির্দোষ লোকটি পাপীদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য মরেছিলেন। দেহে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু আত্মায় তাঁকে জীবিত করা হয়েছিল এবং তিনি বন্দী আত্মাদের কাছে গিয়ে প্রচার করেছিলেন" (১ পিতর ৩:১৮-১৯ পদ)। অতি নম্রভাবে যীশু তাঁর পিতাকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন এবং এই কথা বলেছেন যে, পিতা ঈশ্বর তাঁর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছেন, যেন তিনি তৃতীয় স্বর্গ থেকে অ্যাবিস বা অতল গর্ত পর্যন্ত সব স্থানে সকল সৃষ্টিকে দেখাশোনা ও সুরক্ষা দিতে পারেন।

৮) পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরের হাতেই পৃথিবীর বিচার করতে ক্ষমতা দিয়েছেন

সব কিছুর উপরে, যীশু এই পৃথিবীর শেষ সময়ে এসে সব মানুষের বিচার করবেন। এই ক্ষমতা পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরকে দিয়েছেন। "পিতা পুত্রকে মানুষের বিচার করবার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি মনুষ্যপুত্র" (যোহন ৫:২৭ পদ)।

প্রেরিত্ যোহন দর্শনে যীশুকে সাদা সিংহাসনে বসে সমস্ত জাতির বিচার করতে দেখেছিলেন। ভবিষ্যত সম্পর্কিত এই দর্শন এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "তারপর আমি একটা বড় সাদা সিংহাসন এবং তার উপরে একজনকে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর সামনে থেকে পৃথিবী ও মহাকাশ পালিয়ে গেল, তাদের জায়গা আর কোথাও রইল না। তারপর আমি দেখলাম, ছোট-বড় সব মৃত লোকেরা সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর পর কতগুলো বই খোলা হল। ওটা ছিল জীবন বই। এই মৃত লোকদের কাজ সম্বন্ধে সেই বইগুলোতে যেমন লেখা হয়েছিল সেই অনুসারেই তাদের বিচার হল। যে সব মৃত লোকেরা সমুদ্রের মধ্যে ছিল, সমুদ্র তাদের তুলে দিল। এছাড়া মৃত ও মৃত স্থানের মধ্যে যে সব মৃত লোকেরা ছিল, মৃত্যু ও মৃতস্থান তাদেরও ফিরিয়ে দিল। প্রত্যেককে তাদের কাজ অনুসারে বিচার করা হল" (প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৩ পদ)।

শাস্ত্রে যেভাবে দেখতে পাই, যীশুই হচ্ছেন চূড়ান্ত বিচারের প্রধান। কিন্তু তিনি নিজেকে সেভাবে দেখান নাই। তার বদলে তিনি নিজেকে নত-নম্র করেই বলেছেন যে, পিতা ঈশ্বর তাঁকে এই বিচার করার অধিকার দিয়েছেন।

উপরে উল্লেখিত আটটি উপ-শিরোনাম পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পাই যে, কিভাবে পুত্র ঈশ্বর নম্রতা, সেবার মনোভাব এবং শিষ্টাচার দেখিয়ে পিতা ঈশ্বরকে সম্মানের শীর্ষে তুলে ধরেছেন। ঈশ্বর পুত্র একজন মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীতে এলেও তাঁর মধ্যে হিংসা, ঘৃণা, ক্ষমাহীন হৃদয়, রাগ, লোভ, নিন্দা, ঠকামী, প্রতারণা, অবিশ্বস্ততা, চৌর্যভাব, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, বিপক্ষতা ইত্যাদি কোন কিছুই ছিল না। ত্রিত্ব ঈশ্বর শুধুমাত্র পারস্পরিক নম্রতাবোধ, সহভাগিতা এবং শিষ্টতা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তার প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা কাজের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ানদের আত্মিকতা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রভু যীশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক অনুশীলনে যীশুর স্বরূপ দেখা যায়। যদি একজন খ্রীষ্টিয়ান অন্যের বিপক্ষে হিংসা ও ঘৃণায় পূর্ণ থাকে; ক্ষমাহীনতা, নিন্দুক হৃদয়, ঠকামী, প্রতারণা, রাগ, অবিশ্বস্ততা, চৌর্যভাব, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও বিপক্ষতায় পূর্ণ থাকে– তাহলে সেই খ্রীষ্টিয়ান আত্মিকতার অধিকারী নয়। এরকম খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে শয়তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকাতে সে পৃথিবীতে লবণ ও আলো সদৃশ হতে পারে না (মথি ৫:১৩-১৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং চূড়ান্তভাবে প্রভু যীশুর প্রকৃত শিষ্য বা শিষ্যা হতে পারে না (লূক ১৪:২৫-৩৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু তাঁর ক্রুশ মৃত্যুর আগে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন যেন তাঁর শিষ্যেরা সকলে এক হয়, ঠিক যেমন পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এক। "আমি আর এই জগতে নেই, কিন্তু তারা তো এই জগতে আছে; আর আমি তোমার কাছে আসছি। পবিত্র পিতা, তুমি আমাকে তোমার যে নাম দিয়েছ সেই নামের গুণে এদের রক্ষা কর, যেন আমরা যেমন এক, এরাও তেমনি এক হতে পারে" (যোহন ১৭:১১ পদ)। "পিতা, তুমি যেমন আমার সংগে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি তেমনি তারাও যেন আমাদের সংগে যুক্ত থাকতে পারে। তাতে জগতের লোকেরা বিশ্বাস করতে পারবে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ" (যোহন ১৭:২১ পদ)।

ত্রিত্ব ঈশ্বর নিজে থেকেই পরিপূর্ণ, কিন্তু ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তা একে অন্যের মধ্যে আছেন, একে অন্যের সাহায্যকারী, একে অন্যের সাথে সহভাগিতায়, একে অন্যকে নম্রভাবে দেখেন, একে অন্যের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন এবং একে অন্যের সাথে যুক্ত। যীশুও চেয়েছেন যেন তাঁর শিষ্যেরা ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তার সক্রিয় সম্পর্কের স্বরূপ তাদের মধ্যে প্রকাশ করে, যেন তারা একে অন্যকে সেবা করে, সহভাগিতা রাখে, সম্মান করে, ভালবাসে এবং পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত বিভিন্নতা, জাতি-গোষ্ঠী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গ বৈষম্য, আর্থিক ও সামাজিক সংগতি ইত্যাদির ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নম্রতায় একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকে। যারা এই রকম ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তারা প্রকৃতই খ্রীষ্টের সদৃশ খ্রীষ্টিয়ান এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ।

তিন বছর ধরে যীশু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শিষ্যদের এটাই শিক্ষা দিয়েছেন। যীশুর প্রকৃত শিষ্য বা শিষ্যা হতে হলে আমরা অবশ্যই আমাদের দেহে ও মনে তাঁর বৈশিষ্ট্য ধরে রাখব। আমাদের জন্য এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

চার
যীশুকে বুঝতে পারা

ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা পুত্র ঈশ্বর মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে আসলেন। তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে (ফিলিপীয় ২:৭ পদ দ্রষ্টব্য) পরিপূর্ণ মানুষ হয়েই আসলেন। তিনি মানুষের ভাষায় কথা বললেন, মানুষের মত কাপড়-চোপড় পরলেন, জুতা পরলেন, খাওয়া-দাওয়া করলেন এবং ঘুমালেন। তাছাড়াও, তিনি একজন পাপী বলে আখ্যায়িত হলেন, উপহাসের পাত্র হলেন এবং অত্যাচারিত হয়ে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন।

এই সব কারণে জগতের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা বার বার ঘটে গেছে, যেখানে লোকেরা যীশুকে শুধুমাত্র মানুষ হিসাবে দেখেছে, কিন্তু পুত্র ঈশ্বর হিসাবে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। আরও দুঃখের বিষয় হচ্ছে– খ্রীষ্টিয়ান জগতেও খ্রীষ্টতত্ত্ব নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই কারণে খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেই নানা ভ্রান্ত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। বিশেষত, যদি কেউ যীশুর পূর্ব-অস্তিত্ব এবং মানবিক দিক বুঝতে না পারে তাহলে তার পক্ষে ধারাবাহিক ও যুক্তিযুক্তভাবে বাইবেল ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। অবশ্যই আমাদের এই বিষয় খুবই নিখুঁতভাবে বুঝতে হবে, যেন আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি পাথর সদৃশ শক্ত হয়।

ক) যীশুর পূর্ব অস্তিত্ব

ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন বাস্তবায়নকারী ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর হচ্ছেন পরিকল্পনাকারী, পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন বাস্তবায়নকারী এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হচ্ছেন শক্তিদানকারী। পিতা ঈশ্বর তৃতীয় স্বর্গে তাঁর সিংহাসনে বসে থাকেন এবং সরাসরি সৃষ্টির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না (যোহন ১:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)। পুত্র ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে সকল সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব করেন এবং পরিচালনা করেন, আর পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরকে তাঁর সব কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

একে অন্যের সাথে এমনই এক সমঝোতার ভিত্তিতে, ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা পুত্র ঈশ্বর (যীশু) মানব ইতিহাসের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করেছেন এবং সরাসরি মানুষের সাথেও তাঁর করণীয় সম্পর্ক তৈরী করেছেন। নিজ হাতে সব কিছু সৃষ্টি করার পরে (যোহন ১:৩; কলসীয় ১:১৬ ও ইব্রীয় ১:২ পদ দ্রষ্টব্য) পুত্র ঈশ্বর সকল সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুর উপরে, তাদের সকলের ভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উপরে কর্তৃত্ব করছেন, পরিচালনা করছেন, দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করছেন। এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসার অনেক আগে থেকেই যীশু ছিলেন। যীশুর পূর্ব-অস্তিত্ব বলতে আমরা এটাই বুঝতে পারি।

যীশু নিজেই বলেছেন, তিনি সৃষ্টির আগে ছিলেন (যোহন ১৭:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি হচ্ছেন আলফা এবং ওমিগা, মানব ইতিহাসের শুরু ও শেষ (যিশাইয় ৪৪:৬; প্রকাশিত বাক্য ১:৮, ১৭; ২১:৬; ২২:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। মানুষ হিসাবে যীশু এখন থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কিন্তু তারও ৩০০০ বছর আগে, ৪০০০ বছর আগে, এমন কি ৬০০০ বছর আগেও তিনি পুরাতন নিয়মের মানব ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন। এই যীশুই পুরাতন নিয়মের সময়ে যিহোবা ঈশ্বর হিসাবে মানুষের বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

পুরাতন নিয়মের সময়ে যীশুই যে যিহোবা (সদাপ্রভু) ঈশ্বর, তা তাঁর নাম থেকে আমরা বুঝতে পারি। প্রথমত, আদিপুস্তক ২:৪ পদে সরাসরি ঈশ্বর না বলে সদাপ্রভু ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলা হয়েছে, যার মানে হচ্ছে "যে ঈশ্বর চুক্তি করেছেন।" যে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ। অন্যভাবে, তিনি হচ্ছেন উদ্ধারকর্তা। এই যিহোবা ঈশ্বর (সদাপ্রভু ঈশ্বর) ব্যক্তিগতভাবে মানুষ হিসাবে এলেন এবং আমাদের মুক্তিদাতা হলেন; তাই আমরা তাঁকে প্রভু বলে সম্বোধন করি।
যিহূদীরা ঈশ্বরের নাম, অর্থাৎ তাদের ভাষায় যিহোবা অথবা ইয়াহূয়ে (JEHOVAH or EAHWEH) সম্বোধন করতে সাহসী নয়, কারণ এই নাম অতি মাত্রায় পবিত্র। তাই তারা স্বরবর্ণ বাদ দিয়ে লেখে JHVH or EHWH। যেখানেই তারা এই নাম দেখে, তারা উচ্চারণ না করে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের সাথে মাথা নত করে। যেহেতু তারা এই নাম উচ্চারণ করে না, তাই ঈশ্বরের নামের পরিবর্তে হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরের উপাধি ADONAI অর্থাৎ প্রভু বলে সম্বোধন করে থাকে।

হিব্রু ভাষার এই শব্দ এডোনাই প্রথম বারের মত সেপ্টুয়াজিন্ট (SEPTUAGINT) অনুবাদে ব্যবহার করা হয় [২৮৪-২৪৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদকে সেপ্টুয়াজিন্ট বলা হয়] এবং সেখানে গ্রীক ভাষার শব্দ কুরিয়স (KURIOS) বলে উল্লেখ করা হয়, যার মানে হচ্ছে প্রভু (LORD)। তাই নতুন নিয়মে যীশুকে প্রভু যীশু বলা হয়, যা পুরাতন নিয়মের শাব্দিক অর্থে ইয়াহূয়ে (EAHWEH) ছাড়া আর কিছু নয়।

যীশু নিজেই তাঁর শিষ্য এবং যিহূদী নেতাদের কাছে এই সত্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, তিনিই পুরাতন নিয়মের যিহোবা ঈশ্বর বা যিহোবা সদাপ্রভু। তিনি অব্রাহামের (২১৬৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) সাথে দেখা করেছেন এবং তার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপচারিতা হয়েছে (আদিপুস্তক ১২:১; ১৮:১-৩৩; ২২:১-২; যোহন ৮:৫৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে পুরাতন নিয়মের সময়ে (৮৫০-৪৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) নবী বা ভাববাদীদের পাঠিয়ে প্রতিমা পূজাকারী ইস্রায়েলীয়দের সাবধান করে দিয়েছেন (মথি ২৩:৩৭ পদ দ্রষ্টব্য)। নবী ইলিশায় (৮৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) থেকে শুরু করে নবী মালাখির (৪৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) সময়ে যীশুই বিভিন্ন নবীদের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের সতর্ক করেছেন, কারণ তারা ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে বাবিলীয় দেব-দেবীদের পূজা করতে শুরু করেছিল। নবীরা ইস্রায়েলীয়দের সাবধান করেছিলেন যেন তারা প্রতিমা পূজা বন্ধ করে।

যীশুর এই কথা শুনে যিহূদী নেতাদের খুবই রাগ হয়েছিল। তারা তাঁকে বুঝে উঠতে পারে নাই, কারণ তিনি তাদের সামনে ৫০ বছরেরও কম বয়সী একজন, যিনি কিনা বলছেন যে, তিনি অব্রাহামকে দেখেছেন (যোহন ৮:৫৭ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশুর এই বক্তব্য ছিল তাদের মানবিক বোধ-বুদ্ধির বাইরে। তারপরে, যীশু আরও যোগ করেছেন, "আমি আপনাদের সত্যি বলছি, অব্রাহাম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি" (যোহন ৮:৫৮ পদ)। এই বক্তব্য শুনে যিহূদী নেতারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু যীশু নিজেকে গোপন করে সেখান থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু তারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বিশ্বাস করতে পারে নাই, সেহেতু তারা ব্যক্তি হিসাবে যীশুর দাবী মেনে নিতেও পারে নাই। শুধু তা-ই নয়, যিহূদী মতবাদের চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী তাঁর শিষ্যদের পক্ষেও যীশুর বলা এই কথা বোঝা নিঃসন্দেহে খুবই কষ্টকর ছিল।

এই বক্তব্যের সাথে যুক্ত করে এও বলা যেতে পারে যে, পুরাতন নিয়মের সময়ে যীশুর উপস্থিতি সম্পর্কে আরও নানা প্রমাণ আছে। শালেমের রাজা মল্কিষেদক (ন্যায়ের রাজা ও মহান ঈশ্বরের পুরোহিত– আদিপুস্তক ১৪:১৮; ইব্রীয় ৭:১-৩ পদ দ্রষ্টব্য) রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আবার মিসর থেকে বের হয়ে আসা ইস্রায়েলীদের জন্য এমন এক পাথর, যেখান থেকে তারা জল খেয়ে বেঁচেছিল (যাত্রাপুস্তক ১৭:৬; গণনাপুস্তক ২০:৮-১২; দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৫১-৫২ এবং ১ করিন্থীয় ১০:৪ পদ দ্রষ্টব্য)। ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মোশি শুধু যীশু খ্রীষ্টের কথা মনে রেখেই কষ্ট স্বীকার করেছিলেন (ইব্রীয় ১১:২৪-২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। বাপ্তিস্মদাতা যোহন তার চেয়ে ৬ মাসের ছোট যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বলেছেন যে, যীশু তাঁর অনেক আগেই ছিলেন (যোহন ১:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার, যীশু নিজেও তাঁর শিষ্যদের সাথে কথা বলার সময় সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন– পুরাতন নিয়মে মোশির লেখা আইন-কানুন, নবীদের লেখা, এমন কি গীতসংহিতার মধ্যেও তাঁরই বিষয় লেখা হয়েছে (লূক ২৪:২৭, ৪৪; যোহন ৫:৩৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

বিভিন্ন নামে যীশু পুরাতন নিয়মে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেমন তিনি যিহোবা সদাপ্রভু হিসাবেও ছিলেন। তিনি যিহোবা-যিরি অর্থাৎ সদাপ্রভু যোগানদাতা (আদিপুস্তক ২২:১৪ পদ দ্রষ্টব্য), যিহোবা-নিশি অর্থাৎ সদাপ্রভু আমার পতাকা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (যাত্রাপুস্তক ৬:৩ পদ দ্রষ্টব্য), যিহোবা-শালোম অর্থাৎ সদাপ্রভুই শান্তি, সর্বশক্তিমান (গীতসংহিতা ৯০:১ পদ দ্রষ্টব্য), মেষ পালক (গীতসংহিতা ২৩:১ পদ দ্রষ্টব্য), আশ্রয় ও দুর্গ (গীতসংহিতা ১৪৪:২ পদ দ্রষ্টব্য), শারোণের গোলাপ, উপত্যকার লিলি ফুল (পরমগীত ২:১ পদ দ্রষ্টব্য), ইম্মানূয়েল বা আমাদের সংগে ঈশ্বর (যিশাইয় ৭:১৪ পদ দ্রষ্টব্য), এমন এক পাথর, যেখানে লোকে উছোট খাবে এবং যা লোকের উছোট খাবার কারণ হবে (যিশাইয় ৮:১৪ পদ দ্রষ্টব্য), আশ্চর্য পরামর্শদাতা ও শান্তির রাজা (যিশাইয় ৯:৬ পদ দ্রষ্টব্য), সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু (যিশাইয় ১:৯ পদ দ্রষ্টব্য), ইস্রায়েলের আলো সদৃশ আগুন (যিশাইয় ১০-১৭ পদ দ্রষ্টব্য), চিরস্থায়ী আশ্রয়-পাহাড় (যিশাইয় ২৬:৪ পদ দ্রষ্টব্য), আলফা ও ওমিগা (যিশাইয় ৪৪:৬ পদ দ্রষ্টব্য), মুক্তিদাতা (যিশাইয় ৪৩:১৪ পদ দ্রষ্টব্য), রাজা ও মুক্তিদাতা– সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু (যিশাইয় ৪৪:৬ পদ দ্রষ্টব্য), দোষ উৎসর্গকারী দাস (যিশাইয় ৫৩:১০ পদ দ্রষ্টব্য), জলপাই গাছ (হোশেয় ১৪:৬ পদ দ্রষ্টব্য), শক্তিশালী উদ্ধারকর্তা (সফনিয় ৩:১৭ পদ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি হিসাবেও উপস্থিত হয়েছিলেন।

		পুরাতন নিয়মে যীশু	নতুন নিয়মে পাওয়া প্রমাণ
সৃষ্টির শুরুতে	সৃষ্টির আগে	বাক্য (যোহন ১:১)	তিনি পিতা ঈশ্বরের সংগে ছিলেন (যোহন ১৭:৫)
সৃষ্টির শুরুতে	মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি	যিহোবা সদাপ্রভু (আদি পুস্তক ১:১ ও ২:৪)	তিনি নিজে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন (যোহন ১:৩; কলসীয় ১:১৬; ইব্রীয় ১:২)
৪১১৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	আদমের পতন	যিহোবা সদাপ্রভু (আদিপুস্তক ৩:২২, ইয়াহূয়ে, চুক্তির ঈশ্বর, উদ্ধারকর্তা)	তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন (মথি ১:২১)
৩০৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	নোহ	যিহোবা (আদিপুস্তক ৬:৮, হিব্রু শব্দ: এডোনাই, আমার প্রভু)	সদাপ্রভু (গ্রীক শব্দ- কুরিয়স)
২১৬৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	অব্রাহাম	যিহোবা (আদিপুস্তক ১২:১; ১৩:৪; ১৮:১-৩৩; ২২:১-২) স্বর্গদূত যিহোবা (আদিপুস্তক ১৬:৭-১৪) মল্কিষেদক (আদিপুস্তক ১৪:১৮)	যীশু অব্রাহামের আগে ছিলেন। অব্রাহাম যীশুর দিন দেখবার আশায় আনন্দ করেছিলেন (যোহন ৮:৫৫-৫৯) ন্যায়ের রাজা, শান্তির রাজা (ইব্রীয় ৭:১-৩)
১৫২০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	মোশি	স্বর্গদূত যিহোবা, যিহোবা, ঈশ্বর (যাত্রাপুস্তক ৩:১-৭) পাথর (যাত্রাপুস্তক ১৭:৬; গণনাপুস্তক ২০:৮-১২; দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৫১-৫২)	খ্রীষ্টের জন্য মোশির কষ্টভোগ (ইব্রীয় ১১:২৪-২৬) খ্রীষ্ট (১ করিন্থীয় ১০:৪)
৮৫০-৪৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	নবীদের সময়কাল	যিহোবা ঈশ্বর, যীশু নবীদের পাঠিয়েছেন (এলিয়- মালাখি)	ইস্রায়েলীয়দের প্রতিমা পূজার জন্য যীশুর সাবধানবাণী (মথি ২৩:৩৭)
৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	যিশাইয়	ইম্মানূয়েল (যিশাইয় ৭:১৪) শুরু ও শেষ (যিশাইয় ৪৪:৬)	আমাদের সংগে ঈশ্বর (মথি ১:২৩) আলফা ও ওমিগা, শুরু ও শেষ (প্রকাশিত বাক্য ১:৮, ১৭; ২১:৬; ২২:১৩)
	বাপ্তিস্মদাতা যোহন	"তিনি আমার আগে ছিলেন"	"যিনি আমার পরে এসেছেন (যোহন ১:১৫)
৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	যীশু	পুরাতন নিয়ম মোশির লেখা আইন-কানুনের বই, গীতসংহিতা, নবীদের লেখা বইগুলো	"পুরাতন নিয়ম আমার সম্বন্ধে কথা বলেছে" (যোহন ৫:৩৯) তাঁর নিজের বিষয়ে প্রকাশিত শাস্ত্রবাক্য (লূক ২৪:২৭, ৪৪)

তালিকা ১-৬: যীশুর পূর্ব-অস্তিত্ব

ত্রিত্ব ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিসত্তা পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন আকারে আবির্ভূত হয়েছেন। তারপর, হঠাৎ করেই তিনি তাঁর নাম যীশু বলে ঘোষণা করলেন। যীশু নামের অর্থ হচ্ছে– যে "তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন" (মথি ১:২১ পদ), অন্য অর্থে উদ্ধারকর্তা। তিনি আবার ইম্মানূয়েল বা আমাদের সংগে ঈশ্বর, যে ঈশ্বর আমাদের সাথে থাকেন (খ্রীষ্ট পূর্ব ৭০০ বছর আগে নবী যিশাইয় যে ভাববাণী করেছিলেন- যিশাইয় ৭:১৪; মথি ১:২৩ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু শুধুমাত্র নতুন নিয়মের যীশু নয়। সমগ্র পুরাতন নিয়মে যীশুর ঘটনা লেখা আছে। আমরা পুরাতন নিয়মের কোন কোন খন্ড অংশের সাথে নতুন নিয়মের খন্ড অংশ যুক্ত করেও বুঝতে পারি না। তবুও আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, পুরাতন নিয়ম যীশুর কথাই বলছে (যিশাইয় ৩৪:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। পুরাতন ও নতুন নিয়মে যীশুর বিষয় লক্ষ্য করতে করতে হৃদয়ের গভীরে ধ্যান করতে হবে, যেন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারি এবং সেই সাথে উভয় স্থানেই যীশুর উপস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করতেও সচেষ্ট হই।

খ) যীশুর মনুষ্যত্ব

যীশু ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা হলেও মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ মানুষ। মানবিক যুক্তি-তর্কে এই বিষয় বোঝা কষ্টকর। সেই কারণে, খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসে এমন অনেক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা ভুলভাবে বিচার করে যীশুর মানবিক দুর্বলতার ইংগিত করে বলেছে যে, যীশু ঈশ্বর নয়। মূলত, তারা কেউই সঠিকভাবে ঈশ্বরের ত্রিত্ব বোঝে নাই। আমরা যখন আমাদের আত্মিক চোখ খুলে যীশুর মানবিকতার গভীর বিষয়সমূহ দেখব, তখনই আমরা সুস্পষ্টভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরের সাথে যীশুর গতিশীল সম্পর্ক, তাঁর অস্থিত্ব ও তাঁর ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে পারব।

বাইবেলে এমন অনেক ঘটনা দৃশ্যমান, যেখানে যীশুর মানবিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, পুরাতন নিয়মে যিহোবা ঈশ্বর (নতুন নিয়মে যীশু) তাঁর মানবিকতাকে অনেকভাবে প্রকাশ করেছেন। কোন কোন সময় তিনি খুবই দুঃখ পেয়েছেন এবং কষ্টে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছে (আদিপুস্তক ৬:৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি ঈশ্বর বলেই তাঁর পাওনা ভক্তির দাবী করেছেন (যাত্রাপুস্তক ২০:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি আবার অনুশোচনাও করেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩৬; ১ শমূয়েল ১৫:৩৫ পদ দ্রষ্টব্য)। কোন সময় তিনি অভিশাপ দিয়েছেন (যিহিষ্কেল ৫:১৩ পদ দ্রষ্টব্য), রাগও করেছেন (বিচারকর্তৃগণ ২:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি খুশীও হয়েছেন (১ রাজাবলি ১০:৯ পদ দ্রষ্টব্য), হেসেছেন এবং বিদ্রূপও করেছেন (গীতসংহিতা ২:৪ পদ দ্রষ্টব্য)। যারা অন্যায় করে, তিনি তাদের অগ্রাহ্য করেন (গীতসংহিতা ৫:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেন (গীতসংহিতা ১০৩:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)।

পুরাতন নিয়মের যিহোবা ঈশ্বরের মতই নতুন নিয়মের যীশু একইভাবে তাঁর নিখুঁত মানবিক আবেগ ও অনুভূতি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ছিল দৈহিক সীমাবদ্ধতা, তাই তাঁর খিদে লাগত (মথি ৪:২ পদ দ্রষ্টব্য), পিপাসা লাগত (যোহন ১৯:২৮ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি আবার ক্লান্তও হতেন (যোহন ৪:৬ পদ দ্রষ্টব্য)। মাঝে মধ্যে তিনি নিরাশও হয়েছেন (মথি ২৬:৩৬, ৪০-৪৫ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়াও, যখন তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তখন তিনি কষ্টভোগ ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছিলেন (মথি ২৭:৫০; যোহন ১৯:৩৩-৩৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

একজন সাধারণ মানুষের মতই যীশুকে মানসিকভাবে আবেগ প্রবণ হতে হয়েছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যোহনকে একটু বেশী পছন্দ করতেন (যোহন ১৩:২৩ পদ দ্রষ্টব্য), লাসারকে ভালবাসতেন এবং তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে কেঁদেছিলেন (যোহন ১১:৩, ৩৫ পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁর ছিল গরীব ও নিঃসংগ লোকদের জন্য মমতাপূর্ণ হৃদয় (মথি ৯:৩৬; ১৪:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি কোন কোন সময় আনন্দ প্রকাশও করেছেন (যোহন ১৫:১১; ১৭:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার তিনি রাগও প্রকাশ করেছেন (মার্ক ৩:৫; ১০:১৪; যোহন ২:১৩-২২ পদ দ্রষ্টব্য)। মানুষের যতরকম আবেগ ও মেজাজ থাকে, যীশুরও ঠিক তা-ই ছিল।

সর্বোপরি, আমরা যীশুর প্রার্থনার জীবনেও তাঁর মানবিক দুর্বলতার ইংগিত পাই। তিনি তাঁর ঈশ্বরত্ব ত্যাগ (ফিলিপীয় ২:৭ পদ দ্রষ্টব্য) করে নিজেকে শূন্য করলেন [গ্রীক ভাষায় Keno-o] এবং মানুষের সব রকম দুর্বলতা নিয়েই মানুষ হলেন; তাই স্বর্গ থেকে আত্মিক সাহায্য তাঁরও দরকার হয়েছিল। ঈশ্বর পুত্র যীশু পিতা ঈশ্বরের কাছে পবিত্র আত্মার জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন। তিন বছর জন সম্মুখে আসার আগে তিনি ৪০ দিন উপবাস করে প্রার্থনা করেছিলেন (মথি ৪:২ পদ দ্রষ্টব্য)। সুসমাচার প্রচারকাজ শুরু করার আগে খুব ভোরে উঠে তিনি প্রার্থনা করতেন (মার্ক ১:৩৫ পদ দ্রষ্টব্য)। শিষ্যদের মনোনীত করার আগে তিনি সারা রাত তাঁর পিতার সাথে কথোপকথন করেছিলেন (লূক ৬:১২ পদ দ্রষ্টব্য)।

তিনি যখন গেৎশিমানী বাগানে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তাঁর মন ছিল দুঃখ ও কষ্টে ভরা (মথি ২৬:৩৭ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়াও, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে দূরে যাক। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামতই হোক" (মথি ২৬:৩৯ পদ)। 'এই দুঃখের পেয়ালা' যে শুধুমাত্র ক্রুশে মৃত্যুর চরমতম কষ্টভোগ তা-ই নয়, সেই সাথে লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান-উপহাসও ছিল (মথি ২৬:৫৭-৬৮; ২৭:১১, ২৬-৪৪ পদ দ্রষ্টব্য)। পিতর তিন বার তাঁকে অস্বীকার করেছিল, তাও তাঁর কাছে কম বেদনাদায়ক ছিল না (মথি ২৬:৬৯-৭৫ পদ দ্রষ্টব্য)। এরকম কত কিছুই মানুষ প্রভুর আত্মাভিমানে ভীষণরকম আঘাত করেছিল, অথচ তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর।

যেহেতু যীশু ছিলেন একাধারে খাঁটি মানুষ, তাই তিনি দুঃখের পেয়ালা বর্জন করতে চেয়েছিলেন! অথচ তিনি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা (তাঁর পরিচর্যা কাজ) পরিপূর্ণ করতেই এসেছিলেন। ক্রুশের এই ভয়াবহ কষ্ট পেরিয়ে আসার জন্য, তিনি আবার প্রার্থনা করেছিলেন– যেন তাঁর মানবিক ইচ্ছা নয়, কিন্তু তাঁর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় (মথি ২৬:৩৯, ৪২ পদ দ্রষ্টব্য)। এই কাজে তিনি পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি স্বর্গদূতের সাহায্য পেয়েছিলেন (লূক ২২:৩৯-৪৬ পদ দ্রষ্টব্য)। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার সময়ে তিনি তাঁর পিতার সাথে কথোপকথন করেছিলেন, যেন তিনি প্রলোভিত না হন (মথি ২৭:৪৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর– তাহলে তিনি তো মানুষের উদ্ধার পরিকল্পনা সহজেই করতে পারতেন (যিশাইয় ৫৯:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, "তাঁর এমন সৌন্দর্য বা জাঁকজমক নেই যে, তাঁর দিকে আমরা ফিরে তাকাই; তাঁর চেহারাও এমন নয় যে, আমাদের আকর্ষণ করতে পারে। লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে; তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং রোগের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল" (যিশাইয় ৫৩:২খ-৩ক পদ)।

বাস্তবিক, যীশু এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসলেন। হাতে-পায়ে পেরেক বিদ্ধ হয়ে তিনি ক্রুশ গ্রহণ করলেন। "আমাদের পাপের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে" (যিশাইয় ৫৩:৫ পদ)। মানবিক দৃষ্টিকোণে ভীষণ কষ্টকর ও বেদনাদায়ক উপায়ে তিনি মানুষের পরিত্রাণ বা উদ্ধার পরিকল্পনা সাধন করলেন।

পুত্র ঈশ্বরের মানবিক প্রতিকৃতি হয়তোবা বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে– যীশু ঈশ্বর নয়। কিন্তু যখন আমরা আমাদের আত্মিক চোখ খুলে তাঁকে দেখি, তখন আমরা এও বুঝতে পারি যে, পুত্র ঈশ্বরের মানবিক দুর্বলতা মূলত যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের প্রতিনিধিত্ব করছে। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, জীবন ও মৃত্যু, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক। এটাই হচ্ছে ত্রিত্ব ঈশ্বরের চূড়ান্ত ভালবাসা, যেন মানবজাতি পুত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে চিরকালের ধ্বংস থেকে অনন্তজীবনে ফিরে আসতে পারে।

ঈশ্বর যীশু এভাবে মানবজাতির পরিত্রাণ বা উদ্ধার পরিকল্পনা সাধন করে ঈশ্বরের ভালবাসা মানুষের মত করে আমাদের দেখাতে চাইলেন। যখন আমরা আমাদের পাপের পরিবর্তে যীশুকে আমাদের পাপসকল বহন করতে দেখি, আমাদের পরিবর্তে সবচেয়ে নীচু ও অপমানজনক ক্রুশীয় মৃত্যুর শাস্তি গ্রহণ করতে দেখি, তখন আমরা আমাদের পরিত্রাণ বা উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের অন্তহীন ভালবাসা হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধি করি। কারণ, মৃত্যুযোগ্য অনন্ত শাস্তি আগে থেকেই আমাদের পাওনা ছিল। যেহেতু, নীতিভ্রষ্ট পাপী মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে দেখার মত চোখ নেই, সেহেতু ঈশ্বরের ভালবাসা পুত্র ঈশ্বরের কাজের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

পাপের প্রায়শ্চিত্বের জন্য উৎসর্গ একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন। তাই ঈশ্বর যীশু মানুষ হয়ে, মানুষের মত দুর্বল ও সীমাবদ্ধ হয়ে তাঁর সন্তানদের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছেন। সেই কারণে তিনি ক্রুশের শাস্তি গ্রহণ করলেন। এভাবে তাঁর মূল্যবান রক্ত ঝরানোর ফলে এই উৎসর্গ খাঁটি উৎসর্গ হল। আর কোন সৃষ্ট প্রাণী এই প্রায়শ্চিত্ব করতে পারে না; শুধুমাত্র যীশু তা করতে পেরেছেন, কারণ তিনি নিজেই ঈশ্বর। সেজন্যই যীশু একজন খাঁটি মানুষ হয়ে এসে মানুষের জন্য চূড়ান্ত উদ্ধার পরিকল্পনা সাধন করলেন– এটাই যীশুর ঈশ্বরত্বের নিশ্চিত এবং শক্ত প্রমাণ।

যদিও যীশু হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তবুও ঈশ্বরত্ব ত্যাগ করে তিনি নিজেকে পুরোপুরি শূন্য করলেন (ফিলিপীয় ২:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি মানুষ হয়ে এসে সব ধরনের অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করলেন এবং

আমাদের পাপের জন্য মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তিনি আমাদের জন্য নিজের জীবনের বিনিময়ে অনন্ত জীবন দিয়েছেন (যোহন ৩:১৬; ৫:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি হয়েছেন আমাদের প্রভু, আমাদের মালিক ও আমাদের বন্ধু (যোহন ১৫:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। সেজন্য আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে প্রভু যীশুকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানানো উচিত, যিনি হচ্ছেন আলফা ও ওমিগা– শুরু ও শেষ। তিনি আমাদের জীবন ও মৃত্যুর, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা।

এই সত্য বুঝতে পারাটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু মুক্তমনা ঈশতত্ত্ববিদেরা এটা বুঝতে পারে না, তাই তারা একমাত্র প্রভু ও উদ্ধারকর্তা বলে যীশুর পরিচয় অস্বীকার করে ধর্মীয় বহুত্ববাদের ফাঁদে পতিত হচ্ছে। কারণ ধর্মীয় বহুত্ববাদ স্বীকার করে– অন্য ধর্মের মধ্যেও উদ্ধার পাওয়া যায়। যখন আমরা ঈশ্বরের গভীর ভালবাসা মানুষ যীশুর মধ্যে দেখি, তখন যীশুর সত্যিকার পরিচয় নিয়ে যারা বিপক্ষতা করে, তাদের সকল আক্রমণ প্রতিহত করে এই শেষ সময়ের বিভিন্ন প্রলোভন থেকে আমরাও বিজয় অর্জন করতে পারি।

পাঁচ
উপসংহার

এই পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে, যা মূলত একেশ্বরবাদ এবং বহু ঈশ্বরবাদ বলেই বিভক্ত। মৌলিকভাবে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম বলতে প্রাচীন বা লোক ধর্মীয় মতবাদ, সামান মতবাদ, সর্বপ্রাণবাদ, কনফুসিয়ান মতবাদ, তাও মতবাদ, শিন্টো মতবাদ, বৌদ্ধ মতবাদ, হিন্দু মতবাদ, জোরেয়াস্ত্র মতবাদ, শিখ মতবাদ, নতুন যুগের আন্দোলন ইত্যাদি বলা যায়। অন্যদিকে, যিহূদী ধর্মীয় মতবাদ, ইসলাম ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্মীয় মতবাদ একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত।

বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়– যখন খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর, যিহূদীদের ঈশ্বর এবং ইসলামের ঈশ্বর ভুলক্রমে একই বলে বিশ্বাস করা হয়। যেহেতু এই তিন একেশ্বরবাদী ধর্মের পটভূমি এক, সেহেতু এক নজরে মনে হতে পারে– তারা সকলেই একই ঈশ্বরের উপাসনা করে।

এই প্রেক্ষীতে বোঝা যায় যে, ইসলামের আল্লাহ, যিহূদীদের ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষ করে, খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য যীশুই যে একমাত্র পরিত্রাণ বা উদ্ধারকর্তা; ইসলাম ও যিহূদী ধর্মে এই মৌলিক পার্থক্য স্পষ্টই দেখা যায়। অন্য ভাবে বলা যায়, একমাত্র খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম যীশুকে ঈশ্বর হিসাবে এবং উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ বলে স্বীকার করে, ইসলাম ও যিহূদী ধর্মে তা স্বীকার করে না। ইসলাম ও যিহূদী ধর্ম পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর স্বীকার করে না এবং যীশুকেও পুত্র ঈশ্বর বলে স্বীকার করে না; কারণ তা একেশ্বরবাদী ধর্মের নীতি থেকে আলাদা, যেখানে ঈশ্বর মাত্র একজনই। তাছাড়াও, যিহূদীরা যীশুর বলা "আমি আর পিতা এক" এই বক্তব্য অনুসারে তাঁকে ধর্ম নিন্দুক আখ্যা দিয়ে ক্রুশে দিয়েছে (মথি ২৬:৬৫; যোহন ১০:৩৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

বাস্তবিক, একই সময়ে যীশুর ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব বোঝা খুব একটা সহজ বিষয় নয়। কারণ, মানবিক যুক্তিতে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিসত্তা এবং তাদের সম্পর্ক বোঝা খুবই কঠিন। আসলে পুত্র ঈশ্বর তাদের একজন, যিনি আদমের পতনের পর আমাদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন। তাই, তাঁকে আমরা বলি উদ্ধারকর্তা এবং এই উদ্ধারকর্তাই হচ্ছেন যীশু (মথি ১:২১ পদ দ্রষ্টব্য)।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মে ত্রিত্ব ঈশ্বরের এরকম সম্পর্ক প্রকাশ করে নাই। আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা, যীশুর অনুগ্রহে এবং পবিত্র আত্মার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ত্রিত্ববাদের রহস্য বিশ্বাস করি এবং ঈশ্বরীয় ত্রিত্বকে মেনে চলি, সম্মান করি, প্রশংসা করি, গৌরব করি এবং উপাসনা করি। আমাদের মানবিক যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। একমাত্র যীশুর অনুগ্রহে (দয়ায়) তা দেওয়া হয়েছে (ইফিষীয় ২:৮-৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই রহস্য সঠিকভাবে বোঝার জন্য প্রাথমিক যুগের মন্ডলীর সময় থেকে এক দীর্ঘ সময় খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে পার হয়ে গেছে। ত্রিত্বের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝতে নানা পরীক্ষা ও ভ্রান্তি ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই বিষয় নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

"এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি।" (মথি ২৮:১৯-২০ পদ)

ত্রিত্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক
ভূমিকা

আগের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি, খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর হচ্ছেন ত্রিত্ব ঈশ্বর– অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। এই ত্রিত্ব ঈশ্বর মানব ইতিহাসের এক সময় মানব জাতিকে পরিত্রাণ বা উদ্ধার করতে 'স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশে' পুত্র ঈশ্বরকে পাঠালেন (আদিপুস্তক ৩:১৫; মথি ১:১৮-২৩; গালাতীয় ৪:৪ পদ দ্রষ্টব্য)। পুত্র ঈশ্বর ক্ষণকালের জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা মরিয়মের গর্ভে এসেছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর মানবিক পিতার রক্ত বা ডি,এন,এ পান নাই।

যে কারণে তিনি নিজে মানুষ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন; কারণ তিনি হচ্ছেন পুত্র ঈশ্বর ও সবকিছুর বাস্তবায়নকারী। তিনি নিজে যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেই পৃথিবীতে যীশু হিসাবে আসলেন। যীশু নামের অর্থ উদ্ধারকর্তা (মথি ১:২১ পদ দ্রষ্টব্য) এবং ইম্মানূয়েল (মথি ১:২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত পরিত্রাণ বা উদ্ধারের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতেই তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। ইম্মানূয়েল শব্দের অর্থ হচ্ছে, "আমাদের সংগে ঈশ্বর"। তার মানে, 'ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা, পুত্র ঈশ্বর মানুষ হয়ে মানব ইতিহাসে আসলেন'। ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, অর্থাৎ যীশুর জন্মেরও ৭০০ বছর আগে নবী যিশাইয়ের বলা ভবিষ্যদ্বাণী এভাবেই পূর্ণ হয়েছিল (যিশাইয় ৭:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। এই মহান বাণী খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের ভিত্তি এবং খ্রীষ্টিয়ান ঈশতত্ত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

পুত্র ঈশ্বরের যেমন রয়েছে খাঁটি মানবত্ব, ঠিক তেমনি রয়েছে খাঁটি ঈশ্বরত্ব। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম মূলত পুত্র ঈশ্বরের এই দুই দিকের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য, অবশ্যই সঠিকভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রকৃতি আমাদের বুঝতে হবে।

যদি মানবিক যুক্তি-বুদ্ধির উপরে নির্ভর করি, তাহলে ত্রিত্ব ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বরের দুটি বিপরীতধর্মী দিক সম্পর্কিত ধারণা মেনে নেওয়া আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। সেজন্যই প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক ভ্রান্ত দলের উত্থান ঘটেছিল, যারা খুব স্বাভাবিক ভাবে মানবিক যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ত্রিত্ব বাদ বুঝতে চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই তারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের অপরিহার্য উপাদানের বিপক্ষতা করেছিল। কেউ কেউ এই ভুলের বশবর্তী হয়ে যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করেছিল এবং কেউ কেউ তাঁর মানবত্বকে অস্বীকার করেছিল।

সেই কারণে, প্রথম যুগের মন্ডলীর সময়কালে ত্রিত্ববাদের চিন্তা-চেতনা অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়েছিল। এই কাজ করতে প্রথম যুগের পাঁচ মন্ডলী অঞ্চলের নেতৃবর্গ (আলিকজান্দ্রিয়া মন্ডলী, যিরূশালেম মন্ডলী, আন্তিয়খিয়া মন্ডলী, কনস্টানটিনেপল মন্ডলী এবং রোমের মন্ডলী) একত্রে মিলে এক সার্বজনীন মহসভার ব্যবস্থা করে। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নাইসিয়াতে প্রথম সার্বজনীন মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের ত্রিত্ব সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা সেখান থেকে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে।

এই অধ্যায়ে, আমরা প্রথম শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিত্ব মতবাদকে অস্বীকার করেছে এমন ভ্রান্ত মতবাদগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব। আমরা আরও দেখব, ভ্রান্ত মতবাদগুলোর বিপরীতে কি করে ত্রিত্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

দুই
ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচয় নিয়ে বিপক্ষতা

যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের অপরিহার্য অস্থিত্ব এবং খ্রীষ্টিয়ান ঈশতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু। খ্রীষ্টিয়ান ঈশতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু যীশুর সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব এবং সম্পূর্ণ মানবত্ব অস্বীকার করা মানে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে অস্বীকার করা। তাই ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভাবকেরা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব এবং মানবত্বকে গুরুতরভাবে বিপক্ষতা করে থাকে। তারা বিশেষ করে, পুত্র ঈশ্বর যীশুর মানব দেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আগমনের বিপক্ষতা করে। শয়তান ভাল করেই জানে যে, এই সত্যকে দুর্বল ও বিকৃত করতে পারলে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে ধ্বংস করা যাবে। সেই জন্যই, প্রথম শতাব্দী থেকেই সে যীশুর সত্যিকার পরিচয়ের বিপক্ষতা করে লোকদের প্রতারিত করে আসছিল।

ক) প্রথম শতাব্দীর ভ্রান্ত মতবাদঃ পুত্র ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বকে অস্বীকার

প্রথম শতাব্দীতে বেশ কয়েকটা ভ্রান্ত মতবাদ গড়ে উঠেছিল, যা যীশুর ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বকে অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে ইবিয়ন মতবাদ (Ebionism), নষ্টিক মতবাদ (Gnosticism), ডসেও মতবাদ (Docetism) এবং এসসেটিক মতবাদ (Asceticism) প্রধান। এখন আমরা তাদের চিন্তা-ভাবনা ও পটভূমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করি।

১) ইবিয়ন মতবাদ– যীশুর ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার

এই মতবাদ ভুল, কারণ এই মতবাদ যীশুর ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করেছে। প্রেরিত্ পৌলের প্রতিষ্ঠিত গালাতীয় মন্ডলী থেকে যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা মূলত এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু এই মতবাদের অনুসরণকারীরা যিহূদী ঈশ্বরকে জানত, সেহেতু তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে– যীশু ঈশ্বর নয়, তিনি শুধুমাত্র একজন ভাববাদী বা নবী ও পবিত্র মানুষ ছিলেন। আবার, যেহেতু তারা যিহূদীদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে অভ্যস্ত ছিল, তাই তাদের বিশ্বাস- যীশুর মধ্য দিয়ে নয় কিন্তু মোশির আইন-কানুন পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ পরিত্রাণ বা উদ্ধার পেতে পারে।

২) নস্টিক মতবাদ– যীশুর মানবত্বকে অস্বীকার

ইবিয়ন মতবাদের ঠিক উল্টো হচ্ছে নস্টিক মতবাদ। এই মতবাদ প্রথম শতাব্দীতে উদ্ভূত একটা ভ্রান্ত মতবাদ, যা যীশুর মানবত্বকে অস্বীকার করেছে। নস্টিক মতবাদের অনুসারীরা বিশেষ করে যীশুর মানুষ হয়ে আসার ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করেছে। এই ধারণা বাস্তবিকভাবে গীর্জাতে আসা সুসমাচারে বিশ্বাসী যিহূদী ও অযিহূদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

গ্রীক শব্দ ‘নসিস’ (Gnosis) থেকে এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে। নসিস শব্দের ইংরেজি অর্থ হচ্ছে ‘জ্ঞান’ এবং “নস্টিসিজম” বা নস্টিক মতবাদ বা জ্ঞানবাদ হচ্ছে তাদের বিশ্বাসের রীতি-নীতি। তারা বিশ্বাস করে যে, আত্মিক উপায়ে জ্ঞান অর্জন হচ্ছে সত্যিকার জ্ঞান এবং আত্মিকতা বহির্ভূত জ্ঞান সত্যিকার জ্ঞান নয়। অন্যদিকে, এই জ্ঞান হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে সত্যিকার আত্মিক দিক জানা। এর উল্টোটা হচ্ছে, নস্টিকদের মতে অনাত্মিক বিষয় জানা, বিশেষত দৃশ্যমান ও অনুভব করা যায় এমন জাগতিক বিষয় সত্যের পর্যায়ে পড়ে না।

যারা এইরকম চিন্তা অনুসরণ করে থাকে, তাদের ভাষ্য- ‘যীশুর এই পৃথিবীতে আসা মানে’ ‘ঈশ্বর অসত্য’, আর তাই তাদের কাছে এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা মনে করে, এই ঘটনা একেবারেই অসম্ভব এবং খ্রীষ্টিয়ানদের জন্যও অপমানজনক। সেজন্য, তারা যীশুর মানবত্বকে সোজাসুজি অস্বীকার করে।

এছাড়াও, নস্টিক মতবাদের অনুসারীদের জন্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম আত্মিক সত্যের অংশবিশেষ লালন-পালন করে থাকে। তারা আরও মনে করে যে, দেহ পচে- গলে শেষ হয়ে যাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাই তারা জাগতিক ও

বৈষয়িকভাবে দেহকে মন্দভাবে দেখে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, পরিত্রাণ বা উদ্ধার দেহ থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। তারা মনে করে, পরিত্রাণ বা উদ্ধার পেতে তাদের কষ্ট ও উপবাস করতে হবে। এভাবে দেহকে কষ্ট দিলে নিঃসন্দেহে তাদের মন পবিত্র হবে বলে তারা বিশ্বাস করে।

৩) নস্টিক মতবাদ থেকে উদ্ভূত ভ্রান্ত মতবাদগুলো

প্রথম দিকে নস্টিক মতবাদ ছিল একটা ধারণা মাত্র, তবু এখান থেকেই ডসেটিজম (Docetism) ও এসেটিকইজম (Asceticism) এর মত ভুল মতবাদ বিস্তার লাভ করে, যারা যীশুর মানবত্বকে অস্বীকার করেছে।

(এক) ডসেটিজম (Docetism)

গ্রীক শব্দ ডকেও (Dokeo) থেকে ডসেটিজম (Docetism) গৃহীত হয়েছে, যার মানে বাংলায় 'মনে হয়' বা 'বোধ করি' বা 'সম্ভবত' বলা যেতে পারে। এই চিন্তা বা ধারণা দাবী করে থাকে, যদিও যীশুকে বাস্তবিক মানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু তিনি মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন আত্মা। এই চিন্তা অনুসারে, যেহেতু জাগতিক সব কিছুই অপবিত্র, তাই ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসতে পারেন না– কারণ মানুষ পার্থিব জগতের। তাই তারা দাবী করে যে, যীশু এই পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে এসেছিলেন, কিন্তু যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম নেবার পরে তিনি ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

(দুই) এসেটিকইজম (Asceticism)

এসেটিকইজম ধারণাটি নস্টিক ধারণার মতই। তাদের মতে, জাগতিক ও মাংসিক সব কিছুই মন্দ, কিন্তু শুধুমাত্র আত্মা হচ্ছে সত্য। তাই এই বিশ্বাসের ধারণা অনুসারে তারা উপবাস, কষ্টভোগ ও প্রায়শ্চিত্ব ইত্যাদি দ্বারা দেহকে লাঞ্ছিত করতে প্রস্তুত থাকে। উদাহরণ হিসাবে, ক্যাথলিক মন্ডলীতে এক হাঁটু দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার প্রচলন রয়েছে। নিজের দেহকে কষ্ট দেওয়ার এই উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও, ফিলিপাইনের কোন কোন ক্যাথলিক মন্ডলীতে পূণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থানের পবিত্র সপ্তাহে সত্যিকারভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করার মত প্রথা প্রচলিত আছে। এরকম কঠোর দৈহিক কষ্ট তথাকথিত অর্থোডক্স গোষ্ঠী অনুমোদন করে থাকে, যা মধ্য যুগের খ্রীষ্টিয় মন্ডলীর ইতিহাসে সুস্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়।

খ) দ্বিতীয় শতাব্দীর ভ্রান্ত মতবাদ: পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে অস্বীকার

উপরে উল্লেখিত প্রথম শতাব্দীর ভ্রান্ত ধর্মীয় মতবাদগুলো খ্রীষ্টিয়ান জগতে ক্রমাগত আঘাত করে আসছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কে একটা নতুন ভ্রান্ত ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার উত্থান ঘটে, যা খ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে আরও দুর্বল করে তোলে। এই ভ্রান্ত মতবাদকে মন্টানিজম (Montanism) বলা হয়।

১) মন্টানিজম (Montanism)

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে মন্টানিয়াস নামে একজন ব্যক্তি এক ভ্রান্ত ধর্মীয় চিন্তা- চেতনার ঘোষণা দেন। তার মতে, প্রথম শতাব্দীতে পঞ্চাশত্তমীর দিনে মার্কের উপরতলার কামরাতে পবিত্র আত্মা যীশুর শিষ্যদের উপরে অবতরণ করেন নাই; কিন্তু পবিত্র আত্মা শুধুমাত্র তার সময়ে (দ্বিতীয় শতাব্দীতে) এসেছিলেন। এই কথার উপর ভিত্তি করেই মন্টানিয়াস দৃঢ়ভাবে বলেন যে, পবিত্র আত্মা শুধুমাত্র তার মধ্য দিয়েই কথা বলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে দাবী করেছিলেন যে, তিনি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পান।

গ) তৃতীয় শতাব্দীর ভ্রান্ত মতবাদঃ ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী জুড়ে এই ভ্রান্ত ধর্মীয় মতবাদগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, কারণ মন্ডলীগুলো ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিক বাইবেল-ভিত্তিক সংজ্ঞা উদ্ভাবন করতে পারে নাই। এভাবে তৃতীয় শতাব্দীতে ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কিত মতাদর্শের ধারাবাহিক ধারণা আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। ঈশতত্ত্ববিদদের মধ্যে সেবেলিয়াস (Sabellius) নামে একজন প্রধান ঈশতত্ত্ববিদ অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছিলেন, যিনি বাহ্য আকৃতির রাজতন্ত্রবাদের (Modalistic Monarchianism) নীতি তুলে ধরেছিলেন, যা শুধুমাত্র এক ব্যক্তির তিন ব্যক্তিসত্তার প্রকারভেদ মাত্র।

১) বাহ্য আকৃতির রাজতন্ত্রবাদ (Modalistic Monarchianism)

সাবেল্লিয়াস (Sabellius) নামে একজন ঈশতত্ত্ববিদ বাহ্য আকৃতির রাজতন্ত্রবাদের (Monarchianism) একটি ভ্রান্ত ধারণা চালু করেন। অনেকের কাছে তা আবার সাবেল্লিয় মতবাদ (Sabellianism) নামে পরিচিত। তার মতে, ঈশ্বরীয় ব্যক্তিসত্তা শুধুমাত্র একজনই। অন্যভাবে বলা যায়, ঈশ্বরের একক ব্যক্তিসত্তা তিনটি ভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কখনও পিতা ঈশ্বর, কখনও পুত্র ঈশ্বর এবং কখনও বা পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হিসাবে কাজ করে থাকেন।

প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য মন্ডলীগুলো ত্রিত্ববাদ সম্পর্কিত এই ভ্রান্ত মতবাদের বিরোধিতা করে। এই ধারণা ঈশ্বরত্বের তিন ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করে বলেই পরবর্তীতে এই মতবাদকে ভ্রান্ত মতবাদ হিসাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বর্তমানেও এমন অনেক মুক্তমনা, প্রগতিশীল এমনকি সুসমাচার-কেন্দ্রিক ঈশতত্ত্ববিদ রয়েছেন যারা ত্রিত্ব সম্পর্কে এই বাহ্য আকৃতির মতবাদ পালন করেন এবং শিক্ষা দেন। দুঃখজনকভাবে বলতে হয় যে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তা মূলত একজনই। আবার, একই সময়ে তাঁরা প্রত্যেকে এক একজন বিশেষ ব্যক্তিসত্তা। সাবেল্লিয় মতবাদের বিশ্বাসীরা এই সত্য বুঝতে সক্ষম হয় নি।

ভুলভাবে যীশুর ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার	ভুলভাবে যীশুর মানবত্বকে অস্বীকার	ভুলভাবে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে অস্বীকার	ভুলভাবে ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার
ইবিয়ন মতবাদ (Ebionism)	নস্টিক মতবাদ (Gnosticism)	মন্টানিজম (Montanism)	রাজতন্ত্রবাদ (Monarchianism)
আরিয়ান মতবাদ (Arianism)	ডসেটিজম (Docetism)		
	এসেটিকইজম (Asceticism)		

তালিকা ২-১: প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর ভ্রান্ত মতবাদগুলো

ঘ) চতুর্থ শতাব্দীর ভ্রান্ত মতবাদঃ ত্রিত্ববাদ অস্বীকার

আমরা এখন পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি যে, ঈশতত্ত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত শিক্ষার কারণে খ্রীষ্টিয়ান জগতের প্রথম তিনশ বছর এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষভাবে, চতুর্থ শতাব্দীতে আরিয়ান মতবাদ (Arianism) নামে একটি নতুন ধারণা খ্রীষ্টিয়ান জগতকে আক্রমণ করে।

১) আরিয়ান মতবাদ- যীশুর ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার

চতুর্থ শতাব্দীতে আরিয়ান মতবাদ (Arianism) তাদের ভ্রান্ত শিক্ষার কারণে খ্রীষ্টিয়ান সমাজকে দুর্যোগে ফেলে দেয়। আরিউস (২৭০-৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একজন ঈশতত্ত্ববিদ এই ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার মন্ডলীর পালকদের মধ্যে অন্যতম একজন। ঐ সময়ে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে অনেক যিহূদী বসবাস করত। আরিউস যিহূদী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং একমাত্র পিতা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন। তিনি যীশুর ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করেন এবং এক নতুন মতবাদ উদ্ভাবন করেন, যা তথাকথিত আরিয়ান মতবাদ (Arianism) নামে পরিচিত। এই মতবাদ শুধুমাত্র পিতা ঈশ্বরকে স্বীকার করে। আরিউসের মতবাদ অনুসারে যীশু একজন মানুষ, কিন্তু সকল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

সেই সময়ে আরিয়ান মতবাদ (Arianism) খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং বর্তমান ২১ শতাব্দীতেও এর প্রভাব রয়েছে। বর্তমানেও বেশ কয়েকটি খ্রীষ্টিয়ান গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আছে, যারা এই মতবাদের অনুসারী। এগুলোর মধ্যে 'যিহোবার সাক্ষী' বা Jehovah's witneses এবং 'ইউনিটারিয়ান মতবাদ' বা Unitarianism বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গোষ্ঠীগুলো ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং শুধুমাত্র পিতা ঈশ্বরকে অনুমোদন করে।

ইসলাম ধর্মও আরিয়ান মতবাদের শিক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত। ৫৭০-৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম শুরু করার আগে তিনি একজন সিরিয়ান অর্থোডক্স সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যিনি আরিয়ান মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তাই, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার সময়ে তিনি তার ধর্মে আল্লাহকে একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি আগে থেকেই আরিয়ান মতবাদের শিক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সেহেতু বলা যায় যে, আরিয়ান মতবাদের ধাঁচে ইসলাম ধর্মের সূত্রপাত ঘটেছে।

২) ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী বা Unitarianism

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭০০ শতাব্দী থেকে বর্তমান)

বিশেষত, ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী বা Unitarianism আজকের দিনেও সারা পৃথিবী জুড়ে খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়গুলোকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করছে। এই ভ্রান্ত মতবাদ মানবিক এবং সামাজিক কর্মকান্ডের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এই সম্প্রদায় ত্রিত্ববাদ, যীশুর কুমারী মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ, পুনরুত্থান, নরক ও অনন্তকালীন শাস্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো অস্বীকার করে। তাদের মতে, বাইবেলে উল্লেখিত ঘটনাবলীর এই সব বিষয়গুলো শুধুমাত্র অতিপ্রাকৃত এবং মানবিক বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মীয় সংস্কারের পর পরই এ্যানাব্যাপ্টিষ্ট সদস্য মন্ডলী, প্রেসবিটারিয়ান, কনগ্রিগেশনাল মন্ডলী ও ইংল্যান্ডের এ্যাংলিকান মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে থেকে ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarianism) সম্প্রদায়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। জন বিড্‌লে (১৬১৫-১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন ইংরেজ জাতির ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarianism) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ের সমর্থকদের মধ্যে কবি জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ), দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ), বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী চার্লস্ ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখযোগ্য। আমেরিকাতে কবি ও দার্শনিক রাফ্ ওয়াল্ডো ইমারসন (১৮০৩-১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ) এই ধারণার অনুসারী ছিলেন। আজকের বিবর্তনবাদ এবং জন ডিউইর-এর নাস্তিকতাবাদ শিক্ষা ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarian) চিন্তা-চেতনা থেকেই উদ্ভব হয়েছে।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের লন্ডনে একজন মুক্তমনা এ্যাংলিকান পালক প্রথম ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarian) মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। আঠারোশো শতাব্দীতে নিউ ইংল্যান্ডের ম্যাসাচুসেট নামক স্থানে ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarian) আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার ফলে সেখানে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন এ্যাংলিকান মন্ডলীর পালক জেমস্ ফ্রিম্যান (১৭৫৯-১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) নিউ ইংল্যান্ডের কিংস চ্যাপেল নামে এক পুরানো এ্যাংলিকান মন্ডলীকে প্রথম ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী মন্ডলী বা Unitarian Church হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তীতে নিউ ইংল্যান্ডের অনেক কনগ্রেগেশনাল মন্ডলী ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarian) মন্ডলীর সাথে যুক্ত হয়। ফলে আজকের দিনে নিউ ইংল্যান্ডে ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarian) সম্প্রদায় এক বিশাল ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠেছে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইংল্যান্ডের ম্যাসাচুসেটস-এর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ঈশতত্ত্ব সেমিনারী ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarian) শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই ইউনিভার্সিটি যীশু খ্রীষ্টের ঐশী আর্বিভাব অস্বীকার করার বিষয় প্রকাশ্যভাবে শিক্ষা দিতে শুরু করে।

১৭০০ থেকে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উঁচু শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী (মিল্টন, লক, নিউটন, ডারউইন, ডিউই ইত্যাদি) ব্যক্তিদের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী (Unitarian) শিক্ষাব্যবস্থা আরিয়ান মতবাদকে পিছনে ফেলে পৃথিবীর উঁচু পর্যায়ের কলেজগুলোতে পর্যন্ত প্রচলিত হয়ে আসছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বের উঁচু পর্যায়ের কলেজগুলোতে ত্রিত্ব ঈশ্বর এবং যীশুর ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করার ভ্রান্ত শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, আরিয়ান মতবাদের কঠিন প্রভাব সম্পর্কে জেনেও আমাদের কিছুই করার নেই।

তিন
ত্রিত্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা

চতুর্থ শতাব্দীতে আরিয়ানের ভ্রান্ত মতবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং খ্রীষ্টিয়ান জগতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে প্রথম যুগের পাঁচ মন্ডলী অঞ্চলের প্রতিনিধিরা (আলেকজান্দ্রিয়া মন্ডলী অঞ্চল, যিরূশালেম মন্ডলী অঞ্চল, আন্তিয়খিয়া মন্ডলী অঞ্চল, কনস্টানটিনেপল মন্ডলী অঞ্চল এবং রোম মন্ডলী অঞ্চল) খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক স্থানে মিলিত হন।

প্রত্যেক মন্ডলী অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, মতবাদ, সংস্কৃতি ও ভাষার বিভিন্নতা ছিল। যদিও তারা বলেছিল যে, তারা যীশুতে সকলেই এক, তবু কাজ করতে গিয়ে বেশ কষ্টকর পরিস্থিতিতে তাদের পড়তে হয়েছিল। কিন্তু আরিয়ান মতবাদের কঠিন বাধার সামনে পড়ে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এই সমস্যা সমাধানে একত্রে মিলিত হয়েছিল। এভাবেই 'সার্বজনীন পরিষদ' (Ecumenical Council) গঠিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার মন্ডলীর আর্চ বিশপ এথানাসিয়াস (২৯৬-৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) এই কাজে এগিয়ে আসেন। ভ্রান্ত ধর্মীয় শিক্ষাগুলো প্রত্যাখ্যান করার লক্ষ্যেই মূলত এই পরিষদ গঠিত হয়।



মানচিত্র ২-১ : প্রথম যুগের পাঁচটি খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলী অঞ্চল

ক) পাঁচটি মন্ডলী অঞ্চল

খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বড় বড় পাঁচটি মন্ডলী অঞ্চলের উদ্ভব হয়েছিল। এই মন্ডলীগুলো হচ্ছে- যিরূশালেম মন্ডলী, আন্তিয়খিয়া মন্ডলী, আলেকজান্দ্রিয়া মন্ডলী, কনস্টানটিনেপল মন্ডলী এবং রোমের মন্ডলী।

এখানে মন্ডলী বলতে একটি গীর্জাঘরকে বোঝানো হয় নি, কিন্তু স্থানীয় খ্রীষ্টিয়ানেরা যে অঞ্চলে একত্রে সহভাগিতায় বসবাস করে, মূলত তাকেই মন্ডলী বলা হয়ে থাকে। সেই জন্য, এখানে আমরা মন্ডলী অঞ্চল বলতে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলকে চিহ্নিত করতে পারি এবং মন্ডলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে পারি।

১) আলেকজান্দ্রিয়া মন্ডলী

আলেকজান্দ্রিয়া শহরে যে মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিল, তা-ই আলেকজান্দ্রিয়া মন্ডলী নামে পরিচিত হয়। এই শহর মিসরের একটা বন্দর শহর ছিল। সাধু মার্ক এই মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন। এই মন্ডলী স্থাপনের সময়কাল নিয়ে দুই রকম মতবাদ প্রচলিত ছিল। বলা হয়, ৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক এই মন্ডলী স্থাপন করেন। পরবর্তীতে, ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধু মার্ক আলেকজান্দ্রিয়া শহরে শহীদ (সাক্ষ্যমর) হন।

তাছাড়াও, আলেকজান্দ্রিয়া শহর খুবই বিখ্যাত ছিল। কারণ বাইবেল পন্ডিতেরা এখানে সমবেত হয়ে গ্রীক ভাষায় পুরাতন নিয়ম বাইবেল অনুবাদ করেন। মূলত, এই অনুবাদ আলিকজান্দ্রিয়ায় বসবাসকারী যিহূদীদের জন্যই করা হয়েছিল, যারা দীর্ঘদিন এখানে থাকতে থাকতে তাদের মাতৃভাষা হিব্রু একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। সত্তর জন যিহূদী পন্ডিত ২৮৪-২৪৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হিব্রু ভাষায় লিখিত পুরাতন নিয়ম বাইবেল গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা এই বাইবেল সেপ্টুয়াজিন্ট (Septuagint) নামে পরিচিত (সত্তর জন অনুবাদক একত্রে এই কাজ করেছিলেন)। ল্যাটিন ভাষায় ৭০ মানে হচ্ছে সেপ্টুয়াজিন্টা (Septuaginta)।

পরবর্তীতে, খ্রীষ্টিয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রিয়াতে অনেক বিখ্যাত ঈশতত্ত্ববিদদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন ক্লেমেন্ট (১৫০-২১৫ খ্রীষ্টাব্দ), অরিজেন (১৮০-২৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) এবং এথেনাসিয়াস (২৯৬-৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)। আদি মন্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানদের মাঝে খ্রীষ্টিয়ান মতবাদের মৌলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করতে তারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে, আলেকজান্দ্রিয়া মন্ডলী মিসরের কপটিক অর্থডক্স মন্ডলী হিসাবে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে মিসরের প্রায় ৮ কোটি অধিবাসীদের মধ্যে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০-১৫ ভাগ অথবা (অর্থাৎ প্রায় ৮০ থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ) এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

২) যিরূশালেম মন্ডলী

প্রেরিত্ পিতর ও যাকোবের নেতৃত্বে যীশু খ্রীষ্টের ১২জন শিষ্যেরা মিলে যিরূশালেম মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন। খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসে প্রথম মন্ডলী হিসাবে এই মন্ডলীর নাম লিপিবদ্ধ আছে। যীশুর স্বর্গারোহণের পরে, তাঁরই আদেশ অনুসারে মার্কের উপরতলার ঘরে তাঁর শিষ্যেরা ১০ দিন ধরে প্রার্থনা করছিলেন (প্রেরিত্ ১:৬-২:৪ পদ দ্রষ্টব্য) এবং সেখানে তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এই অভিষেকের পরে শিষ্যেরা পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছিলেন। তাদের প্রচার পনেরোটা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক তাদের নিজ নিজ ভাষায় শুনতে পেয়েছিল (প্রেরিত্ ২:৫-১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। বিশেষত, ঐ দিনে পিতরের প্রচার শোনার পরে প্রায় কমবেশ তিন হাজার দিয়াসপোরা (ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যিহূদী) যিহূদী মন পরিবর্তন করে প্রভুর দিকে ফিরে এসেছিল (প্রেরিত্ ২:৪১ পদ দ্রষ্টব্য)। এইসব দিয়াসপোরা যিহূদীরা সবাই পঞ্চাশত্তমী পর্ব পালনের জন্যই যিরূশালেমে এসেছিল।

৩০ খ্রীষ্টাব্দে এভাবেই যিরূশালেম মন্ডলীর যাত্রা শুরু হয়। বাইবেল অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম দিকে এই মন্ডলী বেশ উন্নতি করেছিল এবং সদস্য সংখ্যাও বেড়ে উঠেছিল (প্রেরিত্ ২:৪৭; ৬:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু স্তিফানের শহীদ হওয়ার পরে মন্ডলীতে তাড়না আসে; ফলে মন্ডলীর সদস্যরা আশেপাশের এলাকা সহ তুর্কি অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে (প্রেরিত্ ৭:৫৪-৮:১ পদ দ্রষ্টব্য)। অতঃপর, যিরূশালেম মন্ডলীর অধঃপতন ঘটে।

৩) আন্তিয়খিয়া মন্ডলী

কালভেরির পথে যীশুর ক্রুশ বহনকারী কুরীণী দেশের লোক শিমোন এই মন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা (মার্ক ১৫:২১; প্রেরিত্ ১৩:১ পদ দ্রষ্টব্য)। যখন যিরূশালেম মন্ডলীতে ব্যাপকভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হয়েছিল, তখন যিহূদী খ্রীষ্টিয়ান সদস্য-সদস্যারা পালিয়ে গিয়ে আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল (প্রেরিত্ ৮:১; ১১:১৯ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা সিরিয়া দেশের লোকদের নিয়ে এই মন্ডলী স্থাপন করেছিল। বার্ণবা, লুকিয়, মনহেম, শৌল (পৌল) এই মন্ডলীর পরিচর্যা কাজ করেছিলেন।

আন্তিয়খিয়া মন্ডলী প্রেরিত্ পৌলকে সুসমাচার প্রচারক হিসাবে প্রচারক্ষেত্রে পাঠিয়েছিল (প্রেরিত্ ১৩:২-৩ পদ দ্রষ্টব্য)। এভাবেই পৌলের প্রথম প্রচার-যাত্রা (প্রেরিত্ ১৩:৪-১৪:২৮ পদ, ৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ), দ্বিতীয় প্রচার-যাত্রা (প্রেরিত্ ১৫:৩৬-১৮:২২ পদ, ৫০-৫২ খ্রীষ্টাব্দ), তৃতীয় প্রচার-যাত্রা (প্রেরিত্ ১৫:৩৬- ১৮:২২ পদ, ৫০-৫২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং চতুর্থ প্রচার-যাত্রা (৬২-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত একের পর এক চলেছিল। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, আন্তিয়খিয়া মন্ডলী সত্যিকার

অর্থে হচ্ছে কনস্টানটিনেপল মন্ডলী এবং রোম মন্ডলীর আত্মিক পিতা। বর্তমানে এই মন্ডলী সিরিয়ান অর্থডক্স মন্ডলী হিসাবে পরিচিত। কিন্তু এই মন্ডলীর সদস্য-সদস্যা সংখ্যা খুব কম।

৪) কনস্টানটিনেপল মন্ডলী

গ্রীসের কনস্টানটিনেপল শহরে এই মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিল। প্রেরিত্ পৌলের শিষ্য তথা আত্মিক বংশধরেরা এই মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে, এই মন্ডলী পূর্ব দিকের মন্ডলী বা গ্রীক অর্থোডক্স মন্ডলী হিসাবে বৃদ্ধি পেতে এবং পূর্ব-পশ্চিম ভাগাভাগীর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীতে, পূর্ব-পশ্চিম মন্ডলীগুলোর মতভেদের প্রেক্ষীতে অন্যসব মন্ডলীগুলোকে অনুপ্রাণীত করার ক্ষেত্রে এই মন্ডলী বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল (১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

আজকের তুরস্কের বড় একটা শহরের নাম হচ্ছে ইস্তাম্বুল এবং এই বড় শহরটার পুরানো নাম হচ্ছে কনস্টানটিনেপল। প্রাচীন গ্রীস দেশে এই শহরের নাম ছিল বাইজানটিয়াম। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট প্রথম কনস্টানটাইন যখন এই শহরকে তার রাজধানী শহর করেন, তখন তিনি শহরের নাম পরিবর্তন করে কনস্টানটিনেপল হিসাবে নতুন নাম দেন। এই শহর থেকেই প্রায় ১০০০ বছর ধরে বাইজানটাইন সংস্কৃতি উন্নতির শিখরে পৌঁছে। মূলত এই সংস্কৃতি গ্রীক-রোম ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই শহর অটোম্যান সাম্রাজ্যের (১২৯৯-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) দখলে চলে আসে এবং শহরের নাম পরিবর্তন করে ইস্তাম্বুল রাখা হয়।

৫) রোম মন্ডলী

এই মন্ডলী প্রেরিত্ পৌলের শিষ্যদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল (রোমীয় ১৬ অধ্যায়ে আমরা ৩০ জনের নাম দেখতে পাই)। প্রেরিত্ পৌলের সুসমাচার প্রচারের দর্শন ছিল এশিয়া মাইনর, গ্রীস, রোম এবং সুদূর স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি এশিয়া মাইনরে অবস্থান করা কালেও তার সুসমাচার প্রচার ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। এমনকি, তিনি তার শিষ্যদের তার যাবার আগেই রোমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (রোমীয় ১৬:১-১৬ পদ দ্রষ্টব্য), যেন তারা সেখানে গিয়ে মন্ডলী স্থাপন করতে পারে। কারণ তখনকার সময়ে রোম ছিল বিশাল রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তীতে, ইউরোপ অঞ্চলে সুসমাচার প্রচারের জন্য এই মন্ডলী তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল (রোম সাম্রাজ্য: ৬৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ- ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

মূলত রোম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তারের কারণেই রোম মন্ডলী খুবই ক্ষমতা সম্পন্ন এবং যথেষ্ট শক্তিশালী মন্ডলী অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। তাই, তারা প্রথম চারটি সার্বজনীন মহাসভাগুলোতে (First four Ecumenical Councils) তাদের ক্ষমতার প্রভাব প্রয়োগ করেছিল। বিশেষ করে, তাদের নেতৃত্বে প্রস্তাবিত মেরী সংক্রান্ত মতবাদের ধারণা (Marianism) বা মেরী পূজা খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলীর ইতিহাসকে কলংকিত করে। তথাপিও এই মতবাদ খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলীর মৌলিক মতবাদ হিসাবে স্বীকৃত হয়। অন্যদিকে, ইউরোপে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই মন্ডলী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এই কারণে রোম সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সুসমাচার প্রচারও সহজ হয়েছিল বলে তাদের ধন্যবাদ দিতে হয়।

এভাবে আমরা পর্যালোচনা করে পাঁচ মন্ডলী অঞ্চল হিসাবে যিরূশালেম মন্ডলী, আন্তিয়খিয়া মন্ডলী, আলেকজান্দ্রিয়া মন্ডলী, কনস্টানটিনেপল মন্ডলী এবং রোম মন্ডলীর নাম দেখতে পাই। আবার, পাঁচ মন্ডলী অঞ্চলগুলোর মধ্যে যিরূশালেম মন্ডলী ও আন্তিয়খিয়া মন্ডলী মূলত আদি মন্ডলীগুলোর মাতৃ-মন্ডলী হিসাবে সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। তবে এই দুই মন্ডলী ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং আজকের দিনে তাদের অস্তিত্ব খুবই অস্থিতিশীল।

তাছাড়া, এই দুই মন্ডলীর সদস্য-সদস্যারা প্রায় সবাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যিহূদিয়া থেকে গিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যিহূদী (Diaspora) ও অযিহূদীদের (Gentiles) কাছে সুসমাচার ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে, আজকের দিনে সারা পৃথিবীতে সুসমাচার ছড়িয়ে গেছে– ঠিক যেভাবে 'গমের বীজ মাটিতে পড়ে মরে এবং প্রচুর ফসল জন্মায়', তারা তেমনই হয়েছিল। তারা প্রচুর ফলে ফলবান হয়েছিল (যোহন ১২:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য, এই প্রাথমিক দুই মন্ডলীকে বাইবেল অনুসারে মন্ডলী বৃদ্ধির আদর্শ বলা যায়।

খ) প্রথম চারটি সার্বজনীন মহাসভা

যে সময়ে আরিয়ান মতবাদ মন্ডলীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, ঠিক সেই সময় পাঁচ মন্ডলী অঞ্চলের প্রতিনিধিরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সার্বজনীন মহাসভার আয়োজন করে। এইসব সার্বজনীন মহাসভাগুলোর আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব যে, আজকের খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের মৌলিক মতবাদগুলো কিভাবে ধাপে ধাপে পূর্ণতা লাভ করেছে।

১) প্রথম সার্বজনীন মহাসভা: নাইসিয়া

কনস্টানটিনেপল থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে একটা ছোট শহরের নাম নাইসিয়া। আজকের দিনে এই স্থানের নাম হচ্ছে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর। ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন মন্ডলীর প্রায় ৩১৮ জন প্রতিনিধি মিলে সেখানে সমবেত হয়ে আরিয়ূসকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ আরিয়ূসের দাবী যীশু ঈশ্বরের সৃষ্ট একজন মানুষ। এই মহাসভাতে আরিয়ূসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত বেশ কিছু প্রতিনিধি থাকায় এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয় নাই।

	কখন	কোথায়	গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহ
১	৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ	নাইসিয়া	আরিয়ান মতবাদ প্রত্যাখ্যান, নাইসিয় বিশ্বাস সূত্র গ্রহণ (প্রৈরিতিক বিশ্বাস সূত্র)
২	৩৮১ খ্রীষ্টাব্দ	কনস্টানটিনেপল	আরিয়ান ও মনটানিয়াসের মতবাদকে ভ্রান্ত বলে দোষী করা এবং ত্রিত্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত
৩	৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ	ইফিষ	মানব জাতি সম্পূর্ণ নীতিভ্রষ্ট বলে স্বীকৃতি, মেরীর চিরকুমারীত্ব ধারণা এবং মেরীকে ঈশ্বরের মা হিসাবে স্বীকার করার প্রস্তাব
৪	৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ	কালসিডন	যীশুর ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত, মেরীর চিরকুমারীত্ব ধারণা এবং মেরীকে ঈশ্বরের মা হিসাবে অনুমোদন

তালিকা ২-২: প্রথম চারটি সার্বজনীন মহাসভার সংক্ষিপ্তসার

তবে এই মহাসভা নাইসিয় বিশ্বাস সূত্র গ্রহণ করে, যা আজকের দিনে প্রৈরিতিক বিশ্বাস সূত্র নামে পরিচিত। এই বিশ্বাস সূত্রে ত্রিত্ববাদের উপরে বিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়াও খ্রীষ্টের মানুষ হয়ে আসা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী (পশ্চিমা মন্ডলী) এবং গ্রীক অর্থডক্স মন্ডলী তাদের পৃথক হবার (পূর্ব-পশ্চিম বিভক্তি: ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) আগে পর্যন্ত একসাথে এই স্বীকারোক্তি মেনে চলত। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মীয় সংস্কারের পর অধিকাংশ প্রটেষ্টান্ট গোষ্ঠী এই স্বীকারোক্তি এখনও মেনে চলছে।

২) দ্বিতীয় সার্বজনীন মহাসভা: কনস্টানটিনেপল

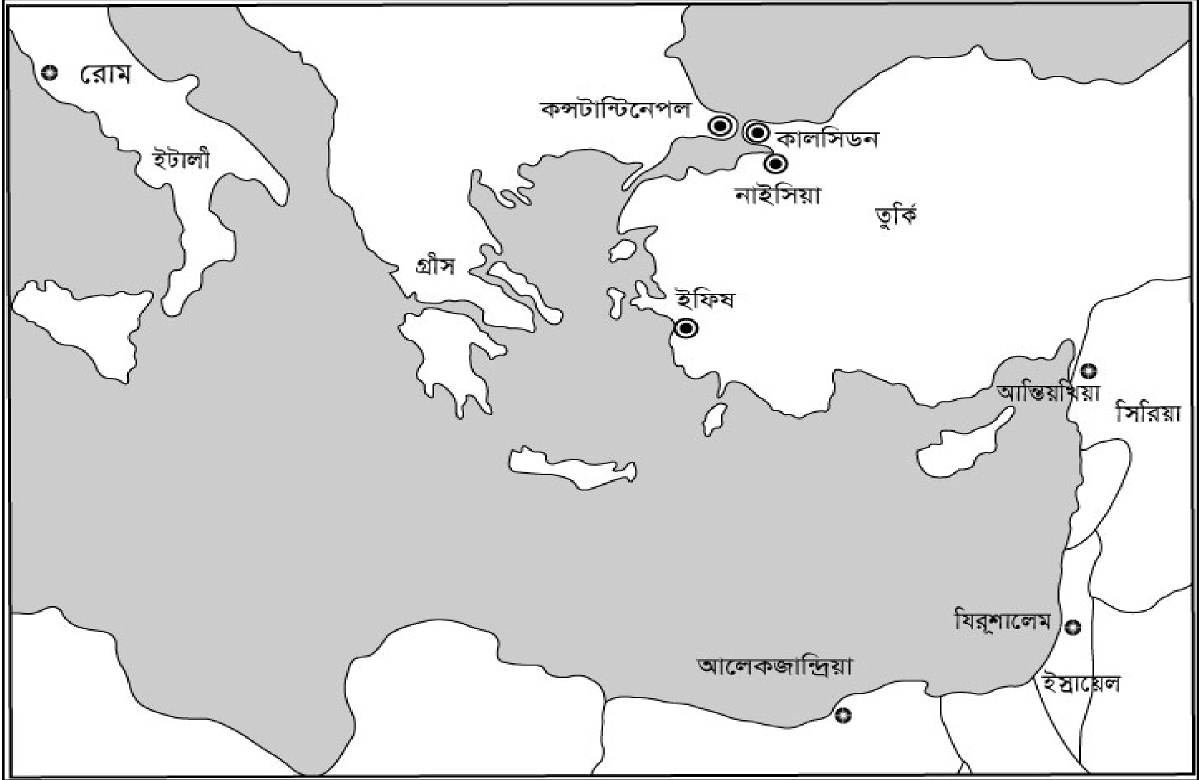
পাঁচ মন্ডলী অঞ্চলের নেতারা আবার আরিয়ূস সংক্রান্ত অমীমাংসিত বিষয় মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে এবং এক সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কনস্টানটিনেপলে দ্বিতীয় সার্বজনীন মহাসভায় সমবেত হন। ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন মন্ডলীর প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই মহাসভার আয়োজন করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়া শহরের এথানাসিয়াস (২৯৬-৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) তখন ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া মন্ডলী অঞ্চলের প্রধান বিশপ। তিনি এই মহাসভা পরিচালনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আরিয়ান ও মনটানিয়াসের মতবাদ ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করতে এবং ত্রিত্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে অবশেষে এই মহাসভা সার্থক হতে পেরেছিল।

৩) তৃতীয় সার্বজনীন মহাসভা: ইফিষ

৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ মন্ডলী অঞ্চলের ২৫০ জন প্রতিনিধি আজকের তুরস্কে (পৌলের সময়ে এশিয়া মাইনরের ইফিষ শহর) সমবেত হয়ে তৃতীয় সার্বজনীন মহাসভার আয়োজন করেন। রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী এই মহাসভা পরিচালনা করেন এবং এখানে মেরী মতবাদকে খ্রীষ্টিয়ান মতবাদের অংশ হিসাবে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই মহাসভা 'সব মানুষই নীতিভ্রষ্ট' এই গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বীকার করে নেয়।

৪) চতুর্থ সার্বজনীন মহাসভা: কালসিডন

৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ মন্ডলী অঞ্চলের ৫০০ থেকে ৬০০ প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে কনস্টানটিনেপলের কাছে ছোট একটা শহর কালসিডনে চতুর্থ সার্বজনীন মহাসভা করেন। এই মহাসভাতে যীশুর পরিপূর্ণ মানুষ ও পরিপূর্ণ ঈশ্বরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তবে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর পরিচালনায় তারা 'মেরীর চিরকুমারীত্ব' ও 'মেরী ঈশ্বরের মা' এই মতবাদ দুটি গ্রহণ করে নেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলেই আজ পর্যন্ত 'মেরী পূজা' শুধু রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে নয়, অর্থোডক্স মন্ডলীগুলোতে, এমন কি গ্রীক অর্থোডক্স মন্ডলী, সিরিয়ান অর্থোডক্স মন্ডলী, কপটিক অর্থোডক্স মন্ডলী, রাশিয়ান অর্থোডক্স মন্ডলী এবং আরও অনেক মন্ডলীর ভিত্তি হয়ে আছে।



মানচিত্র ২-২: যে শহরগুলোতে প্রথম থেকে চতুর্থ সার্বজনীন মহাসভা হয়েছিল

চার
উপসংহার

প্রথম চারটা সার্বজনীন মহাসভার পরে ত্রিত্ব মতবাদ চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তার মানে, ৩০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেম মন্ডলীর গোড়াপত্তনের পর থেকে খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসে ত্রিত্ব মতবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেতে সুদীর্ঘ ৩৫০ বছর লেগেছিল (৩৮১ খ্রীষ্টাব্দ)।

তারপর থেকেই প্রায় সব খ্রীষ্টিয়ান গোষ্ঠী বা দলগুলো ত্রিত্ব মতবাদ গ্রহণ ও অনুসরণ করতে শুরু করে। বর্তমানে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী, মিশরীয় কপটিক অর্থোডক্স মন্ডলী, ইথিয়পিয়ান অর্থোডক্স মন্ডলী, সিরিয়ান অর্থোডক্স মন্ডলী, গ্রীক অর্থোডক্স মন্ডলী, রাশিয়ান অর্থোডক্স মন্ডলী, লুথারেন মন্ডলী, এ্যাংলিকান মন্ডলী, মেথডিস্ট মন্ডলী, প্রেসবেটেরিয়ান মন্ডলী, কনগ্রিগ্রেশনাল মন্ডলী, সোসাইট অব ফ্রেন্ডস, এসেমব্লিজ অব গড, স্যালভেশন আর্মি, খ্রীষ্টিয়ান এন্ড মিশনারি এলিয়ান্স (সি,এম,এ), ইভানজেলিক্যাল ফ্রি চার্চ এবং আরও অনেক মন্ডলী ত্রিত্ব মতবাদে বিশ্বাস করে থাকে। অতঃপর, যদি কোন গোষ্ঠী বা দল ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস না করে, তাহলে তাদের ভ্রান্ত বলে ধরা হয়।

চারটি সার্বজনীন মহাসভার মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের কেন্দ্রীয় মতবাদ হিসাবে ত্রিত্ববদ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। আবার অন্যদিকে, মেরী মতবাদের মত (মেরী পূজা, মেরীর চিরকুমারীত্ব, মেরী ঈশ্বরের মা ইত্যাদি), বাইবেল বহির্ভূত বিষয় সমূহ অতি সূক্ষ্ম চাতুরির সাথে এই মহাসভার মধ্য দিয়ে মন্ডলীতে ঢুকে পড়েছে। এখন পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী এবং অর্থোডক্স মন্ডলীগুলো মেরীকে তাদের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মনে করে এবং তারা তাদের উত্তরাধিকার হিসাবে মেরী পূজাকে বহাল রেখেছে। তবে যাইহোক, প্রটেস্টান্ট পুনঃসংস্কারের জন্ম লগ্ন থেকে প্রটেস্টান্ট মন্ডলীগুলো বাইবেল বহির্ভূত এই বিষয় সমূহের বিপক্ষতা করে আসছে। তারা ত্রিত্ব মতবাদ গ্রহণ করেছে, কারণ তা বাইবেল অনুসারে সঠিক; কিন্তু মেরী মতবাদ গ্রহণ করে নাই।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ত্রিত্ব মতবাদ পর্যালোচনা করেছি, যা অন্যান্য মূল মতবাদের মত খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের একটি প্রধান মতবাদ। এখন আমরা আরও সাবধানতার সাথে নির্দিষ্ট করে আলোচনা করতে চেষ্টা করব, কেন ত্রিত্ব ঈশ্বর মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন এবং কিভাবে তিনি মানব ইতিহাসের দিক পরিবর্তন করেছেন। তাছাড়াও, কিভাবে এইসব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা মানব ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে।

"... ... আমি তাদের বলব, 'তোমরা দূর থেকে আমার ছেলেদের আর পৃথিবীর শেষ সীমা থেকে আমার মেয়েদের নিয়ে এস। আমার নামে যাদের ডাকা হয়, আমি যাদের আমার গৌরবের জন্য সৃষ্টি করেছি, যাদের আমি গড়েছি ও সৃষ্টি করেছি, তোমরা তাদের প্রত্যেককে নিয়ে এস।' " (যিশাইয় ৪৩:৬-৭ পদ)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

তৃতীয় অধ্যায়

এক
ভূমিকা

অতি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অনন্তকালীন (গীতসংহিতা ৩৩:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যভাবে বলতে হয়, ঈশ্বর অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই (যিশাইয় ৪৫:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)। পবিত্র বাইবেল অনুসারে, ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি গৌরব ও প্রশংসা পেতে পারেন (যিশাইয় ৪৩:৬-৭, ২১; রোমীয় ৯:৫; কলসীয় ১:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়াও, তিনি তাঁর সৃষ্ট কাজগুলো করে, তা দেখে খুবই খুশী হয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করেছিলেন (আদিপুস্তক ৬:৮; গীতসংহিতা ১৪৭:১১; লূক ২:১৪; ইফিষীয় ৫:১০; ইব্রীয় ১:১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

প্রত্যেক মানুষ সুখী জীবন-যাপন করতে চায়– আর সে জন্য তাকে ধন-সম্পদ, সম্মান, ক্ষমতা, পরিবার, শিক্ষা, ভাল স্বাস্থ্য এবং আরও কত কিছু পেতে সচেষ্ট হতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক এই পৃথিবী থেকে একজন যা কিছু অর্জন করে তা মরীচিকা সদৃশ। মনে হয়, যেন সে যা চায় তা পেয়ে গেছে এবং যখন সে তা ধরতে চেষ্টা করে তখন আবার অধরা থেকে যায়। অন্যভাবে, জগতের সুখ অনন্তকালীন সুখ নয় – তা সাময়িক মাত্র। মানুষ তবুও এই মায়াময় সুখ পাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপর, একদিন জীবনের শেষ লগ্নে এসে মানুষ অনুভব করতে পারে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, "এই জীবনই অসার"। খ্রীষ্টিয়ান হোক বা ন-খ্রীষ্টিয়ান হোক, যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না– নশ্বর এই পৃথিবীর জীবনের শেষ লগ্নে এসে তাকে এই স্বীকারোক্তি করতে হয়– 'সত্যিই জীবনটা অসার'।

এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ, সম্মান, ক্ষমতা, পরিবার, শিক্ষার মান, ভাল স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবই মানুষের সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে এই সবই আমাদের জীবনে অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে পরিগণিত। তবুও একজন খ্রীষ্টিয়ান যখন ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে এসব বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেয়, নির্ভর করে এবং ভালবাসে– তার মানে সেই খ্রীষ্টিয়ান একজন প্রতিমা পূজক বলা যায়। বাইবেল এটাই দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঈশ্বরের চেয়ে জগতের এই সব বিষয় বেশী প্রাধান্য দিলে খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে তা প্রতিমা পূজা সদৃশ। ন-খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য প্রতিমা পূজা এই ধারণার অন্তর্ভূক্ত নয়, কারণ জগতের সুখ-শান্তির জন্য এই সব জাগতিক বিষয়সমূহ পেতে তাদের চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য সত্যিকার সুখ উল্লেখিত প্রতিমা পূজার মধ্য দিয়ে আসে না। এই সব প্রতিমা একজন খ্রীষ্টিয়ানকে সুখী করতে পারে না, বরং তার জীবনকে দুর্যোগপূর্ণ করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। বাইবেল খ্রীষ্টিয়ানদের শিক্ষা দেয় যেন, তারা এই ধরনের প্রতিমার দিকে আসক্ত না হয় এবং জীবনের শেষ লগ্নে এসে যেন তাদের অনুতাপ করতে না হয়। কিন্তু অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ান এই পৃথিবীতে তাদের জীবনে এই শিক্ষা মান্য করে না।

তাহলে কিসে একজন খ্রীষ্টিয়ান সত্যিই সুখী হতে পারে? এর উত্তর মাত্র একটাই– যদি সে তার স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপাসনা করা, তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করা (যিশাইয় ৪৩:৬-৭, ২১; রোমীয় ৯:৫; কলসীয় ১:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। আমাদের সৃষ্টি করার পেছনে উদ্দেশ্য যেহেতু এটাই, সেহেতু সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করেই আমরা সত্যিকার সুখী হতে পারি। কারণ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এই সুখ সরাসরি আমাদের দেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা এই সুখের আনন্দ আমাদের মানবিক চিন্তারও বাইরে– মহান, সুগভীর ও চিরকালীন।

পবিত্র বাইবেলে বেশ কিছু লোক সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাইবেল ঠিক কি কি বলেছে এবং কিভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পালনের মধ্য দিয়ে আমরা জীবন-যাপন করতে পারি। ধন্য সেই খ্রীষ্টিয়ানেরা, যারা সঠিকভাবে বুঝে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে।

দুই
বাইবেলে প্রকাশিত সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ঈশ্বর নিজেই তাঁর বাক্য বাইবেলের মাধ্যমে সৃষ্টির উদ্দেশ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পুরাতন নিয়মের সময়ে ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নবী যিশাইয়কে (যিশাইয় ৪৩:৬-৭, ২১ পদ দ্রষ্টব্য) এবং নতুন নিয়মের সময়ে প্রেরিত্ পৌলকে বলেছিলেন (৫-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এখন আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখি, ঈশ্বর কিভাবে তাদের কাছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিলেন।

ক) সব সৃষ্টিই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য

ঈশ্বর তাঁর লোকদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নবী যিশাইয়ের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। "... ... ... তোমরা দূর থেকে আমার ছেলেদের আর পৃথিবীর শেষ সীমা থেকে আমার মেয়েদের নিয়ে এস। আমার নামে যাদের ডাকা হয়, আমি যাদের আমার গৌরবের জন্য সৃষ্টি করেছি, যাদের আমি গড়েছি ও তৈরী করেছি, তোমরা তাদের প্রত্যেককে নিয়ে এস" (যিশাইয় ৪৩:৬-৭ পদ)। "সেই লোকদের আমি নিজের জন্য তৈরী করেছি যাতে তারা আমার গৌরব ঘোষণা করতে পারে" (যিশাইয় ৪৩:২১ পদ)।

ঈশ্বর আবার পৌলকে বলেছিলেন, কেন তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। "ঈশ্বরের মহান ভক্তেরা ছিলেন তাদেরই পূর্বপুরুষ এবং মানুষ হিসাবে মশীহ তাদেরই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিই ঈশ্বর, যিনি সব কিছুরই উপরে; সমস্ত গৌরব চিরকাল তাঁরই। আমেন" (রোমীয় ৯:৫ পদ, ৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)। "কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর (যীশুর) দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। মহাকাশে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে (যীশুকে) দিয়ে তাঁরই (যীশুরই) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" (কলসীয় ১:১৬ পদ, ৬০ খ্রীষ্টাব্দ)।

এভাবে যখন আমরা নবী যিশাইয় এবং প্রেরিত্ পৌলের লেখা পড়ি, তখন ঈশ্বরের সব কিছু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য, এমন কি মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, তিনি তাঁর গৌরবের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। একটু বিস্তারিতভাবে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন ঈশ্বর তাঁর সব সৃষ্টির কাছ থেকে ভক্তি, সম্মান, উপাসনা, আরাধনা, শ্রদ্ধা এবং গৌরব পেতে পারেন। সৃষ্টি যখন এমনটা করে, তখন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। অতএব, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে (আদিপুস্তক ৬:৮; গীতসংহিতা ১৪৭:১১; লূক ২:১৪; ইফিষীয় ৫:১০ এবং ইব্রীয় ১:১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

পবিত্র বাইবেলে নবী যিশাইয় এবং প্রেরিত্ পৌল ছাড়াও আরও অনেকে তাদের আত্মিক চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছে– সব সৃষ্টিই ঈশ্বরের গৌরব করছে। উদাহরণ হিসাবে, দায়ূদ তার গীতসমূহে এমন দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, যেখানে দেখা যায় যে, বিশ্বব্রহ্মান্ডের সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের প্রশংসা ও আরাধনা করছে (গীতসংহিতা ১৪৮:১-১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। দায়ূদ তাঁর আত্মিক চোখ দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা এবং দয়া দেখতে পেয়েছেন- বিশ্বব্রহ্মান্ডের অগণিত গ্রহ, তারা, নক্ষত্রমন্ডলী, পৃথিবী ও তার মধ্যেকার যাবতীয় জীবন্ত প্রাণী, মানুষ সহ হাতি, সিংহ, বাঘ, তিমি মাছ, অন্যান্য ছোট-বড় মাছ, সব রকম পাখী, পোকা-মাকড়, ফুল, গাছ, জীবাণু ও জীবন্ত সব কিছুর কোষ, এমন কি প্রাণহীন বস্তু, যেমন– ধূলা, পাথর এবং সব রকমের অদৃশ্য অনুভূত বাতাস, বৃষ্টি, বরফ (আমোষ ৪:১৩ পদ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি সবকিছুই ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করছে– ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছে। এমন কি, তৃতীয় স্বর্গে অবস্থানরত স্বর্গদূতেরা সহ মাটির নীচে এ্যাবিসে থাকা সকল সৃষ্ট প্রাণীও ঈশ্বরের গৌরব করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে।

এই প্রসংগে, প্রেরিত্ যোহনের স্বীকারোক্তি হচ্ছে, ঈশ্বরকে গৌরব দেবার জন্যই সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। "আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তুমি গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য, কারণ তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ; আর তোমারই ইচ্ছাতে সেই সব সৃষ্ট হয়েছে এবং টিকে আছে" (প্রকাশিত বাক্য ৪:১১ পদ)। তিনি আরও লিখেছেন, 'তারপর স্বর্গে, পৃথিবীতে, পৃথিবীর গভীরে ও সমুদ্রে যত প্রাণী আছে, এমন কি, সেগুলোর মধ্যে আর যা কিছু আছে সকলকে আমি

এই কথা বলতে শুনলাম: "সিংহাসনের উপরে যিনি বসে আছেন তাঁর এবং সেই মেষ-শিশুর প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও ক্ষমতা চিরকাল থাকুক" '(প্রকাশিত বাক্য ৫:১৩ পদ)।

এছাড়াও, বাইবেলে এও লেখা হয়েছে যে, সব জাতি– অর্থাৎ সব মানুষ, দেশ এবং বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীও ঈশ্বরের গৌরব করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে (১ বংশাবলি ১৬:২৪-২৮; গীতসংহিতা ৯৬:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। নবী যিশাইয় চিৎকার করে ঘোষণা করেছেন, "হে সাগরে চলাচলকারীরা, সাগরের মধ্যেকার সব প্রাণী, হে দূরের দেশগুলো আর তার মধ্যেকার বাসিন্দারা, তোমরা সবাই সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে একটা নতুন গান কর, পৃথিবীর শেষ সীমা থেকে তাঁর প্রশংসার গান গাও" (যিশাইয় ৪২:১০ পদ)। দায়ূদ গান গেয়েছেন, ঈশ্বরের নাম ও তাঁর মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত, অর্থাৎ সব জাতি, সব গোষ্ঠী, সব লোকদের এবং সব রাজাদের কাছে ছড়িয়ে যাবে (গীতসংহিতা ৪৮:১০; ৬৬:৪; ৬৭:৩; ১০২:১৫ এবং ১১৭:১ পদ দ্রষ্টব্য)। প্রসংগক্রমে বলতে হয়, শুধুমাত্র একটা জাতি নয়, কিন্তু এই পৃথিবীর সকল জাতিই ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রেরিত্ যোহনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যে, সব জাতিই উদ্ধার পাবে এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁরই গৌরব করবে। "এর পরে আমি প্রত্যেক জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার মধ্য থেকে এত লোকের ভিড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুণতে পারল না। সাদা পোশাক পরে তারা সেই সিংহাসন ও মেষ-শিশুর সামনে খেজুর পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা জোরে চিৎকার করে বলছিল: 'যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, আমাদের সেই ঈশ্বর এবং মেষ-শিশুর হাতেই পাপ থেকে উদ্ধার রয়েছে।' তারপর স্বর্গদূতেরা সকলেই সেই সিংহাসনের, নেতাদের ও চারজন জীবন্ত প্রাণীর চারপাশে দাঁড়ালেন। তারা সিংহাসনের সামনে উবুড় হয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করে বললেন, 'আমেন। প্রশংসা, গৌরব, জ্ঞান, ধন্যবাদ, সম্মান, ক্ষমতা ও শক্তি চিরকাল ধরে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক। আমেন' " (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১২ পদ দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকল সৃষ্ট প্রাণীর অস্তিত্বের মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গেছে। তারা জগতের পরিবর্তনশীল সাময়িক বিষয়গুলোর উপরে নির্ভর করে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে থাকে। এই সব সাময়িক বিষয়গুলো হচ্ছে- অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, সুনাম, উচ্চশিক্ষা অর্জন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এর চেয়েও মন্দ; যখন একজন খ্রীষ্টিয়ান তার জীবনে নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিজ ব্যক্তি-পরিচিতি, নিজ উন্নতি, নিজ সার্থকতা, নিজ কৃতিত্ব, নিজ উপলব্ধি ও পরিপূর্ণতা ইত্যাদি খোঁজে এবং প্রার্থনা করে ঈশ্বরের দেওয়া সুযোগ গ্রহণ করে। এগুলোই হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য লংঘন করা।

যারা এই পৃথিবীতে বাস করে ও খ্রীষ্টিয়ান নয়, তারা এভাবে জীবন-যাপন করে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি এভাবে জীবন-যাপন করে, তাহলে তাদের জীবনে বৃথা ও নিরাশাপূর্ণ পরিণতি ঘটে (যোহন ১৫:১৯; ১ যোহন ৪:৫-৬ পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানেরা যখন সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর বাক্য পড়ে, তাঁর পরিচর্যা, উপাসনা ও সুসমাচার লোকদের কাছে বলে এবং তাঁর সুসমাচার প্রচার ক্ষেত্রের কাজে আত্মনিবেদিত হয়; তখন তারা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্যিকার আনন্দ, শান্তি, আশা ও সুখানুভূতির অভিজ্ঞতা পেতে পারে।

কাদের জন্য	সৃষ্টির উদ্দেশ্য
ঈশ্বরের লোকদের জন্য (যিশাইয়কে বলা)	"... ... ... তোমরা দূর থেকে আমার ছেলেদের আর পৃথিবীর শেষ সীমা থেকে আমার মেয়েদের নিয়ে এস। আমার নামে যাদের ডাকা হয়, আমি যাদের আমার গৌরবের জন্য সৃষ্টি করেছি, যাদের আমি গড়েছি ও তৈরী করেছি, তোমরা তাদের প্রত্যেককে নিয়ে এস" (যিশাইয় ৪৩:৬-৭ পদ)
	"সেই লোকদের আমি নিজের জন্য তৈরী করেছি যাতে তারা আমার গৌরব ঘোষণা করতে পারে" (যিশাইয় ৪৩:২১ পদ)।
সমস্ত সৃষ্টির জন্য (পৌলকে বলা)	"কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর (যীশুর) দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। মহাকাশে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে (যীশুকে) দিয়ে তাঁরই (যীশুরই) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" (কলসীয় ১:১৬ পদ)।
	তিনিই (খ্রীষ্টই) ঈশ্বর, যিনি সব কিছুরই উপরে; সমস্ত গৌরব চিরকাল তাঁরই। আমেন" (রোমীয় ৯:৫ পদ)।

তালিকা ৩-১: সৃষ্টির উদ্দেশ্য

খ) ঈশ্বরের গৌরব

ঈশ্বর তাঁর নিজের গৌরবের জন্যই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, এমন কি তাঁর নিজের লোকদেরও সৃষ্টি করেছেন। তাহলে, **ঈশ্বরের গৌরব মানে কি?** ঈশ্বরের গৌরব মানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, গভীরতায় ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। যদিও আমাদের মানবিক বুদ্ধি দিয়ে এটা বোঝা সহজ নয়, তবে নীচে উল্লেখিত সাতটি মানদন্ডে আমরা কিছুটা বুঝতে চেষ্টা করতে পারি।

এক] ঈশ্বরের গৌরব তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করে থাকে। তাঁরই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ভিত্তির একটি হচ্ছে তাঁর গৌরব। গৌরব ইংরেজি অর্থে 'Glory' এবং বাংলায় কোন কোন সময় 'মহিমা' শব্দও ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই এই শব্দ ব্যবহার করা যায়, কারণ তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই শব্দ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সীমাহীন (গীতসংহিতা ১১৩:৪; ১৪৮:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। একমাত্র তিনিই চিরকালের জন্য গৌরবে অধিষ্ঠিত (১ তীমথিয় ১:১৭; যিহূদা ১:২৫ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই কারণে তিনি কখনও কোন প্রতিমা বা কোন দেব-দেবীকে গৌরবে অধিষ্ঠিত করতে অনুমোদন দেন না (যিশাইয় ৪২:৮; ৪৮:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া, যে কেউ তাঁর গৌরব নিতে চেষ্টা করে, তবে তাকে মৃত্যুর শাস্তি পেতে হবে (যিশাইয় ১৪:১২-২০ পদ দ্রষ্টব্য)।

দুই] ঈশ্বরের গৌরব স্থান-কাল-পাত্রের উপরে সীমাহীন মাত্রায় প্রকাশিত। যেমন– সমস্ত পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মান্ড তাঁর গৌরবে পূর্ণ (গীতসংহিতা ৭২:১৯; যিশাইয় ৬:৩; হবক্কূক ৩:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের গৌরবে (মহিমায়) পরিপূর্ণ (গীতসংহিতা ৫৭:৫, ১১; ১০৮:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। ঠিক এই প্রেক্ষীতে চিন্তা করলে ঈশ্বরের গৌরব বা মহিমা হচ্ছে অনন্ত-অসীম, স্থান-কাল পাত্রেরও বাইরে, অনন্তকালেরও অনন্তকালে (রোমীয় ১১:৩৬; ১ পিতর ৪:১১; যিহূদা ১:২৫; প্রকাশিত বাক্য ১:৬ পদ দ্রষ্টব্য)। যিহোবা ঈশ্বর (যীশু) ব্যক্তিগত কথাবার্তায় মোশিকে বলেছিলেন, "কিন্তু আমি বেঁচে আছি এই কথা যেমন সত্যি এবং সারা দুনিয়া আমার মহিমায় পরিপূর্ণ... ..." (গণনাপুস্তক ১৪:২১ পদ)। রাজা দায়ূদ যীশুর উপাসনা করে বলেছিলেন, "সদাপ্রভুর নাম ধন্য হোক, এখন ও চিরকাল হোক। সূর্য ওঠার স্থান থেকে শুরু করে তার অস্ত যাবার স্থান পর্যন্ত সদাপ্রভুর গৌরব হোক" (গীতসংহিতা ১১৩:২-৩ পদ)।

তিন] সব কিছুই ঈশ্বরের গৌরব করে এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তাই দায়ূদ বলেছেন, "মহাকাশ ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করছে, আর আকাশ তুলে ধরছে তাঁর হাতের কাজ" (গীতসংহিতা ১৯:১ পদ)। গীতসংহিতা ৯৭:৬ পদে তিনি আবার বলেছেন, "মহাকাশ তাঁর ন্যায়ের কথা ঘোষণা করছে, আর সমস্ত জাতি তাঁর গৌরব দেখছে"। এভাবেই ঈশ্বর যখন দেখেন সব কিছু তাঁর গৌরব ঘোষণা করছে, তখন তিনি খুবই খুশী হন (গীতসংহিতা ১০৪:৩১; ১৪৭:১১ পদ দ্রষ্টব্য)।

চার] পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণন করে, যার মূল কেন্দ্র হচ্ছে ত্রিত্ব ঈশ্বরের মহিমা। বাইবেলে লেখা হয়েছে, যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের মহিমার উজ্জ্বলতা এবং ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্তার প্রতিচ্ছবির প্রকাশ (২ করিন্থীয় ৪:৪; ইব্রীয় ১:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পায় না (যোহন ১:১৮; ১ তীমথিয় ৬:১৬; ১ যোহন ৪:১২ পদ দ্রষ্টব্য)। তবে মানুষ যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পারে। সেই কারণে যীশু বলেছিলেন, "যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে" (যোহন ১৪:৯ পদ)। যীশু তাঁর শিষ্য যোহনকে এটা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরের মহিমার আলো (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৩ পদ দ্রষ্টব্য)।

সমস্ত পৃথিবী এখনও ঈশ্বরের মহিমার আলোতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সব লোক সেই আলো দেখতে পায় না। শুধুমাত্র নগণ্য সংখ্যক ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত সন্তানেরা তা দেখতে পায়। তারাই আবার– যারা দেখতে পায় না, তাদের কাছে এই মহিমার আলোকে পরিচয় করিয়ে দেয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়: পুরাতন নিয়মের সময়ে ঈশ্বর পরিকল্পনা করে ইস্রায়েলীয়দের ব্যবহার করেছেন যেন পরজাতীয়দের কাছে তাঁর গৌরব প্রকাশ পায় (যিশাইয় ৪৬:১৩; ৪৯:৩; ৬০:২১ এবং ৬১:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। এই কাজ করার জন্য বিশেষভাবে পুরাতন নিয়মের সময়ে ঈশ্বর বেশ কয়েকটি মুখ্য চরিত্র মনোনীত করেছিলেন, তাদের মধ্যে অব্রাহাম, মোশি, দায়ূদ এবং আরও অনেকের কথা উল্লেখ করা যায়। আবার, নতুন নিয়মের সময়ে নগণ্য সংখ্যক যীশুর শিষ্যদের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমার আলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটাই ঈশ্বরের একতরফা অনুগ্রহের প্রকাশ; যেখানে ঈশ্বর কারও গুণ বা যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের মনোনীত করেন নাই।

পাঁচ] মানুষের পাপের জন্য যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে যে প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছিলেন, সেখানেও ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়েছিল। যীশুই সেই আলো, যিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি ক্রুশীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছিলেন (লূক ২৪:২৬; যোহন ৭:৩৯; ১২:১৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং সেই সাথে তাঁর পিতাও মহিমান্বিত হয়েছিলেন (যোহন ১৭:১ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশু পরজাতীয়দের কাছে এই মহিমার আলো দেখিয়েছিলেন (যিশাইয় ৪২:৬; লূক ২:৩২ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরের পূর্বনির্দিষ্ট সন্তানেরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের মহিমার আলো পাবে (২ করিন্থীয় ৪:৪-৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং পরজাতীয়দের কাছেও এই আলো ছড়িয়ে পড়বে (প্রেরিত্ ১৩:৪৭-৪৮ পদ দ্রষ্টব্য)। কখন এরকমটা হবে? নবী হবক্কূক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "সমুদ্র যেমন জলে ভরা থাকে তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমার জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে" (হবক্কূক ২:১৪ পদ)।

আত্মত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে যীশু তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছেন এবং মহিমান্বিত হয়েছেন। তাই মহিমা পেতে হলে তাঁরই দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসরণ করতে হবে (যোহন ২১:১৯; রোমীয় ৮:১৭-১৮; ২ করিন্থীয় ৪:১৭; ১ পিতর ১:৭; ৪:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে যীশু নিজেকে খাঁটি প্রমাণ করেছেন যেন অনেককে মহিমার ভাগী করতে পারেন (ইব্রীয় ২:১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

ঠিক একইভাবে, পাহাড়ের উপরে দেওয়া উপদেশে যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যেন শিষ্যেরা পৃথিবীতে আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রথমে লবণ সদৃশ হয়, যেন, তারা জগতের আলো হয়ে জ্বলতে পারে। একজন খ্রীষ্টিয়ান যখন আলো হয়ে জ্বলবে, তখনই সে মহিমান্বিত হয় এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে (মথি ৫:১৩-১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যভাবে, আমরা যখন নিজেকে উৎসর্গ করব এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিতে পারব (মথি ১৬:২৪ পদ দ্রষ্টব্য), তখনই যীশুর মহিমার আলো আমাদের মধ্যে দেখা যাবে। আলো যখন আসবে, তখন অন্ধকারের শক্তি শয়তান পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে এবং আমরা সুসমাচারের কার্যকারী হিসাবে শক্তিশালী হয়ে উঠব।

ছয়] ঈশ্বরের মহিমা তাঁর সন্তানদের হৃদয়ে প্রকাশ পায় এবং তারা শুচি ও পবিত্রতার ফল তাদের জীবনে ধারণ করতে পারে। যখন তাদের হৃদয় পবিত্রতার ফলে পূর্ণ হয়, তখন ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন, প্রশংসিত হন এবং খুশী হন (ফিলিপীয় ১:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরের সন্তানেরা যখন ভালবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যের সেবা করে, ঈশ্বর তখনও গৌরবান্বিত হন (১ পিতর ৪:৭-১১ পদ দ্রষ্টব্য)। এই সন্তানেরা যা কিছু করে তা মানুষের জন্য করে না, বরং প্রভুর কাজ মনে করে সমস্ত হৃদয় দিয়েই করে (কলসীয় ৩:২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। যে খাবার তারা খায়, যে পানীয় তারা গ্রহণ করে, তা সবই ঈশ্বরের গৌরবের জন্যই করে (১ করিন্থীয় ১০:৩১ পদ দ্রষ্টব্য)।

সাত] ঈশ্বরের মহিমা তাঁর বিশ্বস্ত সন্তানদের সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশ পায়, যা তারা ভবিষ্যতে স্বর্গ-রাজ্যে লাভ করতে পারবে। যখন তারা ঈশ্বরের গৌরব করে– ঈশ্বরের উজ্জ্বলতার মহিমা তখনই প্রকাশ পায় (দানিয়েল ১২:৩; যোহন ১৩:৩২; ২ থিষলনীকীয় ১:১২ পদ দ্রষ্টব্য)। এই পৃথিবীতে যখন পরিত্রাণ বা উদ্ধার পরিকল্পনা পরিপূর্ণতা পাবে এবং বিচারের পরে যখন ঈশ্বরের সন্তানেরা নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করবে, তখন তারা তাদের নিজ নিজ মহিমায় প্রবেশ করবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যদি ঈশ্বরের মহিমার উজ্জ্বলতা পেয়ে এরকম আশীর্বাদ লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝে অবশ্যই সেই নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে এসে আমরা এই বিষয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি।

তিন
সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন মানে কি?

নবী যিশাইয় এবং প্রেরিত পৌল যেভাবে আমাদের শিখিয়েছেন (যিশাইয় ৪৩:৬-৭, ২১; রোমীয় ৯:৫; কলসীয় ১:১৬ পদ দ্রষ্টব্য), সেভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে হবে। তাহলে আমাদের দৃষ্টিকোণে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা বলতে কি রকম জীবন-যাপন বুঝায়?

বেশীর ভাগ সময়ে আমরা সাধারণত মুখ দিয়ে গান গেয়ে, শরীর দুলিয়ে নেচে নেচে প্রশংসা করাকে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা বুঝি। কিন্তু গান গেয়ে ও নেচে নেচে প্রশংসা করা একমাত্র উপায় নয়, বরং বলা চলে এটা এক ধরনের দৃশ্যমান প্রকাশ। গৌরব, প্রশংসা ও উপাসনা করা মানে আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে ঈশ্বরের আরাধনা করা। তাছাড়াও, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরকম আরাধনার অভ্যাস করতে হবে।

ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে জীবন-যাপনের জন্য পবিত্র বাইবেল আমাদের জন্য তিনটি ধাপ দিয়েছে। প্রথম দুই ধাপ হচ্ছে, আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে ঈশ্বরের আরাধনা করা, তাঁর পরিচয় জানা ও বোঝা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা; যেন তিনি সেবিত, পূজিত ও গৌরবান্বিত হন। দ্বিতীয় ধাপে, মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় জানা ও বোঝা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা বুঝায়। ধ্যান করা এমন এক পবিত্র কাজ, যা আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে করতে হয়। অর্থাৎ হৃদয় উজাড় করে, না থেমে বার বার বলে, অনুশীলন করে এবং বুঝে ঈশ্বরের বাক্য মেনে নেবার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে (গীতসংহিতা ১:২; ৭৭:১২; ১১৯:৯৭ পদ দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর, তৃতীয় ধাপ হচ্ছে– আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে ধ্যান করা, সব কিছুই বার বার অভ্যাস করা; সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে দরকারী ও মহান আদেশ (যাত্রাপুস্তক ২০:১-১৭; মথি ২২:৩৭-৩৯ পদ দ্রষ্টব্য) এবং মহান নিয়োগ (মথি ২৮:১৯-২০; প্রেরিত্ ১:৮ পদ দ্রষ্টব্য) পালন করা। শুধুমাত্র যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা সঠিক নিয়মে এই তিনটি ধাপ অনুসরণ করে; সত্যিকারভাবে তারাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করছে।

খ্রীষ্টিয়ানদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করা মানে, 'ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলা'। বলা হয়েছে, এই জগতের যে সব বিষয়, যেমন– ধন-সম্পদ, সম্মান, ক্ষমতা, পরিবার, উচ্চ শিক্ষা অর্জন, ভাল স্বাস্থ্য ইত্যাদি ঈশ্বরের কাছে না চাইলেও সবই এর পিছনে পিছনে যাবে (মথি ৬:৩৩ পদ দ্রষ্টব্য)। যখন আমাদের এই সব জাগতিক আশীর্বাদ দেওয়া হবে, তখন আমাদের উচিত হবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে এই সব কিছু ব্যবহার করা। এই ধরনের খ্রীষ্টিয়ানেরা সত্যিই খুবই সুখী। এখন আমরা এই তিনটি ধাপ একটু পর্যালোচনা করি; দেখি কিভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করা যায়, যা আমাদের সত্যিকার সুখী খ্রীষ্টিয়ানে পরিণত করতে পারে।

	সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে চলার জন্য তিনটি ধাপ	কি করে
১	ঈশ্বরের পরিচয় জানা ও বোঝা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা	হৃদয়ের গভীর থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করে
২	নিজের পরিচয় জানা ও বোঝা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা	
৩	সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে দরকারী আদেশ পালন এবং মহান নিয়োগ পালন	চিরজীবনের বাধ্যতা (দলিল)

তালিকা ৩-২: সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন

ক) প্রথম ধাপ:
ঈশ্বরের পরিচয় জানা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা এবং তাঁর উপাসনা করা ও তাঁকে গৌরবান্বিত করা

সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে হলে আমাদের অবশ্যই উল্লেখিত তিনটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। তিনটি ধাপের সর্বপ্রথম ধাপ হচ্ছে– সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের পরিচয় হৃদয়ের গভীর থেকে জানা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা এবং তাঁর উপাসনা করা ও গৌরব করা। ১২টি গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোকে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের পরিচয় ব্যাখ্যা করা যায়:

* তাত্ত্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্য	১) ত্রিত্ব ঈশ্বর	২) স্বয়ম্ভু ঈশ্বর
	৩) অনন্তকাল বিরাজমান ঈশ্বর	৪) অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর
* পরিচর্যার গুণ-বৈশিষ্ট্য	৫) সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর	৬) সর্বদর্শী ঈশ্বর
	৭) সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	৮) সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর
* চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য	৯) প্রেমিক ঈশ্বর	১০) দয়ালু ঈশ্বর
	১১) অনুগ্রহশীল ঈশ্বর	১২) পবিত্র ঈশ্বর

খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর তাত্ত্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ত্রিত্ব ঈশ্বর। তিনি স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ তিনি নিজে থেকেই অস্তিত্ব সম্পন্ন ঈশ্বর, অনন্তকাল বিরাজমান ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর। পরিচর্যার গুণ-বৈশিষ্ট্যে তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, সর্বদর্শী ঈশ্বর (তিনি সব কিছুই জানেন), সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর (সময়, স্থান-কাল, শূন্য-মহাশূন্য সব স্থানে আছেন)। চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি তাঁর নিঃশর্ত ভালবাসা (আগাপে) দিয়ে তাঁর সন্তানদের পাপ স্বভাব ঢেকে দিতে পারেন। তিনি তাদের দয়া করেন এবং অনুগ্রহে তাঁর সন্তানদের সুযোগ দেন। কিন্তু একই সময়ে, তিনি ধার্মিক (পবিত্র) ঈশ্বর বলেই পাপের শাস্তিও দিয়ে থাকেন।

খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচয় তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে জানা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা, কারণ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন। এটা খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে এমন বিশেষ একটা ব্যাপার, যেমন– ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের পরিচয় জানে, স্বীকার করে এবং সম্মান করে। ভাল ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেক দিন সকালে তাদের বাবা-মায়ের কাছে গেলেই তাদের সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদর্শন করে। অন্যদিকে, যে সব ছেলে-মেয়েরা তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে আসে, তাদের ভাল ছেলে-মেয়ে বলা যায় না। একই ভাবে, খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক মানে আমরা তাঁকে স্বীকার করব (ঈশ্বরের পরিচয়) এবং তাঁরই সন্তান হিসাবে তাঁর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাব।

এই কারণে আমরা যখন ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচয় ও তাঁর ১২টি গুণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে গৌরব, প্রশংসা ও আরাধনা করি, তখন সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করার প্রথম ধাপ শুরু হয়। এরকম খ্রীষ্টিয়ানরাই হচ্ছে আত্মিকভাবে (বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল) সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সন্তান; যারা তাঁরই গৌরব করে ও তাঁকে খুশী করে। এই খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের দেওয়া সত্যিকার সুখ উপভোগের জন্য তাদের ডান পা বাড়িয়ে রেখেছে।

এখন আমরা ঈশ্বরের ১২টি গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রথম তাত্ত্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে ঈশ্বরের পরিচয় পর্যালোচনা করছি। পরবর্তী অংশে আমরা 'ত্রিত্ব ঈশ্বর', 'স্বয়ম্ভু (স্বয়ং সৃষ্ট) ঈশ্বর', 'অনন্তকাল বিরাজমান ঈশ্বর' এবং 'অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর' নিয়ে আলোচনা করব। সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে হলে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের পরিচয় এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হবে, মুখস্থ রাখতে হবে, হৃদয়ের গভীরে ধ্যান করতে হবে এবং প্রতিদিন স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘোষণা দিতে হবে (গীতসংহিতা ১:২; ৭৭:১২; ১১৯:৯৭ পদ দ্রষ্টব্য)।

১) ত্রিত্ব ঈশ্বর

খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর তিন ব্যক্তিসত্তায় প্রকাশিত– পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর (আদিপুস্তক ১:১, ২৬; যিশাইয় ৬:৮; মথি ২৮:১৯; ২ করিন্থীয় ১৩:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁরা সকলেই তাঁদের অস্থিত্বে, শক্তিতে, ক্ষমতায়, পদমর্যাদায়, চরিত্রে এবং গুণ-বৈশিষ্ট্যে এক ও অভিন্ন। কিন্তু তাদের কার্যকরণ পদ্ধতি ভিন্নতর। পিতা ঈশ্বর হচ্ছেন পরিকল্পনাকারী, পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন কার্য সম্পাদনকারী এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হচ্ছেন শক্তির যোগানদাতা।

সব কিছুতেই ত্রিত্ব ঈশ্বর এক সংগেই সব কাজ করেন। এই বিষয়ে সবচেয়ে আদর্শ উদাহরণ আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে আমরা দেখতে পাই, যেখানে ঈশ্বরের মহা উদ্ধার (পরিত্রাণ) পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন– পিতা ঈশ্বর একটা সভার সভাপতির ভূমিকায় সভার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, পুত্র ঈশ্বর এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কের কারণে উদ্ধার (পরিত্রাণ) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরকে শক্তি যোগান দিয়েছেন যেন সিদ্ধান্ত মতই এই কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

এভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিসত্তা স্বাভাবিকভাবেই গতিশীল। এই তিন সত্তা যখন সব কিছুতেই এক ও অভিন্ন, তখন শুধুমাত্র তাদের কাজের দিক থেকে তাদের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারা যায়। এই তিন সত্তা আবার একে অন্যের পরিপূরক ও নত-নম্র হয়ে একজন অন্যজনকে সম্মান করেন, ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধার সাথে উপরে তুলে ধরেন। এই গতিশীল সম্পর্ক আরও দেখিয়ে দেয় যে, তাঁরা কেউই নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দেন না, কিন্তু একজন অন্যজন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন (যোহন ৫:৩১; ৭:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)। পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য দেন (মথি ৩:১৭; ১৬:১৬-১৭; ১৭:৫; যোহন ৫:৩৭; ৮:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন (যোহন ১:১৮; ৮:১৯; ১৪:৯ পদ দ্রষ্টব্য); পুত্র ঈশ্বর পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন (যোহন ১৪:১৬-১৭, ২৬; মথি ১০:২০ পদ দ্রষ্টব্য) এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন (যোহন ১৫:২৬; প্রেরিত্ ১:৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

ত্রিত্ব ঈশ্বর খুবই নত-নম্র। তাঁরা প্রত্যেকে নিজেকে প্রচার করেন না। বিশেষ করে, যীশু তাঁর গণ-প্রচার কালে অনেক বার সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর সব কাজই পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। তিনি পিতা ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করেছেন (যোহন ৫:২০; ৬:৩৮; ১২:৪৯; ১৪:১০ পদ দ্রষ্টব্য)। পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা মত যীশু সমস্ত সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছেন (যোহন ১:৩; কলসীয় ১:১৬; ইব্রীয় ১:২ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার, তিনি পিতা ঈশ্বরকে উঁচু করে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টির উপরে তিনিই মহান (যোহন ১০:২৭-২৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন– পিতা ঈশ্বরই তাঁকে এই জগতে পাঠিয়েছেন (আদিপুস্তক ৩:১৫; যিশাইয় ৭:১৪; মথি ১:১৮-২২; যোহন ৬:৫৭; ৮:৪২; ২০:২১ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি এও বলেছেন যে, পিতা ঈশ্বর যাদের আগে থেকে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তারা পরিত্রাণ পাবে ও তাঁর (যীশুর) কাছে আসবে (যোহন ৬:৩৭, ৪৪-৪৫; ১৭:৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং এটাই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, যেন তাদের কাছে পিতা ঈশ্বরের নাম প্রকাশিত হয় (যোহন ৩:১৬; ৫:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া, তিনি আরও বলেছেন যে, পিতা ঈশ্বর সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পুত্রের উপরে দিয়েছেন (মথি ২:১৮; যোহন ১৭:২; ইফিষীয় ৪:৮-১০ পদ দ্রষ্টব্য) এবং বিচার করারও ক্ষমতা দিয়েছেন (যোহন ৫:২৭; প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। এভাবে পিতা ঈশ্বরকেও উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে।

ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তিন ব্যক্তিসত্তার গতিশীল সম্পর্ক খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। তিন ব্যক্তিসত্তার প্রত্যেকজনই আলাদা আলাদা কাজ করেন, কিন্তু তবু তাঁরা মৌলিকভাবে একজনই ঈশ্বর। তাঁরা একে অন্যের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক যেমন বজায় রাখেন, আবার নত-নম্র হয়ে একে অন্যকে শ্রদ্ধা করেন। আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান, এই দৃষ্টান্তকে আমাদের জীবনে আদর্শ হিসাবে নেওয়া উচিত। এই কারণে, যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার আগে প্রার্থনা করেছিলেন, ঠিক যেমন ত্রিত্ব ঈশ্বর এক, তেমনি তাঁর শিষ্যেরা যেন সকলে এক হয় (যোহন ১৭:১১, ২১-২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরের সন্তানেরা যখন ত্রিত্ব ঈশ্বরের গুণ-বৈশিষ্ট্যের সদৃশ হয়ে উঠবে এবং নিজেদের মধ্যে এরকম গতিশীল সম্পর্ক তৈরী করবে, তখন তাদের মধ্য দিয়ে অনেক আত্মিক ফল উৎপন্ন হবে। যে খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রথমত পড়াশোনা করে, বুঝতে চেষ্টা করে, স্বীকার করে, বার বার করে পড়ে মুখস্ত করে এবং প্রতিদিন ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচয় ধ্যান করে; প্রতিদিন তাদের জীবনে অনুশীলন করে ও সাক্ষ্য দেয়, তারাই ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করছে। এই রকম খ্রীষ্টিয়ানেরাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে চলছে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্যিকার সুখের আস্বাদ গ্রহণ করছে।

২) স্বয়ং সৃষ্ট ঈশ্বর (স্বয়ম্ভু)

দ্বিতীয়ত, যে খ্রীষ্টিয়ান প্রতিদিন স্বয়ং সৃষ্ট ঈশ্বরকে ধ্যান করে ও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় সে গৌরবের জীবন কাটায়। ত্রিত্ব ঈশ্বর হচ্ছেন স্বয়ম্ভু ঈশ্বর। তাঁরই মধ্যে এবং তাঁরই দ্বারা তিনি অস্তিত্ব প্রাপ্ত। তাঁর নিজের অস্থিত্বের কারণও তিনি নিজেই। তিনি কোনভাবেই কারও সাহায্যে অস্তিত্ব প্রাপ্ত নন। তাঁর অস্তিত্ব ধরে রাখতে তিনি কারও উপরে নির্ভরশীল নন (যিশাইয় ৪১:৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

অন্যদিকে, কোন কিছু থেকে আমরা সৃষ্ট হয়েছি। সমস্ত সৃষ্টি (বস্তু) ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, ঈশ্বরের দ্বারা অস্তিত্বপ্রাপ্ত এবং ঈশ্বরের জন্য অস্তিত্বপ্রাপ্ত (১ করিন্থীয় ৮:৬; কলসীয় ১:৭; ইব্রীয় ২:১০ পদ দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টি কোনদিনও নিজে থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হতে পারে না– শুধুমাত্র ঈশ্বরের দ্বারাই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়।

যিহোবা ঈশ্বর যীশু মোশির মধ্য দিয়ে তাঁর স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের পরিচয় ঠিক এভাবেই আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। মোশি যিহোবা ঈশ্বরকে (সদাপ্রভু) প্রশ্ন করেছিলেন, "... ... আমি গিয়ে যখন ইস্রায়েলীয়দের বলব তাদের পূর্ব পুরুষদের ঈশ্বরই আমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন তারা হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তাঁর নাম কি?' সেই সময়ে আমি তাদের কি উত্তর দেব (যাত্রাপুস্তক ৩:১৩ পদ)? ঈশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন, "যিনি 'আমি আছি' আমিই তিনি।" তুমি ইস্রায়েলীয়দের বলবে যে, 'আমি আছি' তাদের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন (যাত্রাপুস্তক ৩:১৪ পদ)। ঈশ্বর এখানে **'আমি আছি'** হিসাবে তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করেছেন, যা হিব্রু ভাষায় নামবাচক বিশেষ্য পদ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে- যার মানে যিহোবা (যীশু)।

ঈশ্বরের স্বয়ং-অস্তিত্ব মূলত তাঁরই গৌরব চিহ্নিত করছে (যিশাইয় ২৬:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি পরিত্রাণ বা উদ্ধার প্রদান করেন এবং তিনি নিজের উপরে নির্ভরশীল (যিশাইয় ৫৯:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। শুধুমাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরই এমন কাজ করতে পারেন। স্বয়ং সৃষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানুষের চোখ দিয়ে দেখে বোঝা খুবই কঠিন। তবুও পবিত্র আত্মার সাহায্যে যারা এটা বোঝে যে, ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে একেবারে আলাদা; তারা প্রতিদিন ঈশ্বরের স্বয়ম্ভু অস্তিত্ব ধ্যান করে এবং তাঁকে স্বীকার করে বিশ্বস্তভাবে উপাসনা করে, সম্মান করে এবং গৌরব প্রদান করে। তারা পবিত্র আত্মার অভিষেকের মধ্য দিয়ে তাদের চিন্তারও বাইরে সান্ত্বনা, শান্তি ও সুখ লাভ করে।

যারা এরকমভাবে বুঝে চলে, তারা সত্যিকারভাবেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করছে। তারা ঈশ্বরের মহিমার পোশাক পরার সুযোগ পাবে। তারা এই পৃথিবীতে বাস করলেও একই সময়ে নিজেদের সুখী খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে রূপান্তরিত করবে এবং এই জগতে থাকতেই স্বর্গীয় স্বাদ অনুভব করবে। যেহেতু তারা এই আশীর্বাদের জীবনে বাস করছে, তাই তারা তাদের জগতের দেহ ছেড়ে যাবার সময় আনন্দের সাথে স্বর্গে চলে যাবে। তাদের জন্য, তাদের কবর দেবার সময়টা কোন ভয় ও দুঃখের আনুষ্ঠানিকতা হবে না, কিন্তু এক আনন্দঘন সুখ মিশ্রিত ধন্যবাদের অনুষ্ঠান হবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন।

৩) অনন্তকাল বিরাজমান ঈশ্বর

কোন আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের গুণ-বৈশিষ্ট্যের একটি পরিচয়– 'অনন্তকাল বিরাজমান ঈশ্বর' এ কথা ধ্যান করে এবং স্বীকারোক্তি না দিয়ে থাকতে পারে না। ত্রিত্ব ঈশ্বর হচ্ছেন অনন্তকালীন ঈশ্বর। যিহোবা ঈশ্বর (যীশু) সবকিছু সৃষ্টি করার আগেই ছিলেন এবং তিনি চিরকাল থাকবেন (গীতসংহিতা ৯০:২; যিশাইয় ৪০:২৮ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যদিকে, সৃষ্ট কোন কিছুই অনন্তকাল থাকবে না এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, এই সবই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের হাতে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৫, ১৯ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর জীবনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি হচ্ছেন জীবনের প্রভু বা মালিক। সেইজন্য, একটি জীবনের বেঁচে থাকার সময় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ইচ্ছামতই স্থির করা থাকে।

ঈশ্বরের দাস-দাসীরা অনন্তকালীন ঈশ্বর বা যিহোবা নামের প্রশংসা করেছেন। অব্রাহাম তাঁকে "চিরকালের ঈশ্বর" (যার শুরুও নেই শেষও নেই) বলে সম্বোধন করেছেন। মোশি বলেছেন, "আদিকালের ঈশ্বর" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২৭) এবং যিরমিয় বলেছেন, "জীবন্ত ঈশ্বর ও চিরস্থায়ী রাজা" (যিরমিয় ১০:১০)। আবার নহিমিয় বলেছেন, ঈশ্বর "অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আছেন" (নহিমিয় ৯:৫)। যিশাইয় বলেছেন, ঈশ্বর "যিনি চিরকাল জীবিত" (যিশাইয় ৫৭:১৫); পৌল বলেছেন, "অনন্ত ঈশ্বর" (রোমীয় ১৬:২৬), "যিনি সমস্ত যুগের রাজা" এবং যোহন বলেছেন, "যিনি যুগ যুগ ধরে জীবিত আছেন" (প্রকাশিত বাক্য ১৫:৭)।

অন্য সকল সৃষ্টির মত করে ঈশ্বর সময়ের মাত্রায় থাকেন না। তিনি "অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আছেন" (নহিমিয় ৯:৫)। তাই, পবিত্র বাইবেল যিহোবা ঈশ্বর (যীশু) সম্পর্কে পরিচয়ের তথ্য-প্রমাণ সময়ের মাত্রায় এবং ইতিহাসের সময়কালে প্রকাশ করে বলেছে, তিনিই হচ্ছেন "আলফা এবং ওমিগা" বা "প্রথম ও শেষ" (প্রকাশিত বাক্য ১:৮; ২১:৬ এবং ২২:১৩)। আবার যিশাইয় পুস্তকে বলা হয়েছে, "আমিই প্রথম ও আমিই শেষ" (যিশাইয় ৪৪:৬; ৪৮:১২; প্রকাশিত বাক্য ১:১৭; ২:৮; ২১:৬ এবং ২২:১৩) ইত্যাদি।

সকল সৃষ্টিরই উচিত চিরকালের ঈশ্বরকে সম্মান করা, উপাসনা করা এবং প্রশংসা করা। ঈশ্বরের নাম চিরকাল প্রশংসিত (দানিয়েল ২:২০ পদ দ্রষ্টব্য), ঈশ্বরের সিংহাসন চিরকাল ধরে থাকবে (গীতসংহিতা ৪৫:৬ পদ দ্রষ্টব্য), ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতা চিরকাল ধরে থাকবে (রোমীয় ১:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। দায়ূদ বলেছেন, "তাঁর (ঈশ্বরের) ভালবাসা চিরকাল স্থায়ী" (গীতসংহিতা ১৩৬:৫)। ঈশ্বরের রাজ্য চিরকালের রাজ্য বা অনন্তকালীন রাজ্য, বংশের পর বংশ ধরে তা চিরকাল স্থায়ী (গীতসংহিতা ১৪৫:১৩ পদ দ্রষ্টব্য) এবং অনন্তকালীন ঈশ্বরের চিরস্থায়ীত্ব ঈশ্বরের পুত্র যীশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টিয়ানদের দেওয়া হয়েছে (যোহন ৩:১৬; ৫:২৪; ৬:৫৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

খ্রীষ্টিয়ানেরা এভাবেই আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছে। তাই, তাদের উচিত অনন্ত ত্রিত্ব ঈশ্বরকে ও সেই সাথে ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা যিহোবা যীশুকে ধন্যবাদ দেওয়া, কারণ তিনিই রক্ত-মাংসে আবির্ভূত হয়ে দান হিসাবে আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য। যখন আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রশংসা, উপাসনা, স্তব-স্তুতি ও গৌরব করি (১ বংশাবলি ১৬:৩৬; গীতসংহিতা ৪১:১৩; প্রকাশিত বাক্য ৭:১২ পদ দ্রষ্টব্য), তখন আমরা আমাদের যুক্তি ও কল্পনার বাইরে ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত ভালবাসার অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের দেওয়া প্রকৃত সুখের স্বাদ অনুভব করি।

৪) অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর

চতুর্থ বিষয়টি খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য এমন এক কার্যকর বিশ্বাস, যা কি না ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রতিদিন স্বীকার করে সত্যিকার সুখী জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদের পড়াশোনা করতে, মুখস্থ করতে ও ধ্যান করতে পরিচালিত করে। ত্রিত্ব ঈশ্বর হচ্ছেন অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর (দানিয়েল ৬:২৬; যাকোব ১:১৭ পদ দ্রষ্টব্য)। ত্রিত্ব ঈশ্বর আজ, কাল এবং চিরকাল একই আছেন এবং চিরকাল থাকবেন (গীতসংহিতা ১০২:২৭; ইব্রীয় ১:১২; ১৩:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্র এবং তাঁর অস্তিত্ব কখনও পরিবর্তন হয় না। তিনি যে অপরিবর্তনীয় এবং তিনি কখনও পরিবর্তন হন না; তার মানে, ঈশ্বর যে বাক্য একবার উচ্চারণ করেন, তা পূর্ণ হবেই (গণনাপুস্তক ২৩:১৯ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার, তিনি যা বলেন তার কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু মানুষ সব সময় পরিবর্তনশীল (১ শমূয়েল ১৫:২৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত কোন উদ্দেশ্য, কোন পরিকল্পনা, কোন প্রতিজ্ঞা পরিবর্তন করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদিও ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরকে ছেড়ে প্রতিমা পূজায় আসক্ত হয়েছিল, তবুও যিহোবা ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলেই তিনি তাদের একেবারে ধ্বংস করেন নি। তারা যখন পাপ থেকে মন ফিরিয়েছিল, তখন তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন (মালাখি ৩:৬ পদ দ্রষ্টব্য)। আজ পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁর প্রতিষ্ঠিত অব্রাহামের সাথে করা চুক্তি লাগাতারভাবে পালন করে যাচ্ছেন। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে, অব্রাহামের মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবী আশীর্বাদ পাবে (ইব্রীয় ৬:১৭; রোমীয় ৪:২০-২১; ১১:২৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

যিহোবা ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে এই যে কথা বলেছিলেন– তিনি তা পরিবর্তন না করে ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ করে যাচ্ছেন। সেই জন্য তিনি পুরাতন নিয়মের আমোষ ভাববাদীকে বলেছিলেন, "আসলে প্রভু সদাপ্রভু তাঁর দাস নবীদের কাছে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ না করে কিছুই করেন না" (আমোষ ৩:৭ পদ)। তাছাড়াও, যিহোবা ঈশ্বর অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছেন– শেষ কালে কি ঘটবে এবং তিনি একেবারে প্রথম থেকেই শেষকাল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে ঘোষণা দিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর বলা প্রতিজ্ঞাসমূহ তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে একের পর এক মানুষের সামনেই পরিপূর্ণতা দিচ্ছেন (যিশাইয় ৪৬:১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

শুধুমাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর এমন একজন, যিনি তাঁর বলা কথা বিনা পরিবর্তনে পালন ও রক্ষা করতে সমর্থ। মানুষের বলা কথা মিথ্যায় পূর্ণ এবং কেউ আবার কোন কথা সত্য ও মিথ্যার মোড়কে জড়িয়ে রাখে, মনে করে থাকে তা আংশিক সত্য, সীমাবদ্ধ এবং শর্ত সাপেক্ষে সত্য (গণনাপুস্তক ২৩:১৯; ১ শমূয়েল ১৫:২৯ পদ দ্রষ্টব্য)। কারণ মানুষের

হৃদয় খামখেয়ালীতে পূর্ণ এবং মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বারে বারে পরিবর্তিত হয়। তাছাড়া, মানুষ কখনও ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে না। তাদের পক্ষে আরও অসম্ভব হচ্ছে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা ঘোষণা দিয়ে তারা আগাম বলে দিতে পারে না।

খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে, কথায় ও কাজে বিশ্বস্ততা ধরে রাখেন, যা মানুষের কাছে অসম্ভব। দায়ূদ ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার প্রশংসা করেছেন (গীতসংহিতা ৮৯:৮, ২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। পৌল বলেছেন যে, ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য; সহ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষা তিনি তোমাদের উপরে হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সংগে সংগে তা থেকে বের হয়ে আসবার পথও তিনি করে দেবেন যেন তোমরা তা সহ্য করতে পার" (১ করিন্থীয় ১০:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। মোশি যিহোবা ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত বলেছেন; যারা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর আদেশ পালন করে, তিনি তাদের বংশের পর বংশ ধরে তাঁর ভালবাসার চুক্তি ধরে রাখেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

বাইবেলে উল্লেখিত বিশ্বাসের আদি পূর্বপুরুষেরা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার উপরে নির্ভরশীল হয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছিলেন। সে কারণে তারা তাঁর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদও পেয়েছিলেন (ইব্রীয় ১১:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা সত্যিকারভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে সুখী ও সুন্দর জীবন-যাপন করতেন। আজকেও আমাদের জীবনে একই কথা প্রযোজ্য। যখন আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় নির্ভর করে চলি এবং বাইবেলে দেওয়া তাঁর শিক্ষাগুলো মেনে চলি, তখন আমরা বাইবেলে প্রতিজ্ঞাত সবরকম সুখ ও শান্তি ভোগ করতে পারি।

এখন পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের চারটি তাত্ত্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্য ধ্যান ও চিন্তা করতে পেরেছি– যা হচ্ছে, আমাদের ঈশ্বর ত্রিত্ব ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু ঈশ্বর, অনন্তকাল বিরাজমান ঈশ্বর এবং অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর। এখন এই সবই আমাদের হৃদয়ের গভীরে স্বীকার করা উচিত ও ধ্যান করা উচিত এবং সেই সাথে সাক্ষ্য হিসাবে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা উচিত। যারা এরকম করে, তারা সত্যিই ধন্য, আশীর্বাদের খ্রীষ্টিয়ান। তারা তাদের জীবনের ভিত্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারেই গেঁথেছে। এরকম খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের ভালবাসা পায়। তাই আসুন না, ঈশ্বরের পরিচয় পেতে তাঁর চারটি পরিচর্যার গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আরও পড়াশোনা করি। ঈশ্বরের যে পরিচর্যার গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে তা হচ্ছে: তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, সর্বদর্শী ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর!

৫) সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর

ঈশ্বরের পঞ্চম গুণ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর! তাঁকে স্বীকার ও ধ্যান করে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মর্যাদা দেওয়া আমাদের উচিত। আমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আদিপুস্তক ১:১ পদে লেখা আছে, "সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।" এখানে মূল হিব্রু ভাষায় লেখা বাইবেলে 'ঈশ্বর' বলতে 'এলোহিম' শব্দটি লেখা হয়েছে, যা আক্ষরিক অর্থে বহুবচন বুঝায়। অন্যভাবে তা হচ্ছে- পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, যারা সৃষ্টির কাজ একসাথে সম্পন্ন করেন। এভাবে সব কিছু সৃষ্টি করে ত্রিত্ব ঈশ্বর এই সত্য ঘোষণা করেন যে, তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর।

আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, পুত্র ঈশ্বর হচ্ছেন কার্যনির্বাহী, যিনি সব কিছু হাতে- কলমে করেছেন (যোহন ১:৩; কলসীয় ১:১৬; ইব্রীয় ১:২ পদ দ্রষ্টব্য)। পুত্র ঈশ্বর যীশু হচ্ছেন ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা এবং তিনি পুরাতন নিয়মের যিহোবা ঈশ্বর [প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত যীশুর পূর্ব অস্তিত্ব]। যীশু তাঁর প্রিয় দাসদের মধ্য দিয়ে বলেছেন, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। যিশাইয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন, "আমিই পৃথিবী তৈরী করে তার উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছি; আমি নিজের হাতে আকাশকে বিছিয়ে দিয়েছি আর আকাশের সূর্য, চাঁদ আর তারাগুলোকে স্থাপন করেছি (যিশাইয় ৪৫:১২ ও ৫১:১৩-১৫ পদ)। তিনি আবার মোশিকে বলেছেন, "সদাপ্রভু ছয় দিনে মহাকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে সেই কাজ আর করেন নি" (যাত্রাপুস্তক ২০:১১ক পদ)।

এছাড়াও পুরাতন ও নতুন নিয়মের ঈশ্বরের অনেক প্রিয় দাসেরা যীশুকে সৃষ্টিকর্তা বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যিরমিয় ভাববাদী বলেছেন, "সদাপ্রভু নিজের শক্তিতে পৃথিবী তৈরী করেছেন, তাঁর জ্ঞান দ্বারা জগৎ স্থাপন করেছেন ও বুদ্ধি দ্বারা আকাশ বিছিয়ে দিয়েছেন" (যিরমিয় ১০:১২ পদ)। ইয়োব সাক্ষ্য দিয়েছেন, "তোমারই হাত আমাকে গড়েছে, তৈরী করেছে" (ইয়োব ১০:৮ক পদ)। দায়ূদ বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর হাতে আকাশ, চাঁদ আর তারাগুলো সৃষ্টি করেছেন (গীতসংহিতা ৮:৩ক পদ)।

যোহন বলেছেন যে, ঈশ্বর আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই সৃষ্টি করেছেন (প্রকাশিত বাক্য ১০:৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং যীশু হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪ পদ দ্রষ্টব্য), তিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও ফোয়ারা সৃষ্টি করেছেন (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। প্রেরিত্ পৌল বলেছেন, "কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। মহাকাশে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" (কলসীয় ১:১৬ পদ)।

যীশু শুধু আলো তৈরী করেন নি, তিনি অন্ধকারও সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেমন উন্নয়ন করেন, তেমনি দুর্যোগও সৃষ্টি করেন (যিশাইয় ৪৫:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি আবার ধ্বংসকারীও সৃষ্টি করেছেন যেন মহাধ্বংস সাধিত হয় (যিশাইয় ৫৪:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টির পিছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে (যিশাইয় ৪৩:৬-৭, ২১ পদ দ্রষ্টব্য), কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি হয় নাই (যিশাইয় ৪৫:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁর সৃষ্টি চিরকালীন (গীতসংহিতা ৩৩:১১ পদ দ্রষ্টব্য)।

প্রভু যীশু নিজেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করছেন (গীতসংহিতা ১০৩:১৯ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি অতি বিশাল এই বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছেন, যা আধুনিক বিজ্ঞানও মেপে শেষ করতে পারে নাই। বাইবেলে বর্ণীত হয়েছে, এই অতি বিশাল আকাশে রয়েছে যিহোবা যীশুর সিংহাসন এবং পৃথিবী হচ্ছে তাঁর পা রাখবার জায়গা (যিশাইয় ৬৬:১ পদ দ্রষ্টব্য)। প্রেরিত্ পৌলের মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন- তিনি সব কিছু তাঁর পায়ের নীচে রেখেছেন (১ করিন্থীয় ১৫:২৭ ও ইফিষীয় ১:২২ পদ দ্রষ্টব্য)। যিহোবা (যীশু) মানুষের চিন্তা-ভাবনারও অনেক উপরে, যা কল্পনা করা যায় না (গীতসংহিতা ১০৪:১ পদ দ্রষ্টব্য)।

সকল সৃষ্টিই ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রশংসা, আরাধনা ও গৌরব করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে (যিশাইয় ৪৩:৬-৭, ২১; রোমীয় ৯:৫ এবং কলসীয় ১:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য, সব সময় ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচয় ধ্যান করা আমাদের উচিত এবং বিশেষ করে সরলতার সাথে তাঁকে স্বীকার করতে হবে এবং ধ্যান করতে হবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা যীশু কত মহান ও গৌরবে মহিমান্বিত, যার সাথে আমাদের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

এই মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সামনে আমাদের সব সময় স্বীকার করা উচিত আমরা কত দুর্বল ও নগণ্য প্রাণী। আমাদের বলা উচিত, 'যীশু, তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর! তুমি আমাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক, আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি, দুঃখ-দুর্দশারও মালিক, কারণ আমরা অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য প্রাণী (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৫, ১৯ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশু, আমি তোমার গৌরব করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছি! সমস্ত গৌরব, প্রশংসা, সম্মান ও মহিমা একমাত্র তুমিই পাবার যোগ্য!' যারা এভাবে তাঁকে স্বীকার করে, তারা সকলেই নত-নম্র নর-নারী। তারাই ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান, যারা তাঁকে সব সময় সন্তুষ্ট করতে চায়; আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে তারা সুখী খ্রীষ্টিয়ান বলে পরিচিত।

৬) সর্বদর্শী ঈশ্বর

বাইবেলে বলা হয়েছে, ত্রিত্ব ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বদর্শী ঈশ্বর। বিভিন্নভাবে তাঁর এই সর্বদর্শীতা প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন- ঈশ্বর সর্বজ্ঞ (রোমীয় ৮:২৯ পদ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ আগে থেকেই সব কিছু জানেন, অসীম প্রজ্ঞার অধিকারী (রোমীয় ১১:৩৩ পদ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি।

আমাদের ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন যে, যীশু এসে ক্রুশে প্রায়শ্চিত্ত সাধন করবেন। এটা ছিল পূর্বনির্দিষ্ট (প্রেরিত্ ২:২৩; ১ পিতর ১:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। এই বিষয় মানুষের বোধ-বুদ্ধির বাইরে! সেই জন্য বলা হয়ে থাকে, তা হচ্ছে 'ঈশ্বরীয় গুপ্ত রহস্য', মূলত ঈশ্বরের প্রজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত বিষয় (১ করিন্থীয় ২:৭-১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

আমাদের ঈশ্বর আগে থেকেই সব কিছু জানেন, তাই তিনি তাঁর দাস-দাসীদের তাদের মায়ের জঠরে আসার আগে থেকেই বাছাই করে মনোনীত করেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মায়ের জঠরে গঠিত হবার আগেই ঈশ্বর ভাববাদী যিরমিয়কে জানতেন। তার জন্মের আগে থেকেই ঈশ্বর তাকে আলাদা করে ভাববাদী হিসাবে ইস্রায়েল জাতির কাছে তাকে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন (যিরমিয় ১:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরের চোখ দায়ূদের গড়ে-না-ওঠা দেহ দেখেছে এবং তার জন্য দিনগুলো আরম্ভ হবার আগেই ঈশ্বরের বইতে তা লেখা হয়েছিল (গীতসংহিতা ১৩৯:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। পৌল বলেছেন, তাকে মায়ের গর্ভ থেকেই অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত্ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে (প্রেরিত্ ৯:১৫; গালাতীয় ১:১৫-১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া, ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে তাঁর লোকদের অনেক আগে থেকেই মনোনীত করেছেন (রোমীয় ৮:২৯, ১ পিতর ১:২ পদ দ্রষ্টব্য)।

আমাদের ঈশ্বরের রয়েছে অন্তহীন প্রজ্ঞা (গীতসংহিতা ১৪৭:৫; রোমীয় ১১:৩৩ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি সব কিছুই জানেন (১ যোহন ৩:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। তাই ঈশ্বরের চোখে সব কিছুই স্বচ্ছ, কোন কিছুই তাঁর কাছ থেকে লুকানো নেই (ইব্রীয় ৪:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশু আমাদের মাথার প্রত্যেকটা চুলের হিসাব জানেন (মথি ১০:৩০ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি এই পৃথিবীর ভাল ও মন্দ প্রত্যেক লোকের দিকে লক্ষ্য রাখেন (হিতোপদেশ ১৫:৩; গীতসংহিতা ৩৩:১৩-১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা কখন বসে, কখন ওঠে দাঁড়ায়– তা তিনি জানেন। তিনি দূর থেকেই তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পারেন। তারা কখন বাইরে যায়, কখন ঘুমায় তাও তিনি বুঝতে পারেন। তাদের সমস্ত পথ তাঁর পরিচিত। তাদের মুখে একটা শব্দ উচ্চারণ করার আগেই তিনি তার পুরোটাই জানেন। যেহেতু যিহোবা যীশুর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অসীম (যিশাইয় ২৮:২৯ পদ দ্রষ্টব্য), সেহেতু মানুষ সর্বদর্শী ঈশ্বরের সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারে না (গীতসংহিতা ১৩৯:১-৮; যিশাইয় ২৯:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

ভাল কাজ করলে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মিথ্যা দোষারোপ করলে ঈশ্বর কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে তার ফল দেন। সর্বদর্শী ঈশ্বর নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত ফল দিতে পারেন (গালাতীয় ৬:৯ পদ দ্রষ্টব্য)। যেহেতু আমরা সর্বদর্শী ঈশ্বরের সন্তান, সেহেতু প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের উচিত নয়; কিন্তু তার বদলে সর্বদর্শী ঈশ্বরের ক্রোধের হাতে বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ লেখা আছে, "প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং ঈশ্বরকেই শাস্তি দিতে দাও", এটাই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা। সেজন্য অন্যভাবে বলা যায়, "তোমার শত্রুর যদি খিদে পায় তাকে খেতে দাও; যদি তার পিপাসা পায় তাকে জল দাও। এই রকম করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা গাদা করে রাখবে" (রোমীয় ১২:১৯-২০ পদ)। নির্দিষ্ট সময় যখন আসবে তখন ঈশ্বর সমস্ত অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।

ঈশ্বর একদম সঠিকভাবে জানেন, তাদের সন্তানদের কি প্রয়োজন– তাই তিনি সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। সেই জন্যই যীশু বলেছেন, চাওয়ার আগেই আমাদের পিতা জানেন আমাদের কি প্রয়োজন (মথি ৬:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের প্রার্থনা করা উচিত নয়। বরং ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। সেই জন্য যীশু নিজেই আমাদের প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন, যাকে আমরা 'প্রভুর শেখানো প্রার্থনা' বলে থাকি (মথি ৬:৯-১৩ পদ দ্রষ্টব্য)।

আমরা যদি 'প্রভুর শেখানো প্রার্থনা' একটু লক্ষ্য করি– তাহলে দেখতে পাই যে, এই প্রার্থনা আমাদের জন্য এক আদর্শ প্রার্থনা। শুরুতেই যীশু আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ত্রিত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি এই পৃথিবীতেও যেন সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা- যেন সমস্ত পৃথিবীর পাপী মানুষেরা তাঁর পরিকল্পনায় উদ্ধার পায়। পরিত্রাণের এই পরিকল্পনা আগেই স্বর্গে নেওয়া হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩:১৫; প্রেরিত্ ২:২৩; ১ করিন্থীয় ২:৭-১০ এবং ১ পিতর ১:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। অতঃপর, এই পরিকল্পনা যেভাবে স্বর্গে সেভাবে পৃথিবীতে এসে পরিপূর্ণতা পায়। তবে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যেন ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে আমাদের ইচ্ছা সংযুক্ত হয়। তবু যাহোক, আমরা তো আমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে, তাই আমরা প্রার্থনার পথ ধরেই ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে আমাদের ইচ্ছা যুক্ত করতে পারি।

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝেই আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু তাঁর কাছে চাওয়া উচিত। ত্রিত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন-যাপন করতে আমাদের দেহের জন্য, প্রাণের জন্য ও আত্মার জন্য প্রতিদিনের খাবার প্রয়োজন। তাছাড়াও, আমাদের বিপক্ষ প্রতিবেশীদের সাথেও আমাদের ক্ষমা, দয়া ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। এভাবে আমরা আমাদের অন্যায়ের ক্ষমা পেতে পারি। তাছাড়াও, পাপের পথে প্ররোচিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে ত্রিত্ব ঈশ্বরের সাহায্য আমাদের দরকার।

প্রার্থনা হচ্ছে আমাদের জন্য আত্মিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, যা আমাদের ইচ্ছাকে ত্রিত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত করে দেয়। কিন্তু এটা জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভাগ্য পরীক্ষার মত নয় যে, আমাদের যা দরকার সেগুলো পাবার জন্য আমাদের কি করতে হবে, তা আমরা জগতের মানুষের কাছে জানতে চাইব। যারা ঈশ্বরকে জানে না, তারা এভাবে আশা করে থাকে। ঈশ্বরের সন্তানদের প্রার্থনা হচ্ছে- ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য (ধার্মিকতার জন্য) আকাঙ্ক্ষীত হওয়া; তার মানে, আমাদের ইচ্ছার সাথে ত্রিত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছার এক যোগাযোগ সম্বন্ধ (মথি ৬:৩২-৩৩ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যখন তা করতে সক্ষম হই, তখন আমাদের সর্বদর্শী ঈশ্বর খুশী হয়ে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন, যা তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তখন তিনি তাঁর সব আশীর্বাদ তাঁর সন্তানদের দেন এবং তারা না চাইলেও তিনি তাদের ভাল ভাল

জিনিস দেন। যারা প্রতিদিন তাদের হৃদয়ের গভীরে সর্বদর্শী ঈশ্বরকে স্বীকার করে ও ধ্যান করে, তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে অল্পতেই সুখী খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে জীবন-যাপন করতে পারে।

৭) সর্বশক্তিমান ঈশ্বর

যারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে এই সহজ পথে চলে তারা সর্বশক্তিমানের উপাসনা না করে থাকতে পারে না। আমাদের ত্রিত্ব ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (আদিপুস্তক ১৭:১; প্রকাশিত বাক্য ১৫:৩ ও ১৯:৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁর ক্ষমতা অসীম, তাই তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কিছু করতে পারেন। যিহোবা ঈশ্বর শূন্য থেকে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি তৃতীয় স্বর্গ থেকে শুরু করে নরক পর্যন্ত তৈরী করেছেন (এলোহিম, আদিপুস্তক ১:১; যোহন ১:৩; কলসীয় ১:১৬; প্রকাশিত বাক্য ৪:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। মানব ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তিনি তাঁর সন্তানদের কাছে তাঁর শক্তির ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।

ঈশ্বর তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা পরিপূর্ণ করেন (ইয়োব ৪২:২ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যখন মানব জাতির জন্য তাঁর উদ্ধার পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি, তখন দেখি যে, ঈশ্বর নিজেই মানব জাতির উদ্ধার পরিকল্পনা রচনা করেছেন (আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ দ্রষ্টব্য); ঈশ্বর পুত্র হিসাবে নিজে মানবদেহ ধারণ করেছেন (মথি ১:২১ পদ দ্রষ্টব্য) এবং নিজেই ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে মানবজাতির পরিত্রাণ বা উদ্ধার পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছেন (যোহন ১৯:৩০ পদ দ্রষ্টব্য)। এভাবেই যখন ঈশ্বর কোন কিছু করতে মনস্থ করেন, তখন কোন কিছুই তাঁকে থামাতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা অবশ্যই সিদ্ধ হতে হবে (যিশাইয় ৯:৬-৭ পদ দ্রষ্টব্য)।

ত্রিত্ব ঈশ্বরের পক্ষে কোন কিছুই কঠিন নয় (যিরমিয় ৩২:১৭, ২৭ পদ দ্রষ্টব্য)। মানুষের কাছে যা কিছু অসম্ভব তা সব কিছুই ঈশ্বরের কাছে সম্ভব (মথি ১৯:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। মরিয়ম যখন কুমারী ছিলেন, তখন ঈশ্বর তাকে প্রস্তুত করলেন যেন তিনি যীশুকে গর্ভে ধারণ করতে পারেন (লূক ১:৩৭ পদ দ্রষ্টব্য)। অব্রাহাম ও সারার অনেক বয়স হওয়ায় সারা সন্তান ধারণে অক্ষম ছিলেন, তবু ঈশ্বর তাদের কাছে একটি পুত্র সন্তান দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৭:১-২১; ১৮:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। অব্রাহামের ১০০ বছর বয়সের সময় ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার জন্য ইস্‌হাককে দিলেন (আদিপুস্তক ২১:১-৫ পদ দ্রষ্টব্য)। এইরকম বিষয়সমূহ আধুনিক বিজ্ঞান বুঝতে না পারলেও ঈশ্বর তা বুঝতে সক্ষম ছিলেন।

তাছাড়াও, যিহোবা ঈশ্বর হচ্ছেন সার্বভৌম ঈশ্বর। যেদিন ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব করে যাচ্ছেন। তিনি ক্লান্ত বা শ্রান্ত হন না (যিশাইয় ৪০:২৮ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর, "যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন" (প্রকাশিত বাক্য ১:৮ ও ৪:৮ পদ)। সময়ের মাত্রার বাইরেও তিনি নিজে তাঁর মহাক্ষমতা ও গৌরবে রাজত্ব করছেন (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৭; ১৯:৬ ও ২১:২২ পদ দ্রষ্টব্য)।

সার্বভৌম ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। মানব জাতির মধ্যে কাকে তিনি উদ্ধার করবেন এবং কাকে তিনি অনন্ত শাস্তি দেবেন সকল সিদ্ধান্ত তিনিই নিতে পারেন (যিশাইয় ৯:৬ ও সফনিয় ৩:১৭ পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই তিনি যাকে মনোনীত করেন, কখনও তার হৃদয় কঠিনও করেন (যাত্রাপুস্তক ৭:৩; ৯:১২; ১৪:৪,১৭ এবং যিশাইয় ৬৩:১৭; রোমীয় ৯:১৮ পদ দ্রষ্টব্য), অথবা যাকে দয়া করতে চান, তাঁর ইচ্ছানুসারে তিনি তাকে দয়া দেখান (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৯; রোমীয় ৯:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)। সার্বভৌম ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন (প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৭ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতায় যা খুশী তাই করতে পারেন (মথি ২০:১৫ পদ দ্রষ্টব্য), কারণ এটাই তাঁর পরিপূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ।

দায়ূদের দেওয়া সাক্ষ্য অনুসারে, "মহান ঈশ্বরের আশ্রয়ে যে বাস করে সে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় থাকে" (গীতসংহিতা ৯১:১ পদ)। এমন কি একটা চড়াই পাখীও ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়া মাটিতে পড়ে না (মথি ১০:২৯ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশুর অনুমতি ছাড়া আমাদের মাথার একটা চুলও পড়ে না (লূক ১২:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যারা ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষা পায়, তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তিও লাভ করে থাকে। সেজন্য যীশু বলেছেন, "যে বিশ্বাস করে তার জন্য সব কিছুই সম্ভব" (মার্ক ৯:২৩ পদ)। সুতরাং, যে খ্রীষ্টিয়ান সত্যি করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, সে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্যিকার সুখের স্বাদ গ্রহণ করেছে।

৮) সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর

ত্রিত্ব ঈশ্বরের চতুর্থ ও শেষ পরিচর্যার গুণ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর। আমাদের ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর। সমস্ত স্বর্গ ও পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ (যিশাইয় ৬:৩ পদ দ্রষ্টব্য) এবং তাঁর কাছ থেকে কেউই কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকতে পারে না (যিরমিয় ২৩:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। যদি আমরা স্বর্গে যাই, সেখানে পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আছেন (মথি ১০:২০; ১৬:১৭; প্রেরিত্ ১৬:৬-৭; রোমীয় ৮:৯, ১১; ১ পিতর ১:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। যদি আমরা নরকে যাই, সেখানেও তাঁরা আছেন। যদি আমরা দূর সাগরের পারে গিয়ে থাকি, সেখানেও তাঁরা আছেন (গীতসংহিতা ১৩৯:৮-৯ এবং আমোষ ৯:২ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার আমরা যদি জলের মধ্য দিয়ে যাই, অথবা আগুনের মধ্য দিয়ে যাই (যিশাইয় ৪৩:২ পদ দ্রষ্টব্য), সেখানেও তাঁরা আছেন। মোট কথা, আমরা যেখানেই যাই না কেন সেখানেই ত্রিত্ব ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদের সংগে আছেন। ঈশ্বর এখানে সেখানে সবখানেই একই সাথে থাকেন; আমরা তো তাঁর উপস্থিতি বাদ দিতে পারি না।

ত্রিত্ব ঈশ্বর মহাশূন্যেও অবস্থান করেন, তাছাড়াও তিনি সময়ের মাত্রার ভেতরে এবং বাইরেও অবস্থান করেন। ত্রিত্ব ঈশ্বর চিরকাল ধরে উপস্থিত। আদমের পতনের পর মানব জাতি সময়ের মাত্রায় প্রবেশ করে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বসবাস করতে থাকে। তাই সময় সীমায় আবদ্ধ মানুষের পক্ষে সময়সীমার বাইরে অনন্তকাল সম্পর্কে বুঝে ওঠা খুবই কঠিন।

ত্রিত্ব ঈশ্বর মানুষের বুদ্ধির অতীত অনন্তকালীন জগতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত আছেন এবং অন্যদিকে, তিনি আমাদের সাথে সময়ের মাত্রায় বাস করছেন। বাস্তবিক, পুত্র ঈশ্বর যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে যুগের শেষ পর্যন্ত থাকবেন (মথি ২৮:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁর পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর তিনি স্বর্গে উঠে যান এবং এখন তিনি পরমদেশে আছেন। কিন্তু অন্যদিকে, সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর হিসাবে তিনি আমাদের অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে গত ২০০০ বছর ধরেই আছেন এবং যুগের শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে থাকবেন। তিনি পৃথিবীর সব জায়গায় আছেন এবং একই সাথে তিনি ঈশ্বরের মনোনীত সন্তানদের সাথে চলাচল করেন, তাদের পরিচালনা করেন ও তাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন (আদিপুস্তক ২৮:১৫; যাত্রাপুস্তক ৩:১২; ৪:১২; প্রেরিত্ ১৭:২৭ পদ দ্রষ্টব্য)।

খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা যীশুর সর্বত্র বিরাজমান অস্তিত্ব বুঝতে পারে না এবং স্বীকারও করে না। যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রতিদিন গভীরভাবে যীশুর সর্বত্র বিরাজমান অস্তিত্ব তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে স্বীকার করে না এবং ধ্যান করে না, তারা তাদের জীবনে যীশুর সর্বত্র বিরাজমান অস্তিত্ব ভুলে যায়। তারা স্বাধীনভাবে পাপ করে থাকে, কারণ তারা যীশুকে ভয় পায় না। তারা নিজেদের কাছে এবং অন্যদের কাছেও সততার পরিচয় দিতে পারে না। তারা অনায়াসে মিথ্যার সাথে বসতি করে। কারণ তারা অনায়াসে ভুলে যায় যে, যীশু তাদের দেখছেন এবং তাদের সব কথাবার্তা শুনছেন। যেহেতু তারা সত্যিই যীশুর উপস্থিতি বিশ্বাস করে না, সেহেতু তারা সব কিছুতেই জগতের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপে পূর্ণ হয়। তাছাড়াও, তারা অদৃশ্য যীশুর প্রতি ভক্তি রাখতে পারে না এবং দৃশ্যমান ও স্পর্শমান প্রতিমার উপাসনা করতে এগিয়ে যায়। এই সব প্রতিমাগুলো হচ্ছে− টাকা-পয়সা, ক্ষমতা, সম্মান, ব্যক্তি উন্নতি, আত্ম-প্রশংসা, জনপ্রিয়তা, সন্তান-সন্ততি, ভাল-স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

অন্যদিকে, যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরের গুণ-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে এবং প্রতিদিন গভীরভাবে ধ্যান করে, তারা এমন জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে যে জীবনে রয়েছে যীশুর প্রতি সম্মান ও ভক্তি-পূর্ণ ভয়। তাদের হৃদয় শান্তিপূর্ণ, কারণ তারা জানে যে, যীশু তাদের দিকে লক্ষ্য রাখছেন এবং সব সময় তাদের সাথে আছেন। তারা যখন যীশুর সাথে গমনাগমন করতে থাকে, তখন তারা সান্ত্বনা পায় ও সুরক্ষা পায়। তাদের হৃদয়ের গভীরে ঈশ্বরের আনন্দ ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়। অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দয়া ও সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়। তারা বিশ্বাস করে যে, প্রভু যীশু তাদের দেখাশোনা করবেন। তাদের আশা, তারা যীশুর অধীনে প্রতিষ্ঠিত অনন্ত রাজ্যে তাঁর সাথে বসবাস করবে এবং তাঁর সাথে গমনাগমন করবে। তারা এও জানে যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী এবং একদিন এমন সময় আসবে, যখন এই পৃথিবী ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে এবং অনন্ত রাজ্যে যেতে হবে। সুতরাং তাদের যাই হোক না কেন, এই শিক্ষা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে যে, তাদের প্রতিবেশীর সাথে নিঃস্বার্থ ভালবাসায় বসবাস করতে হবে (আগাপে ভালবাসা: ১ করিন্থীয় ১৩:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা সত্যিকার সুখী খ্রীষ্টিয়ান, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা দান হিসাবে পেয়েছে।

এখন পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের পরিচয় বহনকারী চারটি গুণ-বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করেছি। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, সর্বদর্শী ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর! এখন আমরা ঈশ্বরের চারটি চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধ্যান ও চিন্তা করব। তাঁর চারটি চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– তিনি প্রেমিক ঈশ্বর, দয়ালু ঈশ্বর, অনুগ্রহশীল ঈশ্বর এবং পবিত্র ঈশ্বর।

৯) প্রেমিক ঈশ্বর

ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা (১ যোহন ৪:৮, ১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরের এই ভালবাসা ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পিতা ঈশ্বর ভালবাসা দেন। তিনি হচ্ছেন প্রেমিক ঈশ্বর (যোহন ৩:১৬; ১৭:২৪; ১ যোহন ৪:৯ পদ দ্রষ্টব্য)। পুত্র ঈশ্বর জগতের কাছে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, কারণ তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা রয়েছে (রোমীয় ৮:৩৯ পদ দ্রষ্টব্য) এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরকে এই ভালবাসা প্রদর্শন করার জন্য শক্তি যুগিয়েছেন (তিনি আমাদের ভালবাসতে শেখান, রোমীয় ১৫:৩০; গালাতীয় ৫:২২ পদ দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বর তাঁর মনোনীত সন্তানদের এতই ভালবেসেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬-৮, ১৩; সফনিয় ৩:১৭; যোহন ১৪:২৩ পদ দ্রষ্টব্য) যে, তিনি তাদের জন্য পরিত্রাণ বা উদ্ধার ঘোষণা করেছেন। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে (ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা) এই পৃথিবীতে পাঠালেন যেন তিনি এসে কালভেরী পাহাড়ে ক্রুশের উপরে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করতে পারেন (যোহন ৩:১৬; রোমীয় ৫:৮; গালাতীয় ২:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। আমাদের ভাল কাজ বা ধার্মিকতার জন্য তা হয় নি; তাঁর লোকদের উপরে ঈশ্বরের একতরফা এবং নিঃশর্ত ভালবাসার জন্যই তা হয়েছে (১ যোহন ৪:১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা যেন তাঁর এই ভালবাসা তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে (যোহন ১৫:৯-১০ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরের যে সন্তানেরা তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর মতই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার নয়টি ফলের প্রকাশ ঘটে (গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। পবিত্র আত্মার নয়টি ফলের মধ্যে ভালবাসা হচ্ছে সবচেয়ে মহত্তর (১ করিন্থীয় ১৩:১, ১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। যে ঈশ্বরের ভালবাসার মধ্যে থাকে, সে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত এবং ঈশ্বরও তাঁর মধ্যে আছেন (যোহন ১৭:২৪-২৬; ১ যোহন ২:৫; ৪:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

তাছাড়াও, ঈশ্বর চান যেন তাঁর সন্তানেরা একে অন্যকে ভালবাসে, যেমন তিনি ভালবেসেছেন (যোহন ১৩:৩৪-৩৫; ১ যোহন ৪:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। এক কথায় তা হচ্ছে, যিহোবা ঈশ্বর যীশুর এই পৃথিবীতে এসে ক্রুশোপরি উৎসর্গের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ। ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা যীশু নিজেই আমাদের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন (ইফিষীয় ৫:২ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, "কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী ভালবাসা আর কারও নেই" (যোহন ১৫:১৩ পদ)।

ঈশ্বরের ভালবাসা দেওয়া মানে, পরিত্রাণের আশীর্বাদের সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া। এটা আমাদের জন্য দায়িত্ব। আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরে উৎসর্গীকৃত জীবন কাটাতে হবে (যোহন ১২:২৪-২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। পরিত্রাণ বা উদ্ধারের সুসমাচারের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন কাটাতে হলে প্রতিদিন ঈশ্বরের চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর ভালবাসাকে ধ্যান করতে হবে; যেন তাঁর ভালবাসা পবিত্র আত্মার অভিষেকের মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়ে ছড়িয়ে পরে (যিশাইয় ৬১:২; ২ করিন্থীয় ১:২১; ১ যোহন ২:২০ এবং ২৭ পদ দ্রষ্টব্য)। খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের এই ভালবাসা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে অন্যান্য ভাই-বোনদের এই ভালবাসার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। অন্যান্য জাতির লোক, যারা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালবাসতে চায় তারা অবশ্যই তা গ্রহণ করবে এবং তারাই সত্যিকার সুখী খ্রীষ্টিয়ান হবে। এই প্রকৃত সুখ পৃথিবীর আর কোন কিছুই দিতে পারে না।

১০) দয়ালু ঈশ্বর

ঈশ্বরের পরিচয় বহনকারী দ্বিতীয় চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ঈশ্বর দয়ালু। ঈশ্বর মংগলময় এবং তাঁর দয়া অনন্তকাল স্থায়ী (২ বংশাবলি ৫:১৩-১৪; গীতসংহিতা ৮৫:১০; লূক ১:৫০ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরের সন্তানেরা পাপে পতিত হয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকলে তিনি (ঈশ্বর) তাঁর সন্তানদের দয়ালু অন্তরে দেখে থাকেন (নহিমিয় ৯:৩১; বিলাপ ৩:২২-২৩; লূক ১:৭২ পদ দ্রষ্টব্য)। তাই যখন কেউ মন্দ পথ থেকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, তখন তিনি তার পাপ ক্ষমা করে অসীম দয়া দেখিয়ে থাকেন (যিশাইয় ৫৫:৭; যিহিষ্কেল ৩৩:১১-১৯; ১ পিতর ২:১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

যে খ্রীষ্টিয়ানেরা উপর-নীচ সম্পর্ক মেনে চলে না, ঈশ্বর তাদের অত্যন্ত ঘৃণা করেন (যাত্রাপুস্তক ২০:১-১১; মথি ২২:৩৮ পদ দ্রষ্টব্য)। আর একেই ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন দেব-দেবতার সেবা করা বুঝায়। এই কারণে ঈশ্বর খুবই কষ্ট পান। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর দয়ালু বলেই তিনি ধৈর্য ধরে সেই সব খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অপেক্ষা করেন, যারা অন্য দেব-দেবতার সেবা করে পাপ করেছে এবং কখন তারা অনুতাপ করে তাঁর কাছে ফিরে আসবে (গীতসংহিতা ১০২:১৩; ২ পিতর ৩:৯ পদ দ্রষ্টব্য)। মানবিক প্রেক্ষাপটে অনেকেই মনে করে, ঈশ্বরের দয়া নিঃশর্তভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, তারা অন্য অন্য দেব-দেবতার সেবা করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের দয়া সম্পর্কে এই কথা একেবারে ভুল।

ঈশ্বর দয়াশীল অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে তিনি ধৈর্যশীল। তাই তিনি অপেক্ষা করে থাকেন কখন একজন পাপী মন ফিরাবে। এর মানে এই নয় যে, তিনি অধার্মিকতা অনুমোদন দেন। সেই কারণে যিহোবা ঈশ্বর মোশির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির কাছে বলেছিলেন, "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, তিনি মমতায় পূর্ণ দয়াময় ঈশ্বর। তিনি সহজে অসন্তুষ্ট হন না। তাঁর অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সীমা নেই। তাঁর অটল ভালবাসা হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত থাকে। তিনি অন্যায়, বিদ্রোহ ও পাপ ক্ষমা করেন, কিন্তু দোষীকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। তিনি বাবার অন্যায়ের শাস্তি তার বংশের তিন-চার পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকেন" (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭; আরও যাত্রাপুস্তক ২০:৫-৬; গীতসংহিতা ১০৩:৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই কারণে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের শাস্তি দেন, যেন তারা তাদের পাপ সম্বন্ধে বুঝতে পারে, অনুতাপ করে ও তাদের পাপের পথ থেকে ফিরে আসে। সেজন্য ঈশ্বরের শাস্তিকে আরও ব্যাপকভাবে ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ বলা যেতে পারে। ইস্রায়েলীয়দের একটি পর্ব হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত দিন বা পাপ ঢাকা দেবার দিন (লেবীয় ১৬:১-৩৪ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই দিন আসলে পর মহা-পুরোহিত সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের প্রতিনিধি হয়ে পাপ ঢাকা দেওয়ার জন্য উৎসর্গীকৃত মেষের রক্ত মহাপবিত্র স্থানের সাক্ষ্য সিন্দুকের ঢাকনির উপরে, অর্থাৎ দয়ার আসনের উপরে ছিটিয়ে দিতেন। এই ভাবে সমস্ত জাতির পাপের ক্ষমা হোত (প্রায়শ্চিত্ত)। সাক্ষ্য সিন্দুকের ঢাকনিকে দয়ার আসন বা পাপ ঢাকা দেবার স্থানও বলা হয় (বাংলায় ঢাকনি, ইংরেজিতে কভার, হিব্রুতে কিপুর, যাত্রাপুস্তক ২৫:১৭, ২২; লেবীয় ১৬:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

খ্রীষ্টিয়ানেরা সেই রকম লোক, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সবচেয়ে মহত্তর দয়া পেয়েছে। যেহেতু তারা তাদের আদি পাপ ঢাকা দেবার সুযোগ পেয়েছে, সেহেতু আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা লাগাতারভাবে দিনের পর দিন ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা লাভ করতে পারছি। তাই ঈশ্বর ব্যতিত প্রতিমাকে ভালবাসা আমাদের উচিত নয় (অন্যভাবে- সম্পদ, ক্ষমতা, সন্তান-সন্ততি, পরিবার, শিক্ষা অর্জন, সম্মান, ভাল স্বাস্থ্য ইত্যাদি আমাদের জন্য প্রতিমা সদৃশ)। যারা লাগাতারভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসে, তারা প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছ থেকে মহত্তর দয়া পায় (গীতসংহিতা ১৮:২৫; মথি ৫:৭; ইফিষীয় ২:৪; ১ তীমথিয় ১:২; ২ তীমথিয় ১:২; তীত ১:৪ এবং যাকোব ৫:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। সেজন্য এই ধরনের লোকদের যীশু বলেছেন, তারা ধন্য ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত (মথি ৫:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা এই ধরনের দয়াশীল লোক হতে চেষ্টা করে, তারা প্রতিদিন ঈশ্বরের দয়া ধ্যান করে এবং এই দয়া অন্যান্য ভাই-বোনদের মধ্যে ও অন্যান্য ভাষা-ভাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়; তারাই মূলত সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করছে।

১১) অনুগ্রহশীল ঈশ্বর

যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের ভালবাসা ও দয়া বুঝতে পারে, তারা অনুগ্রহশীল ঈশ্বরের উপাসনা না করে পারে না (১ পিতর ৫:১০ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর মহান, দয়াশীল; সহজে রাগ করেন না। তিনি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততায় মহান ঈশ্বর (২ বংশাবলি ৩০:৯; নহিমিয় ৯:১৭; গীতসংহিতা ৮৬:১৫; ১০৩:৮ এবং যোয়েল ২:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর তাঁর সকল কাজেও মহান (গীতসংহিতা ১৪৫:১৭ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি নম্রদের অনুগ্রহ দেন (হিতোপদেশ ৩:৩৪; যাকোব ৪:৬ পদ দ্রষ্টব্য)। অনুগ্রহ বা দয়া করা মানে কাউকে বিনা স্বার্থে কিছু দেওয়া। অনুগ্রহ বা দয়া ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা বিনা পয়সার দান। ঈশ্বরের এই দয়া বা অনুগ্রহ নিঃস্বার্থ এবং একতরফাভাবে দেওয়া দান, যা একজন পাপীর পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাকে দেওয়া হয়ে থাকে।

সাধারণত, দুই ধরনের ঈশ্বরের অনুগ্রহ রয়েছে। প্রথমত, সাধারণ অনুগ্রহ বা দয়া। এক্ষেত্রে সূর্যের আলো, জল, বাতাস প্রভৃতির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঈশ্বরের সন্তানেরা এই সব থেকে উপকার গ্রহণ করে এবং জগতের অন্যান্য লোকেরাও এই উপকার পেয়ে থাকে; যা সকলের জন্য বিনা পয়সার দান (মথি ৫:৪৫; প্রেরিত ১৭:২৫ পদ

দ্রষ্টব্য)। সমস্ত সৃষ্টির জীবন ধারণের জন্য এই সব দান একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এই সবই খুব দামী এবং তা কোনভাবেই বদলে দেওয়া যায় না। এই সবই ঈশ্বর সকলের জন্য বিনা পয়সায় দিয়েছেন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশেষ দয়া বা অনুগ্রহ। তা হচ্ছে, যীশুর দেওয়া বিশেষ অনুগ্রহের সুসমাচার বা পরিত্রাণ বা উদ্ধারের সুসমাচার (প্রেরিত্ ২০:২৪; রোমীয় ৫:১৫; ১ করিন্থীয় ২:১২ এবং তীত ২:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর পুত্র যীশু নিজে এই পৃথিবীতে এসে তাঁর অমূল্য রক্ত ঝরালেন, কিন্তু তিনি তার জন্য কোন দাম দিতে বলেন নাই (রোমীয় ৩:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যখন এই সত্য নম্রতার সাথে ও কৃতজ্ঞতার সাথে বিশ্বাস করব, তখন ঈশ্বর তা মঞ্জুর করবেন। আদি পাপের জন্য আমরা যখন আত্মিকভাবে চিরকালের জন্য মৃত ছিলাম, তখন আমরা অনন্তজীবন ও স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার দান হিসাবে পেলাম (প্রেরিত্ ১৫:১১; রোমীয় ৪:১৬; গালাতীয় ১:৬ এবং ইফিষীয় ১:৭; ২:৫-৮ পদ দ্রষ্টব্য)। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, পরিত্রাণ বা উদ্ধার সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা দয়ার দান; কোন মানুষের কাজে বা চেষ্টায় তা পাওয়া যায় না (গালাতীয় ২:২১; ৫:৪; তীত ৩:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। এই অনুগ্রহ দান আমাদের দেবার জন্য ঈশ্বরকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল এবং পাপীদের প্রতি অনেক ধৈর্যশীল হতে হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬; নহিমিয় ৯:১৭, ৩১; রোমীয় ২:৪; ১ পিতর ৩:২০; ২ পিতর ৩:৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই বিশেষ অনুগ্রহ ঈশ্বর শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক লোককে দিয়েছিলেন, যাদের দায়িত্ব ছিল অন্য অন্য জাতির কাছে এই অনুগ্রহের সুসমাচার প্রচার করা। সেজন্য পৌল পরজাতীয়দের কাছে এই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। তিনি এও স্বীকার করেছিলেন যে, যদিও তিনি ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম, তবুও তাকে এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি পরজাতীয়দের কাছে এই সুসমাচার প্রচার করেন এবং ঈশ্বরের মহাপরিত্রাণ বা উদ্ধার পরিকল্পনা তাদের কাছে প্রকাশ করেন (রোমীয় ১৫:১৬; ১ করিন্থীয় ১৫:১০; ২ করিন্থীয় ১২:৯; গালাতীয় ১:১৫ এবং ইফিষীয় ৩:২ ও ৭-৯ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশুর অনুগ্রহ ছাড়া এই সুসমাচারের বাণী কেউই পরজাতীয়দের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারবে না।

পৌল এবং অন্যান্য প্রেরিত্দের সময়কালে প্রাথমিক যুগের মন্ডলীতে অনুগ্রহ বা দয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। বিশেষ করে, পৌল তার সবগুলো পত্রের মধ্যেই ঈশ্বরের অনুগ্রহকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন। উদাহরণ হিসাবে, তিনি তার পত্রগুলো লেখার শুরুতেই এভাবে বলেছেন, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের উপরে থাকুক" (ইফিষীয় ১:২; কলসীয় ১:২; ১ তীমথিয় ১:২ পদ দ্রষ্টব্য)। ঠিক একইভাবে পত্রগুলোর শেষে আশীষ বাণী উচ্চারণ করেছেন, "যীশু খ্রীষ্টের দয়া তোমাদের অন্তরে থাকুক" (২ করিন্থীয় ১৩:১৪; গালাতীয় ৬:১৮; ফিলিপীয় ৪:২৩ এবং ফিলিমন ১:২৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

শুধু পৌল নয়, পিতর ও যোহন ঠিক একই রীতি অনুসরণ করেছেন (১ পিতর ১:২; ২ পিতর ৩:১৮; প্রকাশিত বাক্য ২২:২১ পদ দ্রষ্টব্য)। "পিতা ঈশ্বর এবং সেই পিতার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে সত্য ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে দয়া, করুণা আর শান্তি আমাদের সংগে থাকবে" (২ যোহন ১:৩ পদ)। যে কারণে তারা সকলেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা দয়ার উপরে জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে– আমাদের হৃদয় যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ণ হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের শান্তি সাথে নিয়ে আশীর্বাদের খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে জীবন কাটাতে সক্ষম হব।

যদি আমাদের ভিতরে শয়তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে (তেতো গাছের শিকড়), তাহলে আমরা অনুগ্রহের আনন্দ উপভোগ করতে পারব না (ইব্রীয় ১২:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। অবশ্যই তেতো গাছের শিকড়গুলো (?) আমাদের মধ্য থেকে বের করে ফেলতে হবে এবং যীশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে, যা হচ্ছে পবিত্র আত্মার নয়টি ফল (গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যখন তা করব তখন আমাদের হৃদয় ও ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আমরা দেখতে পাব যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ শান্তি ও আনন্দ আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (রোমীয় ৫:২ পদ দ্রষ্টব্য)।

হৃদয়ের গভীরে আমরা যত বেশী করে যীশুর অনুগ্রহ ধারণ করব, তত বেশী করে যীশু আমাদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হবেন (২ করিন্থীয় ৪:১৫; ইফিষীয় ১:৬; ২ থিষলনীকীয় ১:১২ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই জন্যই দায়ূদ সব সময় নিজেকে নীচু করে তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন, যিহোবা ঈশ্বরের (যীশুর) অনুগ্রহ চেয়েছেন (গীতসংহিতা ৬:২; ৯:১৩; ২৫:১৬; ৩১:৯; ৪১:৪ পদ দ্রষ্টব্য) এবং তিনি যিহোবা ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহের প্রশংসা করেছেন (গীতসংহিতা ৩১:১৯; ১১৬:১২; ১৪৫:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, দায়ূদের মত আমাদেরও উচিত অনুগ্রহের শুচিতার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন খ্রীষ্টের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভের চেষ্টা করা এবং এমন জীবনের প্রত্যাশা করা, যে জীবন তাঁকে গৌরবান্বিত করতে অনুগ্রহে

পূর্ণ থাকে। আমরা যখন এইরকম জীবন-যাপন করি, তখন বুঝতে পারি যে- ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে সত্যিকার খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমরা সুখী ও সুন্দর জীবন-যাপন করছি।

১২) পবিত্র ঈশ্বর

চূড়ান্তভাবে বলা যায়, একই ঈশ্বর যেমন অনুগ্রহশীল ঈশ্বর, তেমনি তিনি পবিত্র ও ধার্মিক ঈশ্বর। পবিত্রতা হচ্ছে ঈশ্বরের সহজাত স্বভাব, দৃষ্টিভংগী ও ন্যায়ভাব। পবিত্রতার সাথে ন্যায়বিচার সমার্থক শব্দ। ঈশ্বর হচ্ছেন পবিত্র বা ধার্মিক (২ বংশাবলি ১২:৬; ইস্রা ৯:১৫; নহিমিয় ৯:৩৩; যিশাইয় ৪৫:২১; যোহন ১৭:২৫ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার ঈশ্বর হচ্ছেন ন্যায়বান এবং (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪ পদ দ্রষ্টব্য) তিনি পবিত্রতায় ন্যায়বিচার করেন (গীতসংহিতা ৯:৭-৮; ৯৬:১৩; ৯৮:৯; যিশাইয় ১১:৪-৫; প্রকাশিত বাক্য ১৬:৫-৭ পদ দ্রষ্টব্য)।

পবিত্র বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে যে, ঈশ্বর হচ্ছেন পবিত্র (ধার্মিক)। যিরমিয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছেন, “সেই দিনগুলো আসছে যখন আমি দায়ূদের বংশে একটা ন্যায়বান চারাকে তুলব; তিনি রাজা হয়ে জ্ঞানের সংগে রাজত্ব করবেন এবং দেশে সৎ ও ন্যায় কাজ করবেন। তাঁর সময়ে যিহূদা রক্ষা পাবে এবং ইস্রায়েল নিরাপদে বাস করতে পারবে। তাঁকে ‘সদাপ্রভু আমাদের নির্দোষিতা’ বলে ডাকা হবে” (যিরমিয় ২৩:৫-৬ ও ৩৩:১৫-১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। পুরাতন নিয়মে যিশাইয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, একদিন খ্রীষ্ট এসে উপস্থিত হবেন ও পরজাতীয়দের কাছে আলো হয়ে আসবেন এবং বিশ্বস্ততায় তিনি ন্যায়বিচার করবেন (যিশাইয় ৪২:১-৬ পদ ও লূক ২:৩২ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই সবই পূর্ণ হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ন্যায়-বিচারক পরিচর্যাকারী দাস হিসাবে এসেছিলেন (যিশাইয় ৫৩:১১ পদ দ্রষ্টব্য) এবং তিনি ক্রুশে তাঁর অমূল্য রক্ত ঝরিয়ে পাপী মানুষের জন্য পরিত্রাণ বা উদ্ধার দিয়েছেন। এই কাজটি করে তিনি ঈশ্বরের ধার্মিকতা (পবিত্রতা) প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের দেওয়া ধার্মিকতা হচ্ছে একাধারে পরিত্রাণ বা উদ্ধার; যা ঈশ্বরের ভালবাসা, দয়া এবং অনুগ্রহের প্রকাশ। তাই, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দরুণ আমরা ঈশ্বরের পূর্বনির্দিষ্ট সন্তানেরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক বা পবিত্র বলে পরিগণিত হয়েছি (রোমীয় ৪:২৫ পদ দ্রষ্টব্য)। এভাবেই ঈশ্বরের ধার্মিকতা খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং শুধুমাত্র বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে একজন ধার্মিক হতে পারে এবং পরিত্রাণ বা উদ্ধার পেতে পারে (রোমীয় ১:১৬-১৭; ১০:৯-১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

তদুপরি, যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন ন্যায়বিচারক (গীতসংহিতা ৭:১১; ২ তীমথিয় ৪:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশু তাঁর ধার্মিকতা দিয়েই বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ বা উদ্ধারের সুযোগ করে দেন (যিশাইয় ৪৫:২১; ৫১:৪; সখরিয় ৯:৯ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার, যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য তিনি অনন্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন (যোহন ৫:২৯; প্রেরিত্ ১৭:৩১; ২ থিষলনীকীয় ১:৫-৯ পদ দ্রষ্টব্য)। এভাবে, পাপের বিপক্ষে ধার্মিক ঈশ্বর তাঁর পবিত্রতার প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। কারণ ঈশ্বর পবিত্র, তাই তাঁর সামনে সমস্ত পাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক পাপীকে বিচার মেনে নিতে হয় (আদিপুস্তক ২:১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৯-১৩; গীতসংহিতা ৫৮:১১; রোমীয় ১:৩২; ২:৮-৯; প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বরের ধার্মিকতা মোশির আইন-কানুনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় বলা যায়। তাঁর ধার্মিকতার মাত্রা আইন-কানুনের চেয়ে উচ্চতায়, গভীরতায়, চওড়ায় ও লম্বায় অনেক অনেক বেশী। এখানে আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের গভীরে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের চোখ কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না (গীতসংহিতা ৭:৯; ১১:৪-৭; যিরমিয় ১১:২০ পদ দ্রষ্টব্য)।

তাই যীশু দেখতে পেয়েছিলেন যে, ফরীশীরা যদিও ভালভাবে আইন-কানুন পালন করছিলেন, তবু তাদের হৃদয়ে ধার্মিকতা ছিল না। তিনি তাদের বলেছিলেন, “ধিক্ ফরীশীরা! আপনারা ঈশ্বরকে পুদিনা, তেজপাতা ও সব রকম শাকের দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে থাকেন, কিন্তু ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার দিকে মনোযোগ দেন না। আগেরগুলো পালন করবার সংগে সংগে পরেরগুলোও পালন করা আপনাদের উচিত” (লূক ১১:৪২ পদ)। তাছাড়াও, যীশু বিশ্রাম দিনে একজন অসুস্থকে সুস্থ করেছিলেন বলে যিহূদীরা বিড়বিড় করে বলেছিল যে, তিনি বিশ্রাম দিনের আইন-কানুন ভাংছেন। তাদের উদ্দেশ্য করে যীশু বলেছিলেন, আপনারা “বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে বরং ন্যায়ভাবে বিচার করুন” (যোহন ৭:২৪ পদ)। এই কথাটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আইন-কানুন শুধুমাত্র বাইরের দিকটা প্রকাশ করে, কিন্তু আইন-কানুনের গভীরে লুকিয়ে আছে ঈশ্বরের ধার্মিকতা, যার মানে– ঈশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাঁর চরিত্র, তাঁর নীতিজ্ঞান ও ন্যায়বিচার।

মানুষ কখনোই ঈশ্বরের ধার্মিকতার স্তরে পৌঁছাতে পারে না। ঈশ্বরের চোখে আমরা পাপী এবং আমাদের নিজেদের সৎ কাজগুলো আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে না (দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৪-৫; যিহিষ্কেল ৩৩:১২; তীত ৩:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। ধার্মিক ঈশ্বরের সামনে আমরা শুধুমাত্র পাপী বলে নিজেদের স্বীকার করতে পারি এবং তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ চাইতে পারি। যখন আমরা প্রতিদিন ধার্মিক ঈশ্বরকে স্বীকার করব এবং আমাদের হৃদয়ের গভীরে তাঁকে ধ্যান করব, তখন ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ আমাদের জীবনে নেমে আসবে। এভাবেই আমরা ক্রমশ পরিশুদ্ধ হয়ে শুদ্ধ ও খাঁটি খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে বসবাস করতে সক্ষম হব।

ঈশ্বরের সঠিক পরিচয় বহনকারী ১২টি গুণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা এতক্ষণ পর্যালোচনা করেছি। আমরা তালিকা ৩-৩ থেকে দেখেছি যে, ঈশ্বরের এই ১২টি গুণ-বৈশিষ্ট্য তিনটি বিস্তৃত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে– যথা: তাত্ত্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্য, পরিচর্যার গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য। তাত্ত্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রথম চারটি হচ্ছে: ত্রিত্ব ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু ঈশ্বর, অনন্তকাল বিরাজমান ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর। অতঃপর, পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত পরিচর্যার গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে– সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, সর্বদর্শী ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর। সর্বশেষ, নয় থেকে বারো পর্যন্ত ঈশ্বরের গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে– প্রেমিক ঈশ্বর, দয়ালু ঈশ্বর, অনুগ্রহশীল ঈশ্বর, ধার্মিক বা পবিত্র ঈশ্বর।

ঈশ্বরের	পরিচয় বহনকারী	বাইবেলের পদ সমূহ
	০১] ত্রিত্ব ঈশ্বর	মথি ২৮:১৯; যোহন ১৭:১১,২১-২৩; ২ করিন্থীয় ১৩:১৪
	০২] স্বয়ম্ভু ঈশ্বর	যাত্রাপুস্তক ৩:১৪; যিশাইয় ২৬:১৫; ৪১:৪; ৫৯:১৬
	০৩] অনন্তকাল বিরাজমান ঈশ্বর	নহিমিয় ৯:৫; গীতসংহিতা ৯০:২; যিশাইয় ৪০:২৮; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৩
তাত্ত্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্য	০৪] অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর	গীতসংহিতা ১০২:২৭; দানিয়েল ৬:২৬; ইব্রীয় ১:১২; ১৩:৮
	০৫] সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর	যাত্রাপুস্তক ২০:১১; গীতসংহিতা ১০৩:১৯; যিশাইয় ৪৫:১২
	০৬] সর্বদর্শী ঈশ্বর	গীতসংহিতা ১৩৯:১-৮; রোমীয় ১১:৩৩; ইব্রীয় ৪:১৩
পরিচর্যার গুণ-বৈশিষ্ট্য	০৭] সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	আদিপুস্তক ১৭:১; ইয়োব ৪২:২; যিশাইয় ৯:৬; যিরমিয় ৩২:১৭; প্রকাশিত বাক্য ১৫:৩; ১৯:৬; ২১:২২
	০৮] সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর	আদিপুস্তক ২৮:১৫; গীতসংহিতা ১৩৯:৮-৯; যিশাইয় ৬:৩; যিরমিয় ২৩:২৪; আমোষ ৯:২; মথি ২৮:২০
	০৯] প্রেমিক ঈশ্বর	দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬-৮; ২ করিন্থীয় ১৩:১১; ইফিষীয় ৫:২; ১ যোহন ৪:১০
চারিত্রিক গুণ- বৈশিষ্ট্য	১০] দয়ালু ঈশ্বর	২ বংশাবলি ৫:১৩-১৪; যিশাইয় ৫৫:৭; বিলাপ ৩:২২-২৩; লূক ৬:৩৬
	১১] অনুগ্রহশীল ঈশ্বর	২ বংশাবলি ৩০:৯; গীতসংহিতা ১৪৫:১৭; মথি ৫:৪৫; ইফিষীয় ৩:৭-৯
	১২] পবিত্র (ধার্মিক) ঈশ্বর	দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৯-১৩; যিশাইয় ৪৫:২১; যিরমিয় ১১:২০; রোমীয় ১:১৬-১৭

তালিকা ৩-৩. ঈশ্বরের পরিচয় বহনকারী ১২টি গুণ-বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্তসার

উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ আলোচনা করার মৌলিক কারণ হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝে ঈশ্বরের বারোটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ের আলোকে পড়াশোনা করা এবং সেভাবে জীবন-যাপন করা। আমরা যতদিন এই পৃথিবী ছেড়ে না যাচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত আমরা প্রতিদিন ঈশ্বরের পরিচয়বহনকারী এই সব গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো স্বীকার ও ধ্যান করে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করব। যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা এভাবে তাদের জীবন-যাপন করে, তারা কোন প্রতিমার সেবা করে না; কিন্তু তারা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে। এছাড়াও, তারা ক্রমশ সত্যিকার আনন্দ উপভোগ করে থাকে, জগতের প্রতিমাগুলো তা কখনও দিতে পারে না। তারা এও বুঝতে পারে যে, এই সব সুখ ও আনন্দ তাদের কোন যোগ্যতায় তারা পায় নি, কিন্তু যীশুর অনুগ্রহে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের পূর্ণ দয়ায় তা লাভ করেছে। যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের পরিচয়বহনকারী এই বারোটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রথম চারটি দিনের পর দিন ধ্যান ও চিন্তা করে, স্বাভাবিকভাবে সে দ্বিতীয় ধাপে উত্তীর্ণ হতে পারে।

খ) দ্বিতীয় ধাপ: নিজ পরিচয় জানা, বোঝা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা

সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করার জন্য দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে– একজন মানুষ হিসাবে নিজ পরিচয় জানা, স্বীকার করা এবং ধ্যান করা। একজন মানুষ হিসাবে তার পরিচয় নীচে উল্লেখিত বারোটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

(০১) মানুষ মরণশীল! তার আদি পাপের কারণেই তাকে মরতে হবে। (অতীতে)
(০২) একজন ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে পরিপূর্ণ অনুগ্রহে তাকে মনোনীত ও নির্বাচিত করা হয়।
(০৩) একজন মানুষ হিসাবে তাকে অবশ্যই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন- যাপন করতে হবে।
(০৪) একজন মানুষ তার ভেতরে থাকা তেতো গাছের শিকড় (মন্দতা) থাকার কারণে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে পারে না।
(০৫) একজন মানুষকে অবশ্যই অন্তরে গরীব হতে হবে এবং ধন্য বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত জীবন-যাপন করতে হবে।
(০৬) একজন মানুষকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার সাহায্য নিতে হবে।
(০৭) একজন মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্তের সাহায্য নিতে হবে।
(০৮) একজন মানুষকে অবশ্যই খাঁটি হতে হবে এবং পবিত্র আত্মার নয়টি ফল তার জীবনে ধারণ করতে হবে।
(০৯) একজন মানুষকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তার জীবন মৃত্যু, তার সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা সবই ঈশ্বরের হাতে রয়েছে।
(১০) একজন মানুষকে স্বর্গরাজ্যের অনন্তজীবন পেতে পূর্ণ আশা রাখতে হবে।
(১১) একজন মানুষ বিশ্বাস করে যে, স্বর্গরাজ্যে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে।
(১২) একজন মানুষের অন্যদেরও সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন পরিচালনা দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে।

যখন একজন এই ধাপগুলো অতিক্রম করে এই সত্য স্বীকার করে, সাক্ষ্য দেয় এবং ধ্যান করে যে, সে একজন সৃষ্ট প্রাণী মাত্র; যাকে তার আদি পাপের জন্য মরতে হবে কিন্তু তাকে অনন্তজীবন দেওয়া হয়েছে এবং যীশুকে ধন্যবাদ দেবে যে তাঁরই অনুগ্রহে সে ঈশ্বরের সন্তান বলে গৃহিত হয়েছে। তদুপরি, ঈশ্বরের ভালবাসার জন্য সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে নিজেকে উৎসর্গ করবে। যারা তাদের অন্তরের গভীরে এই সব ধরে রাখে এবং মানুষ হিসাবে তাদের পরিচয় ধ্যান করে, তারা সত্যিকারভাবেই একজন নত-নম্র ও বুদ্ধিমান খ্রীষ্টিয়ান।

১) মানুষ মরণশীল! তার আদি পাপের কারণেই তাকে মরতে হবে

আমরা হঠাৎ করে সৃষ্ট হই নাই। ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতেই আমাদের সৃষ্টি করেছেন (গীতসংহিতা ১৩৮:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা আমাদের মায়ের গর্ভে গঠিত হবার আগে ঈশ্বর দেখেছেন (গীতসংহিতা ১৩৯:১৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং আমাদের জীবনের পরিকল্পনা করে রেখেছেন। আমাদের পিতা-মাতা কে হবে ঈশ্বর তা আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন। আমাদের ডিএনএ কাঠামো কি রকম হবে, কোথায় জন্ম হবে, কোথায় বড় হব, কতদিন বেঁচে থাকব ইত্যাদি সবই তাঁর পরিকল্পনার আওতায় (প্রেরিত্ ১৭:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করে তাদের দেখাশোনা করেছিলেন (যিশাইয় ৪৪:২ পদ দ্রষ্টব্য)। সেজন্য প্রত্যেকটি মানুষকে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে বেঁচে থেকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারণ ঈশ্বর বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টির কাজ করেন নি (যিশাইয় ৪৫:১৮ পদ দ্রষ্টব্য) এবং এ বিষয়ে তিনি কোন ভুল করেন নি।

কিন্তু আদমের পাপের (আদি পাপ) ফলে আমরা প্রত্যেক মানুষ অনন্ত শাস্তির অধীনে এবং আমরা আর ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে সমর্থ নই (আদিপুস্তক ৩:১-৬ পদ দ্রষ্টব্য)। একজন ব্যক্তি আদম শয়তানের প্রলোভনে পড়ে পাপে পতিত হবার ফলে পৃথিবীতে পাপ আসল। এভাবে সব মানুষই পাপের আওতায় চলে আসল (রোমীয় ৩:২৩, ৫:১২ পদ দ্রষ্টব্য)। কারণ পাপের বেতন (শাস্তি) মৃত্যু, কথাটি আমাদের সহ সব মানুষের জন্যই প্রযোজ্য এবং মানুষ অনন্ত জীবন হারিয়ে মৃত্যুর অধীনে চলে এসেছে (রোমীয় ৬:২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্য কথায়, সব

মানুষই ঈশ্বরের সন্তানের অধিকার পেয়েছিল (আদিপুস্তক ১:২৬-২৭; ২:৭ পদ দ্রষ্টব্য), কিন্তু আদি পাপের দরুণ তারা তাদের বৈধ অধিকার হারিয়ে শয়তানের সন্তানে পরিণত হল (প্রেরিত্ ১৩:১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

যার ফলে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে সব ধরনের শয়তানের মন্দ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চলে আসল এবং তাদের মধ্যে অনন্ত জীবনের বদলে অনন্ত মৃত্যু যুক্ত হল। কিন্তু এই মৃত্যু সাধারণভাবে দেহের মৃত্যু নয় (রোমীয় ৬:২৩ পদ দ্রষ্টব্য); এর মানে হচ্ছে অনন্ত মৃত্যু, অর্থাৎ এই কারণে মানুষের আত্মা ও প্রাণ চূড়ান্ত বিচারের পর (ইব্রীয় ৯:২৭; প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১২ পদ দ্রষ্টব্য) জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০:১৪; ২১:৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

পবিত্র বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের জন্মের আগেই আমাদের জীবনে আদি পাপ রয়ে গেছে। এই ধরনের নর-নারীদের লক্ষ্য করে যীশু বলেছেন, “শয়তানই আপনাদের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান; সেইজন্য আপনারা তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। শয়তান প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনও সত্যে বাস করে নি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে তা নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত মিথ্যার জন্ম তার মধ্য থেকেই হয়েছে” (যোহন ৮:৪৪ পদ)। তাছাড়াও, পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি দিয়ে পৌল সাক্ষ্য দিয়েছেন, “নির্দোষ কেউ নেই, একজনও নেই” (রোমীয় ৩:১০ পদ), “তাদের মুখ অভিশাপ ও তেতো কথায় ভরা” (রোমীয় ৩:১৪ পদ) এবং “তারা ঈশ্বরকে ভয়ও করে না” (গীতসংহিতা ৩৬:১; রোমীয় ৩:১৮ পদ)।

পুরাতন নিয়মের অনেক ভাববাদীরা স্বীকার করেছেন যে, মানুষ মাত্রই পাপী। দায়ূদ তার সাক্ষ্যে বলেছেন, “হ্যাঁ, জন্ম থেকেই আমি অন্যায়ের মধ্যে আছি; পাপের অবস্থাতেই আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম” (গীতসংহিতা ৫১:৫ পদ) এবং সদাপ্রভুর সামনে কোন প্রাণীই নির্দোষ নয়। “সবাই ঠিক পথ থেকে সরে গেছে, সবাই একসংগে খারাপ হয়ে গেছে; ভাল কাজ করে এমন কেউ নেই, একজনও নেই” (গীতসংহিতা ৫৩:৩; ১৪৩:২ পদ)। মোশি লিখেছেন, “সদাপ্রভু দেখলেন পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা খুবই বেড়ে গেছে, আর তার অন্তরের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই কেবল মন্দের দিকে ঝুঁকে আছে” (আদিপুস্তক ৬:৫ পদ)। আবার যিশাইয় ভাববাদী স্বীকার করেছেন, “তাদের পা পাপের দিকে দৌঁড়ে যায়; তারা নির্দোষীর রক্তপাত করবার জন্য তাড়াতাড়ি যায়। তাদের চিন্তা সবই মন্দ এবং তাদের পথে ধ্বংস ও সর্বনাশ থাকে” (যিশাইয় ৫৯:৭ পদ)। যাইহোক, মানুষ যখন তাদের অতীতের পাপ স্বভাব স্মরণ করে, তখন তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে উদ্ধার পাবার জন্য এবং অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য তাদের মনোনীত করা হয়েছে বলে নত-নম্র হয়ে তাঁর ধন্যবাদ ও গৌরব করে।

তাই, আমাদের অতীত সম্পর্কে জানা, বোঝা ও ধ্যান করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সত্যিকার পরিচয় স্মরণ করতে পারি। এটাই হচ্ছে প্রথম স্তর, যেখানে এসে আমরা প্রতিদিন আমাদের আদি পাপ স্বীকার করতে ও অনুতাপ করতে পারি। তা না হলে আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে পারি না এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি না। যারা এইরকমভাবে প্রতিদিন তাদের আদি পাপ স্বীকার ও অনুতাপ করে, তারা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেই গৌরব দেয়। তারাই ঈশ্বরের সন্তান, যারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে থাকে।

২) একজন ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে পরিপূর্ণ অনুগ্রহে তাকে মনোনীত ও নির্বাচিত করা হয়

এখন পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করেছি তার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে, আমরা সকলেই মরণশীল; মৃত্যুই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। সেই কারণে, আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারি না। আমরা অতীতে শয়তানের সন্তান ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অতুলনীয় ভালবাসায় যাদের আগে থেকে নির্বাচন করে উদ্ধার করবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন, যেন তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেন এবং ঈশ্বরকে খুশী করতে পারেন। এই কারণেই ত্রিত্বের দ্বিতীয় সত্তা পুত্র ঈশ্বর যীশু দৈহিকভাবে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন (মথি ১:২১-২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। তারপর, তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ক্রুশে বলি হয়েছিলেন (যিশাইয় ৫৩:১২ পদ দ্রষ্টব্য)। যখন আমরা এই সত্য বিশ্বাস করি, তখনই আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই। তখন আমরা আর বিনষ্ট হই না, কিন্তু পরিত্রাণ বা উদ্ধার ও অনন্ত জীবন পাই (যোহন ৩:১৬; ৫:২৪; রোমীয় ৬:২৩; ৮:২ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু তাঁর সুসমাচারের আলো জ্বেলে মৃত্যুকে ধ্বংস করে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং অমরত্ব দান করেছেন (যিশাইয় ২৫:৮; ২ তীমথিয় ১:১০ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যারা একজন আদমের পাপের জন্য মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত ছিলাম, তারা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে অনন্ত জীবন পেয়েছি, যেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক করতে অংশী হতে পারি (রোমীয় ৫:১৫; ১ করিন্থীয় ১৫:২২ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা আমাদের কোন কাজের দ্বারা পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তান হই নি। আমাদের ভাল কাজগুলো নোংরা কাপড়ের মত (যিশাইয় ৬৪:৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তাই সত্যিকারভাবেই আমরা আমাদের কোন কাজেই পরিত্রাণ বা উদ্ধার পেতে পারি না।

পরিত্রাণ বা উদ্ধার শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহে দেওয়া হয়েছে (ইফিষীয় ২:৮-৯ পদ দ্রষ্টব্য)। এটা ঈশ্বরের ইচ্ছার দান; আমাদের জন্মেরও আগে তা পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল (যোহন ১৭:১২; ১ করিন্থীয় ২:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরের সন্তান হবার জন্য আমরা আগে থেকেই মনোনীত এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত (গীতসংহিতা ১৩৯:১৬; যিরমিয় ১:৫; প্রেরিত্ ৯:১৫; রোমীয় ৮:২৯; গালাতীয় ১:১৫; ১ পিতর ১:২ পদ দ্রষ্টব্য) এবং যারা আগে থেকে মনোনীত, ঈশ্বর তাদের ধার্মিক ও গৌরবের অধিকারী করেছেন (রোমীয় ৮:৩০ পদ দ্রষ্টব্য)।

পবিত্র বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মাত্র অল্পসংখ্যক লোক পরিত্রাণ বা উদ্ধার পাবার জন্য পূর্ব-নির্দিষ্ট (রোমীয় ৯:২৭; প্রকাশিত বাক্য ২০:১২ পদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, আমরা যারা এই অল্প সংখ্যক লোকদের দলে– আমরা অবশ্যই আমাদের হৃদয়ের গভীরে এই সত্য স্বীকার করব এবং ধ্যান করব যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা পরিত্রাণ বা উদ্ধার পেয়েছি এবং অনন্ত জীবন লাভ করেছি। আর তারপরই আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হব। অর্থাৎ, আমরা আমাদের মানবিক বোধ-বুদ্ধির বাইরে ঈশ্বরের ভালবাসার অভিজ্ঞতা অর্জন করে সত্যিকার সুখ উপভোগ করতে পারব। তাই আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, কারণ তিনি আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যেন আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করি।

৩) মানুষ হিসাবে একজনকে অবশ্যই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে

আমরা যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিত্রাণ বা উদ্ধার লাভ করেছি, আমাদের অবশ্যই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর উপাসনা করি (যিশাইয় ৪৩:৬-৭, ২১ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যখন সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করব, শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারব (আদিপুস্তক ৬:৮; গীতসংহিতা ১৪৭:১১; লূক ২:১৪; ইফিষীয় ৫:১০; ইব্রীয় ১১:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর নিজেই মহাকাশ ও পৃথিবী, মাটির নীচের সব কিছু এবং তৃতীয় স্বর্গের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর ঈশ্বর সব কিছুর উপরে প্রশংসা পাবার যোগ্য (রোমীয় ৯:৫; কলসীয় ১:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা তাঁকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারি না। তাছাড়া, আমরা এই সত্য চিন্তা না করেও পারি না যে, সৃষ্টির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র হলেও ঈশ্বরের এই অতুলনীয় বিশালত্বকে গৌরব দেবার অনুমতি আমাদের দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে ঈশ্বরের দেওয়া মহান আদেশ এবং মহান নিয়োগ আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই মহান আদেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপর-নীচ আদেশ (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫; মথি ২২:৩৭-৩৮; মার্ক ১২: ৩০; লূক ১০:২৭ পদ দ্রষ্টব্য) “সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।” তাছাড়া, দ্বিতীয় মহান আদেশ বা সমান্তরাল আদেশও পালন করতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে, “ঈশ্বরের সন্তানদের একে অপরকে ভালবাসতে হবে” (মথি ২২:৩৯; যোহন ১৩:৩৪-৩৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

আমরা যখন উপর-নীচ সম্পর্ক (ঈশ্বরকে ভালবাসা) এবং সমান্তরাল সম্পর্ক মেনে চলি (প্রতিবেশীকে ভালবাসা), তখন অবশ্য আমরা কিছুটা হলেও মহান নিয়োগও পালন করতে পারি (মথি ২৮:১৯-২০; প্রেরিত্ ১:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোক হিসাবে তাঁর ভালবাসা যারা জানে না তাদের কাছে পৌঁছে দেব (মথি ২৪:৪৫; ২৫:২১-২৩ পদ দ্রষ্টব্য) এবং আত্মিকভাবে ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, ঘুরে বেড়ানো, ছেঁড়া কাপড় পরা, অসুস্থ, বন্দী ও অসহায় লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করব (মথি ২৫:৩৪-৪০ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর যীশু এখানে তাঁর সন্তানদের কাছে সরাসরি আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং, যারা এই আদেশ অনুসরণ করে ও পালন করে, তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করছে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছে।

৪) একজন মানুষ তার ভেতরে থাকা তেতো গাছের শিকড় (মন্দতা) থাকার কারণে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে পারে না

ঈশ্বরের সন্তান হলেও আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে পারি না, কারণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তেতো গাছের শিকড় (মন্দতা) রয়েছে (ইব্রীয় ১২:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। তেতো গাছের শিকড় বলতে হিংসা, ঘৃণা, গর্ব, ঠকামী, নিন্দা, অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুতা, রাগ, উদ্বেগ, বিরক্তি, জেদ, উদ্ধতভাব, হীনমন্যতা, প্রতিমা পূজা ইত্যাদি। এই সব তেতো গাছের শিকড়ের জন্যই আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি না, এমন কি আমাদের চারিদিকের অনেককে আমরা কষ্ট দিয়ে ফেলি।

যীশু আমাদের জন্য সতর্কবাণী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সব রকম মন্দ বিষয়গুলো আমাদের হৃদয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে এবং আমাদের অশুচি করে। আবার, যে সব মন্দ চিন্তাগুলো আমাদের হৃদয় থেকে বের হয়ে আসে, তা হচ্ছে– ব্যভিচার, চুরি, খুন, লোভ, অন্যের ক্ষতি করবার ইচ্ছা, ছলনা, লম্পটতা, হিংসা, নিন্দা, অহংকার ও মূর্খতা। এই সব মন্দ চিন্তা-ভাবনাগুলো মানুষের মনের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে এবং মানুষকে অশুচি করে (মার্ক ৭:২০-২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। পুরাতন নিয়মের যিরমিয় ভাববাদী তার সাক্ষ্যে বলেছেন, "অন্তর সব কিছুর চেয়ে ঠগ, তাকে কোন রকমে ভাল করা যায় না। কেউ মানুষের অন্তর বুঝতে পারে না" (যিরমিয় ১৭:৯ পদ)।

আমাদের হৃদয়ের মন্দ চিন্তা-ভাবনাগুলো আমাদের আত্মিক চোখ অন্ধ করে দেয় এবং আত্মিক কানও বধির করে দেয়। আমাদের জীবনে এরকম অবস্থা হলে আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারব না এবং ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য সঠিক জীবন-যাপন করতে পারব না। প্রেরিত্ পৌল তার স্থাপিত মন্ডলীগুলোতে ঝগড়া, বিবাদ এবং একে অন্যের প্রতি ঘৃণা লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি শয়তানের এরকম আচরণ থেকে সতর্ক থাকার জন্য সাবধানবাণী উচ্চারণ করে মন্ডলীগুলোকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন (১ করিন্থীয় ৬:৭-১১; গালাতীয় ৫:১৭-২১; ইফিষীয় ৪:২৫-৫:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি লিখেছেন, "যারা অন্যায় (শয়তানের আচার-আচরণ) করে তারা যে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না, তা কি তোমরা জান না?" (১ করিন্থীয় ৬:৯ক পদ; গালাতীয় ৫:২১; ইফিষীয় ৫:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা আমাদের সমস্ত কামনা-বাসনার পাপ স্বভাবগুলো ক্রুশে দিয়ে এবং পবিত্র আত্মার নয়টি ফল (গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ) লাভ করে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে পারি।

পরিপক্ক খ্রীষ্টিয়ানেরা এই উত্তরাধিকার পাবার যোগ্য। যারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করবে, তাদের অবশ্যই আত্মিকভাবে পরিপক্ক হতে হবে। যারা আত্মিকভাবে পুত্রত্বের ধাপ থেকে পিতৃত্বের ধাপে প্রবেশ করেছে, শুধু তাদেরই আমরা পরিপক্ক খ্রীষ্টিয়ান বলতে পারি। পবিত্র বাইবেলে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের নেতার পদমর্যাদা দেওয়া হবে। স্বর্গরাজ্যে নেতা হবার জন্য আমাদের অবশ্যই তেতো গাছের শিকড়গুলো ক্রমে ক্রমে উপড়ে ফেলতে হবে। যেহেতু আমরা সম্পূর্ণভবে এই মন্দতার শিকড় উপড়ে ফেলতে পারি না এবং আমাদের নিজেদের শক্তিতে শুচি হতে পারি না, সেহেতু ঈশ্বরের সাহায্য সর্বোপরি আমাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। যারা নত-নম্র হৃদয়ে ঈশ্বরের সাহায্য চায়, তারা এমন খ্রীষ্টিয়ান, যারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। তারা সত্যিকার সুখী জীবন-যাপনের পথে সাবলীলভাবে যাত্রা করে।

৫) একজন মানুষকে অবশ্যই অন্তরে গরীব হতে হবে এবং ধন্য বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত জীবন-যাপন করতে হবে

যে লোকেরা এই পঞ্চম স্তরে এসে পৌঁছেছে, তারা অবশ্যই তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সামনে অন্তরে (হৃদয়ে) গরীব ও নত-নম্র হয়েছে। অন্তরে গরীব হওয়া মানে ধন্য বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবার আরম্ভের মুহূর্ত (মথি ৫:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্তরে গরীব হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের অন্তরে বিভিন্ন রকমের তেতো গাছের শিকড় (মন্দতা) রয়েছে, যেগুলো যীশুর কাছে আসতে আমাদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। তার মানে, আমাদের জীবনে যীশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একেবারে নেই এবং আমরা আত্মিকভাবে গরীব।

যে লোক এই বিষয় বুঝে এবং তা ধ্যান করে সে অবশ্যই একজন নম্র ব্যক্তি এবং এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী। অন্যকথায়, যদিও তার পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর পরিবেশ ঈশ্বরের রাজ্যের মত নয়, তবু এই পৃথিবীতে থেকেই তার অন্তরের গভীরে (রোমীয় ৭:২২; ২ করিন্থীয় ৪:১৬; ইফিষীয় ৩:১৬ পদ দ্রষ্টব্য) স্বর্গরাজ্যের সুখ ও শান্তি উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে। অন্তরের গভীরে এই প্রক্রিয়া ক্রমশ শুচিতার দিকে অগ্রসরমান হতে থাকবে।

যে বা যারা তাদের অন্তরে তেতো গাছের শিকড় থাকার জন্য দুঃখ অনুভব করেন (মথি ৫:৪ পদ দ্রষ্টব্য), বাইবেলে উল্লেখিত দায়ূদ হচ্ছেন সেই দলের একজন ব্যক্তি। দায়ূদ স্বীকার করেছেন, "ভাংগাচোরা অন্তরই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উৎসর্গ; হে ঈশ্বর, নত এবং নম্র মনকে তুমি তুচ্ছ করবে না" (গীতসংহিতা ৫১:১৭ পদ)। "যাদের মন ভেংগে গেছে সদাপ্রভু তাদের কাছে থাকেন; যাদের অন্তর চুরমার হয়ে গেছে তিনি তাদের উদ্ধার করেন" (গীতসংহিতা ৩৪:১৮ পদ)।

আমরা যখন দুঃখে কাতর লোকের মত হই, তখন ঈশ্বরের সান্ত্বনা আমাদের উপরে আসে। যিশাইয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেই বলেছেন, "আমি উঁচু ও পবিত্র জায়গায় বাস করি, কিন্তু যার মন নম্র, যার মন ভেংগে চুরমার হয়েছে আমি তার সংগেও বাস করি যাতে নম্রদের ও মন ভেংগে চুরমার হওয়া লোকদের অন্তরকে আমি নতুন করে তুলতে পারি" (যিশাইয় ৫৭:১৫ পদ)। এভাবে ঈশ্বরের সান্ত্বনা আমাদের উপরে নেমে আসে এবং আমরা ক্রমশ পরবর্তী স্তরে পৌঁছে যাই, অর্থাৎ আমরা নত ও নম্র হই (মথি ৫:৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

নম্র ও ভদ্র বলতে আমরা একজন মালিকের ঘরে পোষ মানানো প্রাণীর সাথে তুলনা করতে পারি। একজন সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনকারী মানুষ যদি তার মালিকের বাধ্য থাকতে সব সময় প্রস্তুত থাকে, তাকে আমরা নম্র ও ভদ্র বলতে পারি। আশি বছর প্রশিক্ষণ পাবার পর ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যে, তিনি এই পৃথিবীর যে কোন লোকের চেয়ে নম্র (গণনাপুস্তক ১২:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। মোশি সব সময় যিহোবা ঈশ্বরের (যীশু) বাক্য সামনা-সামনি হয়ে শুনতেন এবং বাধ্যতার সাথে তা পালন করতেন।

নম্র লোকেরা অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ক্ষুধার্ত এবং পবিত্র আত্মার অভিষেক পাবার জন্য পিপাসিত থাকবে (মথি ৫:৬ পদ)। যাদের হৃদয় হবে দয়ালু, খাঁটি ও শান্তি স্থাপনে আগ্রহী, তারা যীশুর হৃদয় লাভ করতে পারবে। তাছাড়াও, তারা যে কোন রকম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা হাসি মুখে বরণ করে নিতে পারবে (মথি ৫:৭-১২ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশু বলেছেন, এই ধরনের লোকেরা হচ্ছে ধন্য বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত (মথি ৫:১-১২ পদ দ্রষ্টব্য)। এই সব আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে থাকে এবং তারা একসাথে ঈশ্বরের গৌরব করতে একত্রিত হয়ে থাকে।

লেখক হিসাবে আমি এই প্রার্থনা করি, যেন এই বইয়ের প্রতিটি পাঠক-পাঠিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে শুরু করে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। আর সত্যিকারভাবে তারা সকলেই যেন ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান জীবন উপলব্ধি করতে পারে।

৬) একজন মানুষকে অবশ্যই পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সাহায্য নিতে হবে

আমরা আমাদের শক্তিতে কোনভাবেই ধন্য বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রক্রিয়ায় যীশুর মত হতে পারি না। আমরা তো সম্পূর্ণভাবে নীতিভ্রষ্ট, দুর্বল, শক্তিহীন, পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী এবং সীমাবদ্ধ প্রাণী (যিশাইয় ৬৪:৬; রোমীয় ৩:২৩; ৭:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, আমরা ধার্মিক বা পবিত্র হতে পারি না এবং নিজের ইচ্ছাতে যীশুর সদৃশ হতে পারি না। যীশুর মত হতে হলে আমাদের খাঁটি হতে হবে, আর খাঁটি হতে হলে পবিত্র আত্মার সাহায্য ও অভিষেক আমাদের জীবনে প্রয়োজন (যিশাইয় ৬১:১; ২ করিন্থীয় ১:২১; ১ যোহন ২:২০ ও ২৭ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই কাজের জন্য 'হেগিয়ন পিনিউমা' (Hagion Pneuma) পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদের অন্তরের গভীরে সাহায্য করে থাকেন (যোহন ৭:৩৮-৩৯; ২০:২২ পদ দ্রষ্টব্য) এবং প্যারাক্লেটস (Paracletos) পবিত্র আত্মা বাইরে থেকে আমাদের অভিষেক প্রদান করেন (যোহন ১৪:১৬, ২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭ এবং প্রেরিত্ ১:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। এই দুটি নাম মূলত পবিত্র আত্মার নাম। দুটি নামই পবিত্র আত্মার কাজ ও তাঁর পরিচর্যার ক্ষেত্র। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর বাস্তবিক পক্ষে সব স্থানে আছেন এবং তিনি সর্বত্র বিরাজিত (যিশাইয় ৬:৩; ৪৩:২; যিরমিয় ২৩:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

'হেগিয়ন পিনিউমা' (Hagion Pneuma) পবিত্র আত্মা নামটি আমাদের ভিতরে পরিত্রাণ বা উদ্ধার কাজ সাধন করেন। তিনি আমাদের অন্তরের দুর্বলতা এবং তেতো গাছের শেকড় (মন্দতা) দেখতে পান এবং ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন অব্যক্ত আর্তস্বরে তিনি আমাদের জন্য অনুরোধ করেন (রোমীয় ৮:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি আমাদের মধ্যে জীবন

জলের উৎস (যোহন ৭:৩৮-৩৯ পদ দ্রষ্টব্য); তিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে থাকা তেতো গাছের শিকড়গুলো কেটে সাফ করে দেন।

আবার, অন্যদিকে, প্যারাক্লেটস (Paracletos) পবিত্র আত্মা মানে হচ্ছে সাহায্যকারী, পরামর্শদাতা, সান্ত্বনাদানকারী এবং শিক্ষক। তিনি আমাদের সাথে থাকেন এবং আমাদের পাশাপাশি হাঁটা-চলা করেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমরা যখন তাঁকে ডাকি, তখন তিনি আমাদের উপরে তাঁর শক্তির কাজ করেন। তাই, আমাদের উচিত প্রতিদিন প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁকে ডেকে ডেকে তাঁর সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে তোলা। সাহায্যকারী পবিত্র আত্মাকে আহ্বান জানালে পর তিনি আগুন (প্রেরিত্ ২:৩ পদ দ্রষ্টব্য) হিসাবে, বাতাস হিসাবে (প্রেরিত্ ২:২ পদ দ্রষ্টব্য), কপোতের মত (মথি ৩:১৬ পদ; মার্ক ১:১০ পদ) এবং আলো হিসাবে (প্রেরিত্ ৯:৩ পদ দ্রষ্টব্য) আসেন এবং আমাদের মধ্যে থাকা তেতো গাছের শিকড়গুলো গোড়া থেকে উপরে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দেন (ইফিষীয় ৬:১৭; ১ করিন্থীয় ৬:১১ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই রকম কাজকে "পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম" (প্রেরিত্ ১:৫ পদ দ্রষ্টব্য), বা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া (প্রেরিত্ ২:৪ পদ দ্রষ্টব্য), অথবা পবিত্র আত্মায় অভিষেক (যিশাইয় ৬১:১; ২ করিন্থীয় ১:২১; ১ যোহন ২:২০ ও ২৭ পদ দ্রষ্টব্য) পাওয়া বলা হয়। যখন আমরা শুধুমাত্র এই প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করি, তখন আমরা আত্মিকভাবে গড়ে উঠতে শুরু করি এবং আমাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ক্রমশ প্রভু যীশুর সদৃশ হয়ে উঠতে থাকে। তাছাড়াও, এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা ঈশ্বরের নির্দেশিত মহান আদেশ ও মহান নিয়োগ পালনে তৎপর হয়ে উঠি। সুতরাং, আমরা অবশ্যই নত-নম্র হৃদয়ে পবিত্র আত্মার অভিষেক যাচঞা করব এবং তাঁর সাথে সহভাগিতার গাঁটছড়া বাঁধব। যে খ্রীষ্টিয়ানেরা এরকম করে তারা ক্রমশ খ্রীষ্টিয়ান জীবনে বেড়ে উঠতে থাকে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপনে তৎপর হয়। তারা পবিত্র আত্মার শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে সত্যিকার সুখের স্বাদ গ্রহণ করে।

৭) একজন মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্তের সাহায্য নিতে হবে

আমরা যখন পবিত্র আত্মার সাহায্য পাই, তখন অবশ্যই আমাদের ভিতরে থাকা তেতো গাছের শিকড়গুলো উপড়ে ফেলতে পারি এবং সেই সাথে আমরা খাঁটি আত্মিক খাবার খেতে পারি। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জন্য আত্মিক খাবার, আবার যীশু নিজেই হচ্ছেন ঈশ্বরের বাক্য (যোহন ১:১ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই কারণে, যীশু তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই জীবন রুটি যিনি মানুষকে জীবন এবং জীবন্ত জল দেন। তিনি আবার বলেছেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, মনুষ্যপুত্রের মাংস ও রক্ত যদি আপনারা না খান তবে আপনাদের মধ্যে জীবন নেই" (যোহন ৬:৩২-৫৮ পদ দ্রষ্টব্য)। তাহলে, বাক্যরূপ যীশুকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে বসবাস করতে পারি না (যোহন ১:১২ পদ দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বরের বাক্যের দুটি প্রধান কাজ রয়েছে। প্রথমত, বাক্যের কাজ ধারালো ছোরার মত। এই বাক্য যে কোন ছোরার চেয়ে ধারালো, যা মানুষের অন্তর-আত্মা ও অস্থি-মজ্জার গভীরে কেটে বসে এবং মানুষের অন্তরের সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা পরীক্ষা করে দেখে (ইব্রীয় ৪:১২ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যকথায়, এই বাক্য আমাদের অন্তরে এসে ঢুকে এবং সব রকম তেতো গাছের শিকড়গুলো কেটে পরিষ্কার করে ফেলে (ইফিষীয় ৬:১৭; প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)।
আমাদের অন্তরে শয়তানের বৈশিষ্ট্য যত গভীরে লুকানো থাকুক না কেন, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যরূপ ছোরাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, পবিত্র আত্মার অভিষেকের পরেও আমাদের অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকা যে সব তেতো গাছের শিকড়গুলো থেকে যায়, তা সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলার জন্য ঈশ্বরের বাক্যরূপ ছোরা খেয়ে ফেলতে হবে; তার মানে– ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে হবে। ধ্যান হচ্ছে, আমাদের অন্তরের গভীরে ঈশ্বরের বাক্য পালন করার জন্য বার বার পড়া, চিন্তা করা, বোঝার চেষ্টা করা এবং সর্বোপরি তা পালন করার চেষ্টা করা (গীতসংহিতা ১:২; ৭৭:১২; ১১৯:৯৭ পদ দ্রষ্টব্য)। ধ্যান করার মধ্য দিয়ে বাক্যরূপ ছোরা আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে, যা সবরকম তেতো গাছের শিকড় সরিয়ে ফেলার জন্য শক্তিশালী অস্ত্র।

তাছাড়াও, ঈশ্বরের বাক্যের আত্মিক খাবার হিসাবেও দ্বিতীয় আর একটি কাজ রয়েছে। বাক্য আমাদের অন্তরের ভিতরে ঢুকে পুষ্টি প্রদান করে এবং তা আমাদের অন্তর ও আত্মাকে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে তোলে (১ করিন্থীয় ২:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য দায়ূদ বলেছেন, "সদাপ্রভুর প্রতি ... ... তা সোনার চেয়ে, প্রচুর খাঁটি সোনার চেয়েও বেশী কামনা করার মত জিনিষ। তা মধুর চেয়ে মিষ্টি, মৌচাকের ঝরা মধুর চেয়ে মিষ্টি" (গীতসংহিতা ১৯:৯-১০; ১১৯:১০৩

পদ দ্রষ্টব্য)। যিরমিয় এবং যিহিস্কেল ভাববাদী "ঈশ্বরের বাক্য" খাবার কথা তুলে ধরেছেন (যিরমিয় ১৫:১৬; যিহিস্কেল ২:৮-৯; ৩:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। আমোষ ভাববাদী বলেছেন, আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য না শুনি তবে আমাদের ঈশ্বরের বাক্য শুনবার খিদে ও পিপাসা লাগবে (আমোষ ৮:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। পৌল বলেছেন যে, যীশুই হচ্ছেন "আত্মিক খাদ্য এবং আত্মিক পানীয়" (১ করিন্থীয় ১০:৩-৪ পদ দ্রষ্টব্য)। পৌলের বিশ্লেষণে ইস্রায়েলীয়েরা প্রান্তরে যে মান্না খেয়েছিল এবং যে পাথর থেকে জল বের হয়েছিল, তা যীশু ছাড়া আর কেউ নয়।

আমাদের সকলেরই আত্মিক খাবার প্রয়োজন। যীশু বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সত্যিকারের খাবার এবং সত্যিকারের জীবন রুটি (যোহন ৬:৩১-৫৮ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যদি যথেষ্ট খাঁটি আত্মিক খাবার না খাই, তাহলে অন্তরে ও আত্মায় অসুস্থ হবার সম্ভাবনা দেখা যাবে। সেই জন্য অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে খাঁটি ও স্বাস্থ্যকর আত্মিক খাবার হিসাবে যীশুকেই আমাদের চেয়ে নিতে হবে। যারা তা করে, তারা ঈশ্বরের অসীম ভালবাসায় ও তাঁর দেখাশোনার অধীনে থেকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপনকারী খ্রীষ্টিয়ান।

৮) একজন মানুষকে অবশ্যই খাঁটি হতে হবে এবং পবিত্র আত্মার নয়টি ফল তার জীবনে ধারণ করতে হবে

ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে আমরা ক্রমশ পবিত্র আত্মার অভিষেক পেয়ে নিজেদের শুচি করে নিতে পারি। শুচি হওয়া মানে, আমাদের অন্তরে গেঁথে থাকা তেতো গাছের শিকড়গুলো উপড়ে ফেলে ক্রমশ যীশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে স্থান করে দেওয়া। এভাবে যীশুর মত হওয়া মানে বলা যায় যে, হৃদয়ে পবিত্র আত্মার ফল ধারণ করা। পবিত্র আত্মার ফল বলতে আমরা ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন করা বুঝি (গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। এই সবই মূলত যীশুর স্বভাব। সুতরাং, আমাদের অন্তরে যীশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা কতটা লাভ করতে পেরেছি, সেই মাপকাঠিতে আমরা কতটা শুচি হতে পেরেছি তা বোঝা সম্ভব হবে।

যীশু বলেছেন, শেষ কালে অনেক ভ্রান্ত ভাববাদীরা উঠে আসবে (ভ্রান্ত ভাববাদী বা নবী মানে– ভ্রান্ত পালক, ভ্রান্ত প্রচারক, ভ্রান্ত মিশনারি, ভ্রান্ত প্রেরিত, ভ্রান্ত শিক্ষক ইত্যাদি) এবং সম্ভব হলে ঈশ্বরের সন্তানদের ছিনিয়ে নেবে (মথি ৭:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। বাইরের দিক থেকে তারা মেষের মত, কিন্তু তাদের ভিতরের প্রকৃতি ভয়ংকর নেকড়ের মত। যীশু বলেছেন যে, তাদের জীবন-যাপন দেখে বা তাদের ফল দেখে অথবা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে আমাদের বুঝে নিতে হবে তারা ভ্রান্ত বা মিথ্যা ভাববাদী কি না (মথি ৭:১৬-২০ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই নীতি আমাদের জন্যও একইভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমরা যদিও প্রতিদিন ভোরের প্রার্থনা সভাতে যোগ দেই, প্রতি রবিবার প্রভুর দিনে উপাসনা করি, ভালভাবে প্রচার করি ও বাইবেল শিক্ষা দেই, একটা বড় মন্ডলীকে ভাল ভাবে দেখাশোনা করি, মন্দ আত্মা তাড়াই, অসুস্থকে সুস্থ করি, অতি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে মন্ডলীকে ভাববাদীসুলভ পরিচর্যা দেই এবং হয়তোবা আরও অনেক ভাল কিছু করি, কিন্তু যদি আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার ফল না থাকে তাহলে সব কিছুই নিরর্থক ও ব্যর্থ। কারণ যীশু মানুষের অন্তর দেখেন (১ শমূয়েল ১৬:৭; লূক ১৬:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু বলেছেন, যাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ফল নেই, বিচারের দিনে তারা পুরস্কার পাবে না। "তখন আমি সোজাসুজিই তাদের বলব, 'আমি তোমাদের চিনি না। দুষ্টের দল! আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও' " (মথি ৭:২৩ পদ)। অনেকে দাবী করে থাকেন যে, যীশুর এই সাবধান বাণী এমন সব ফলহীন লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা পরিত্রাণ হারিয়েছে। অন্যদিকে, এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ঈশ্বরের রাজ্য আসলে বিশ্বাসীরা যে মুকুট ও পুরস্কার পাবে এই পদটি তারই সাথে সম্পর্কযুক্ত (মথি ৬:১ পদ দ্রষ্টব্য)। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যীশুর প্রথমবার এই পৃথিবীতে আসা থেকে শুরু করে তার দ্বিতীয়বার আসা পর্যন্ত সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাস জুড়ে অনেক ভ্রান্ত ভাববাদীরা এসে গেছে এবং আসছে। যারা মুকুট ও পুরস্কার পাবে না। এটাই প্রভু যীশুর বলা ভবিষ্যদ্বাণী।

স্বর্গরজ্যে আমাদের পদমর্যাদা ও শ্রেণী নির্ভর করছে আমরা আমাদের বর্তমন জীবনে কতটা পরিমাণ শুচি হতে পেরেছি তার উপর। সেই কারণে, আমরা প্রতিদিন প্রভুর সামনে আমাদের অন্তর পরীক্ষা করব। এভাবে, যারা শুচি হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পবিত্র আত্মার সাহায্য চায় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে, তারা সত্যিই ত্রিত্ব ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে।

৯) একজন মানুষকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তার জীবন, মৃত্যু এবং তার সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা সবই ঈশ্বরের হাতে রয়েছে

একজন ব্যক্তি যখন কিছুটা হলেও শুচি হয়, তখন তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যে, জীবন ও মৃত্যু, সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা যিহোবা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৫ ও ১৯ পদ দ্রষ্টব্য); তাই সে প্রতিদিন এই বিষয়গুলো স্বীকার করে ও মেনে নেয়। যদি আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জীবন ও মৃত্যু, সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা যীশুর হাতের মুঠোয়, তাহলে আমাদের চারিদিকে যাই ঘটুক না কেন অথবা যত কষ্টই আসুক না কেন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে শান্তি লাভ করতে পারব। কারণ আমরা এও জানি যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের দিকে চোখ রেখেছেন এবং তার অনুমতি ছাড়া মাথার একটা চুলও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না (লূক ১২:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। এখন আমরা জীবন ও মৃত্যু, সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা সবকিছুতেই ঈশ্বরের উপরে নির্ভরতা রাখতে পারব। যে খ্রীষ্টিয়ানেরা সবকিছুতে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে থাকে, আমরা তাদের বলি বিশ্বাসে বীর।

এই পৃথিবীর সব রকম আশীর্বাদ এবং সবরকম অভিশাপ ঈশ্বরের দ্বারা নিরূপিত এবং প্রদত্ত হয় (দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন, “দেখ, আজ আমি তোমাদের সামনে একটা আশীর্বাদ ও একটা অভিশাপ তুলে ধরছি” (দ্বিতীয় বিবরণ ১১:২৬ পদ)। যে ঈশ্বরের বাক্য পালন করে, তিনি তাকে জীবন ও আশীর্বাদ দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১১:২৭-২৮; ৩০:১৫-২০ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে মৃতকেও জীবিত করতে পারেন (১ রাজাবলি ১৭:১৭-২৪; মথি ৯:২২-২৫; মার্ক ৫:৩৫-৪৩; যোহন ১১:১৭-৪৪; প্রেরিত্ ৯:৩৭-৪০; ২০:৯-১২ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর নিজেই অব্রাহামকে ডেকে আশীর্বাদ করেছিলেন (আদিপুস্তক ১২:১-৩ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়াও, যিহোবা ঈশ্বর তার মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ১৮:১৮; ২২:১৮; ২৬:৪; ২৮:১৪; যিশাইয় ৪৯:৬; প্রেরিত্ ২৮:২৮; গালাতীয় ৩:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। আমাদের আত্মিক চোখ খোলা থাকবে না বন্ধ থাকবে তা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:৪; ৩২:২০-২২; গীতসংহিতা ৬৯:২৩; যিশাইয় ৬:৯-১০; ২৯:১০; মথি ২৩:৩৭-৩৯; রোমীয় ১১:৮-১২, ২৫-২৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

বাইবেলে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা যিহোবা ঈশ্বর যীশুকে সর্বোচ্চ স্থানে তুলে ধরেছেন; কারণ তারা জানেন, জীবন ও মৃত্যু, সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা সবকিছুই তাঁর হাতের অধীনে। যিশাইয় ভাববাদী ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলেছেন, “সদাপ্রভু ঈশ্বর আকাশ সৃষ্টি করে মেলে দিয়েছেন; তিনি পৃথিবী ও তাতে যা জন্মায় তা সব বিছিয়ে দিয়েছেন; তিনি সেখানকার লোকদের নিঃশ্বাস দেন আর যারা সেখানে চলাফেরা করে তাদের জীবন দেন” (যিশাইয় ৪২:৫ পদ)। দায়ূদ স্বীকার করেছেন, “সদাপ্রভু যদি ঘর তৈরী না করেন তবে মিস্ত্রীরা মিথ্যা পরিশ্রম করে; যদি সদাপ্রভু শহর রক্ষা না করেন তবে পাহারাদার মিথ্যাই পাহারা দেয়” (গীতসংহিতা ১২৭:১ পদ)। ইয়োব বলেছেন, “আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি কেবল মংগলই গ্রহণ করব, অমংগল গ্রহণ করব না?” (ইয়োব ২:১০ পদ) এবং “মানুষের আয়ু স্থির করা আছে; তুমি তার মাসের সংখ্যা ঠিক করে রেখেছ; তার সীমা তুমি ঠিক করেছ, সে তা পার হতে পারে না” (ইয়োব ১৪:৫ পদ)। তিনি স্বীকার করেছেন যে, জীবন ও মৃত্যু, সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা ঈশ্বরের হাতে রয়েছে।

একই স্বীকারোক্তি নতুন নিয়মেও দেখা যায়। পৌল এ কথা বলে শিক্ষা দিয়েছেন, “ঈশ্বরের চোখে অব্রাহাম আমাদের সকলেরই পিতা। যিনি মৃতকে জীবন দেন এবং যা নেই তা আছে বলে ঘোষণা করেন সেই ঈশ্বরকে অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন” (রোমীয় ৪:১৭ পদ)। যাকোব প্রশংসা করে বলেছেন, “মাত্র একজনই আছেন যিনি আইন-কানুন দেন ও বিচার করেন। তিনিই রক্ষা করতে পারেন এবং ধ্বংস করতে পারেন”; তিনি এও স্বীকার করেছেন, “প্রভু যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা বেঁচে থাকব এবং এটা বা ওটা করব” (যাকোব ৪:১২-১৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল বিশ্বাসী ঈশ্বরের সন্তানেরা সার্বভৌম ঈশ্বরের প্রশংসা করে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন যে, জীবন ও মৃত্যু, সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা সুনিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের হাতে (মথি ২০:১৫; রোমীয় ৯:২১ পদ দ্রষ্টব্য)। তাদেরই মত আমাদের সকলের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমাদের জীবন ও মৃত্যু, সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাতে; তাই তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে হবে। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে আমরা যখন তা করি, তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে পবিত্র আত্মার শান্তি প্রচুর পরিমাণে আমাদের উপরে নেমে আসে। এই শান্তি জগতের কোন কিছু, অর্থাৎ জাগতিক সম্পদ, ক্ষমতা, সম্মান, পরিবার ইত্যাদির বিনিময়ে পাওয়া যায় না।

১০) একজন মানুষকে স্বর্গরাজ্যের অনন্তজীবন পেতে পূর্ণ আশা রাখতে হবে

এই স্তরে এসে আমরা বুঝতে পারছি যে, কোন একদিন আমাদের প্রাণ ও আত্মা এই পৃথিবী ছেড়ে পরমদেশে চলে যাবে (লূক ২৩:৪৩ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা এও বুঝতে পারছি যে, আমাদের দেহ মাটিতে ফিরে যাবে (আদিপুস্তক ৩:১৯ পদ দ্রষ্টব্য)। এমন কি এই পৃথিবীও চিরকাল টিকে থাকবে না। আমরা এই পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী হিসাবে বসবাস করছি এবং আমাদের জীবন ছায়া সদৃশ (১ বংশাবলি ২৯:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। এই জন্যই যীশু বলেছিলেন যে, আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা এই পৃথিবীর নই, আমরা আগত ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা (যোহন ১৫:১৯ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা সাময়িকভাবে এই পৃথিবীতে বাস করছি, হতে পারে ৭০ বা ৮০ বছর বাঁচব। তারপর আমাদের দেহ মাটিতে ফিরে যাবে এবং আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব (গীতসংহিতা ৯০:১-১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

বাইবেলে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা এই পৃথিবীকে সাময়িক আবাসস্থল এবং নিজেদের প্রবাসী বলে উল্লেখ করেছেন (আদিপুস্তক ৪৭:৯; ১ পিতর ২:১১ পদ দ্রষ্টব্য)। গীত রচয়িতা মোশি এবং দায়ূদ তাদের স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, "ঘাসের আয়ুর মতই মানুষের আয়ু, মাঠের ফুলের মতই সে ফুটে ওঠে" (গীতসংহিতা ১০৩:১৫ পদ)। আবার, "ভেবে দেখ আমার জীবনকাল কত ছোট; কি অসারতার জন্যই না তুমি মানুষকে সৃষ্টি করেছ" (গীতসংহিতা ৮৯:৪৭; ৯০:৩ ও ১০ পদ এবং ১৪৪:৪ পদ দ্রষ্টব্য)! ইয়োব বলেছেন, "স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানুষের জীবন অল্পদিনের, আর তা কষ্টে পরিপূর্ণ। সে ফুলের মত ফুটে ওঠে তারপর শুকিয়ে যায়; সে ছায়ার মত চলে যায়, আর থাকে না" (ইয়োব ১৪:১-২ পদ)। শলোমন বলেছেন, "মানুষের প্রতি যা ঘটে পশুর প্রতিও তা-ই ঘটে" (উপদেশক ৩:১৯ পদ)। নতুন নিয়মে যাকোব বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের জীবন "বাষ্প মাত্র, যা কিছুক্ষণের জন্য থাকে আর তারপর মিলিয়ে যায়" (যাকোব ৪:১৪ পদ)। আর পিতর যিশাইয় ভাববাদীর উক্তিকে সমর্থন করে বলেছেন, "সব মানুষ ঘাসের মত, আর ঘাসের ফুলের মতই তাদের সব সৌন্দর্য" (১ পিতর ১:২৪; যিশাইয় ৪০:৬-৭ পদ)।

তবুও, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা আমাদের আছে (তীত ১:২ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা এই পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য আছি এবং স্থির করা নির্দিষ্ট সময় আসলে পর আমরা পরমদেশে চলে যাব (লূক ২৩:৪৩ পদ দ্রষ্টব্য)। আমাদের এই পৃথিবীর অস্থায়ী তাঁবু যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আমরা স্বর্গের অনন্তকালীন বাসস্থানে উঠে যাব (২ করিন্থীয় ৫:১ পদ দ্রষ্টব্য)।

আমাদের জীবনে যখন অনন্তজীবনের এই প্রত্যাশা নিশ্চিত হয়, তখন জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-স্ফূর্তি আমাদের কাছে একেবারে অর্থহীন হয়ে যায় এবং জগতের সব রকম সমস্যা অতিক্রম করতে আমরা সমর্থ হই। সেই জন্য পৌল অনেক অত্যাচার ও কষ্টের মধ্য দিয়ে চলেও সাক্ষ্য দিয়েছেন, "খ্রীষ্টের উপর আমাদের যে আশা তা যদি কেবল এই জীবনের জন্যই হয় তবে সমস্ত মানুষের মধ্যে আমাদেরই বেশী দুর্ভাগ্য" (১ করিন্থীয় ১৫:১৯ পদ)।

যখন আমরা এই রকম একজন ব্যক্তিত্ব হই তখন এই পৃথিবীতে দৈহিকভাবে বাস করলেও আমরা আর এই জগতের লোক থাকি না। বরং এই মন্দ পৃথিবীর মধ্যে বাস করেও আমরা স্বর্গরাজ্যের প্রজা হিসাবে থাকি (ইফিষীয় ২:১৯; ফিলিপীয় ৩:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা দৈহিকভাবে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকলেও অনন্তকালীন উত্তরাধিকার পেয়েই আমরা বসবাস করি।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে আমরা অনন্ত জীবনের আনন্দ লাভ করেছি। যারা যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে যে, তিনি ঈশ্বরের একজাত পুত্র, যিনি মানুষের জন্য তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, তারাই অনন্ত জীবন পাবার অধিকারী (যোহন ৩:১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। যারা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব, তাঁর কুমারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া, মানুষের পরিত্রাণ বা উদ্ধারের জন্য ক্রুশে রক্ত ঝরানোর মধ্য দিয়ে এই বহুমূল্য রক্তের ক্ষমতা এবং তাঁর পুনরুত্থান বিশ্বাস করে, তারাই অনন্ত জীবন লাভ করতে পেরেছে (যোহন ৪:১৪; ৬:৩৯-৫৮; ১৭:২-৩; রোমীয় ৬:২৩; ১ তীমথিয় ১:১৬; ১ যোহন ৫:১১-২০ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু খ্রীষ্টই অনন্ত জীবন। আর অনন্ত জীবন মানে হচ্ছে- সত্যিকার ঈশ্বরকে জানা এবং তিনি যাঁকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানা (যোহন ১৭:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমাদের একমাত্র আশা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্ট (গীতসংহিতা ৩৯:৭; ১৪৬:৫; যিরমিয় ১৭:১৩; প্রেরিত্ ২৮:২০; রোমীয় ১৫:১২; ১ তীমথিয় ১:১;

১ পিতর ১:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। যে খ্রীষ্টিয়ানেরা এই বিশ্বাসে স্থির এবং এই প্রত্যাশা নিয়ে জীবন-যাপন করে, তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারেই জীবন-যাপন করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছে। তারাই ঈশ্বরের দেওয়া সত্যিকার সুখ উপভোগ করবে।

১১) একজন মানুষ বিশ্বাস করে যে, স্বর্গরাজ্যে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে

আমরা যে শুধু অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা করি তা-ই নয়, আমরা বিশ্বাসও করি যে আমরা স্বর্গরাজ্যের পুরস্কার পাব। ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য স্বর্গরাজ্যের এই পুরস্কার সকল সৃষ্টির আগে থেকেই প্রস্তুত করা হয়েছে (মথি ২৫:৩৪; লূক ২৩:৪৩; যোহন ১৪:২; ১ করিন্থীয় ২:৯-১০; ২ করিন্থীয় ১২:২-৪; ফিলিপীয় ৩:২০; প্রকাশিত বাক্য ২:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। আমাদের অন্তরের শুচিতার মাপকাঠিতে এবং যীশুর দেওয়া মহান আদেশ ও মহান নিয়োগ বিশ্বস্তভাবে পালন করার ফলস্বরূপ স্বর্গে আমাদের পুরস্কার ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হবে (১ করিন্থীয় ১৫:৪১; প্রকাশিত বাক্য ২১:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। ঠিক সেই কারণে ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এই কথা লিখেছেন, “বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ ঈশ্বরের কাছে যে যায়, তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর আছেন এবং যারা তাঁর ইচ্ছামত চলে তারা তাঁর হাত থেকে তাদের পাওনা পায়” (ইব্রীয় ১১:৬ পদ)।

যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করে, তিনি তাদের অনেক উপরে উঠান (গীতসংহিতা ৯১:১৪; যোহন ১২:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর বলেছেন, “যারা সুসমাচার প্রচার করেন এবং অনেক লোককে ধার্মিকতার পথে পরিচালিত করেন তারা আকাশের তারাগুলোর মতই জ্বল্ জ্বল্ করবে” (দানিয়েল ১২:৩ পদ দ্রষ্টব্য)। বিশেষ করে, যারা যীশু খ্রীষ্টের জন্য অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করে, এই পৃথিবীতে যারা নিজেদের নীচু করে ও প্রভুর জন্য নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করে না, স্বর্গরাজ্যে তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে, প্রভু যীশুই এ কথা বলেছেন (মথি ৫:১২; ২০:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই পুরস্কারকে পবিত্র বাইবেলে মুকুট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে মোট সাতটি মুকুটের কথা বলা হয়েছেঃ যেমন– **(১) আনন্দের মুকুট** (১ থিষলনীকীয় ২:১৯; ফিলিপীয় ৪:১ পদ দ্রষ্টব্য), **(২) জীবন মুকুট বা জয়ের মালা** (যাকোব ১:১২; প্রকাশিত বাক্য ২:১০ পদ দ্রষ্টব্য), **(৩) অক্ষয় মুকুট বা যে মালা নষ্ট হয় না** (১ করিন্থীয় ৯:২৫ পদ দ্রষ্টব্য), **(৪) প্রতাপ মুকুট** (১ পিতর ৫:৪ পদ দ্রষ্টব্য), **(৫) ধার্মিকতার মুকুট** (২ তীমথিয় ৪:৮ পদ), **(৬) সুবর্ণ মুকুট** (প্রকাশিত বাক্য ৪:৪; ১৪:১৪ পদ দ্রষ্টব্য) এবং **(৭) দ্বাদশ তারার মুকুট** (প্রকাশিত বাক্য ১২:১ পদ দ্রষ্টব্য)।
[বাইবেলের পুরানো অনুবাদে “মুকুট” এবং সহজ বাংলা অনুবাদে “মালা” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে]

বিশ্বাসের আদি পিতারা বিশ্বাস করতেন যে, এই পুরস্কার যীশুই তাদের দেবেন। তাই তারা তাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রভু যীশুর সেবা করেছেন। মোশি মিসরের অস্থায়ী আনন্দ ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন বাদ দিয়ে খ্রীষ্টের জন্য অপমানিত হওয়ার মূল্য বেশী বলে মনে করেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর দেওয়া এই পুরস্কারের দিকে চোখ রেখেছিলেন (ইব্রীয় ১১:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। প্রেরিত্ পৌলও আগে থেকেই তার জন্য রাখা ধার্মিকতার মুকুট পাবেন এই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছেন, কারণ তিনি অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন (২ তীমথিয় ৪:৭-৮ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশুর বারো জন শিষ্য (প্রেরিত্ ১:২৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং পরবর্তীতে তাঁর আরও অনেক শিষ্যেরা এই পুরস্কারে বিশ্বাস করেছেন এবং প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করেছেন। পরবর্তীতে, তারা বিদেশে গিয়ে সুসমাচার প্রচার ক্ষেত্রে শহীদ (সাক্ষ্যমর) হয়েছেন।

ঠিক তাদেরই মত করে আমরাও বিশ্বস্তভাবে এই জগতে সুসমাচার প্রচার কাজ করব, যেন তার মূল্য হিসাবে আমরাও যীশুর কাছ থেকে পুরস্কার পাবার প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করি (২ বংশাবলি ১৫:৭; যিশাইয় ৪০:১০; ৬২:১১; মথি ১৬:২৭; প্রকাশিত বাক্য ২২:১২ পদ দ্রষ্টব্য), কারণ যীশু নিজেই আমাদের এই পুরস্কার দেবেন। যারা সমগ্র বাইবেল বিশ্বাস করেন এবং তার আদেশ ও নিয়ম পালন করে; তারা এমন খ্রীষ্টিয়ান, যারা ঈশ্বরের গৌরব করে এবং তার ফলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা করা আশীর্বাদ তাদের উপরে নেমে আসে।

১২) একজন মানুষের অন্যদেরও সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে পরিচালনা দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে

এতক্ষণ আমরা শুচি (পবিত্র) হবার উপায় নিয়ে ধারাবাহিক ও বিরামহীন আলোচনা করতে করতে আমরা জেনেছি যে, প্রভু যীশুর বলা মহান আদেশ ও মহান নিয়োগ আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। তাছাড়াও, ঈশ্বরের মনোনীত বিশেষ সহকর্মী হিসাবে অন্যদেরও সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে পরিচালনা দেওয়া আমাদের বিশেষ কাজ। আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা অন্যদের দেখাশোনা করি, নির্দেশ ও শিক্ষা দেই (আদিপুস্তক ১:২৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

মূলত, আদমকে (মানুষকে) এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার পতনের পর তার পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন আমাদের আদি পাপ যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশে বহুমূল্য রক্ত ঝরানোর মধ্য দিয়ে শুদ্ধ হয়েছে; আমরা শুচি (পবিত্র) খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে যীশুর মত হবার আকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগত আমাদের ভিতরে থাকা তেতো গাছের শিকড়গুলো উপড়ে ফেলছি এবং এই বিশেষ দায়িত্ব লাভ করেছি।

যাদের হাতে এই বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রেরিত্ পিতর তাদের 'বাছাই করা বংশ' এবং 'রাজকীয় পুরোহিত' বলে বর্ণনা করেছেন (১ পিতর ২:৯ পদ দ্রষ্টব্য)। মূলত তারাই ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার পাবে (গীতসংহিতা ২:৮; মথি ৫:৫; গালাতীয় ৪:৭; ৫:২১ ও যাকোব ২:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা হবে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে রাজা ও রাণী; নতুন যিরূশালেমে তারাই তাদের জাঁকজমক নিয়ে থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। মানুষের পরিত্রাণ বা উদ্ধারের ইতিহাসের ৭০০০ বছর পূর্ণ হলে পর এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী আসবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:১ পদ দ্রষ্টব্য)। তখন এই মনোনীত রাজকীয় বংশ ঈশ্বরের রাজ্য শাসন ও পরিচালনা করবে এবং সকল সৃষ্টিকেই দিক নির্দেশনা দেবে, যেন তারা আবার পাপের পথে না গিয়ে একমাত্র ঈশ্বরের গৌরবের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করতে পারে।

নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষ থাকবে তা-ই নয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড সহ সব কিছুই নতুন হয়ে উঠবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:১ পদ দ্রষ্টব্য)। সমস্ত সৃষ্টি সময়ের মাত্রা থেকে মুক্ত হবে এবং ঠিক যেভাবে আদম তার পতনের আগে জীবন উপভোগ করেছিলেন সেভাবে তারাও অনন্তকালীন জগতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করবে (প্রকাশিত বাক্য ২২:১-৫ পদ দ্রষ্টব্য)। শুধু যে আমরা নিজেরা ঈশ্বরের গৌরব করতে এই নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে বাস করব তা-ই নয়, আমরা ঈশ্বরের অংশীদার (আদিপুস্তক ১:২৮ পদ দ্রষ্টব্য) হয়ে তাঁর সৃষ্ট সব কিছুর উপরে রাজত্ব করব এবং ঈশ্বরের গৌরব করতে তাদের পরিচালনা দেব। এই সত্য অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। যারা এই বিশ্বাসে জীবন-যাপন করেন এবং ভবিষ্যতে এই বিশেষ কাজ পরিচালনা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, তারা এমন খ্রীষ্টিয়ান– যারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে। পরবর্তীতে তারাই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে অসীম ভালবাসা লাভ করবে।

এই পর্যায়ে আমরা মানুষের বারোটি গুণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আমরা যখন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝি, তখন আমাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ এবং পৃথিবীর মানুষ-কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী ঈশ্বর-কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তিত হয়। মানুষ-কেন্দ্রীক চিন্তা-ভাবনা আমাদেরকে মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে, যা ঈশ্বরকে খুশী করতে পারে না বরং আমরা ঈশ্বরের শত্রুতে পরিণত হই (রোমীয় ৮:৬-৮ পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের মানদন্ডে জীবন-যাপন করি, শুধুমাত্র তখনই তিনি আমাদের তাঁর কাজে ব্যবহার করেন।

এই রকম খ্রীষ্টিয়ানদের পাঁচটি গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকে:

১) এই রকম খ্রীষ্টিয়ান অতি সাধারণ জীবন-যাপন করে থাকেন (হিতোপদেশ ৩:১৭; যিশাইয় ২৬:৩; ফিলিপীয় ৪:৭ ও ৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

২) এই রকম খ্রীষ্টিয়ানের জীবনের লক্ষ্য স্থির থাকে (ইফিষীয় ৫:১; ৬:১৯; ফিলিপীয় ৩:১৩-১৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

৩) এই রকম খ্রীষ্টিয়ানের জীবনের একটা অর্থ থাকে (ফিলিপীয় ১:২২-২:১১; ৩:৭-৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

৪) এই রকম খ্রীষ্টিয়ানের উদ্দীপিত জীবন থাকে (১ করিন্থীয় ১০:৩১ পদ দ্রষ্টব্য)।

৫) এই রকম খ্রীষ্টিয়ানের অনন্তকালীন জগতের যাবার প্রস্তুতি থাকে (ফিলিপীয় ৩:২০; ইব্রীয় ১১:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা শুধু ঈশ্বরের পরিচয় ও মানুষের পরিচয় নিয়ে ধ্যান ও চিন্তা করে না। যদি তারা কেউ মাত্র দুটি ধাপে থাকে, তাহলেও তাদের জীবনে বিশ্বাস থাকে স্থির। এই রকম খ্রীষ্টিয়ানেরা পবিত্র, ধর্মীয় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এবং বিশ্বাসী, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিশ্বাসী লোকের অভাব। সেই জন্য যাকোব বলেছেন, "যে বিশ্বাসের সাথে কাজ যুক্ত নেই সেই বিশ্বাস মৃত" (যাকোব ২:১৭ পদ)। সুতরাং, আমরা যখন প্রতিদিন প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে ঈশ্বরের ও মানুষের পরিচয় আমাদের হৃদয়ের গভীরে ধ্যান করব, আমরা অবশ্যই তৃতীয় ধাপে উত্তীর্ণ হতে পারব। আর তখন বুঝতে পারব যে, আমরা প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করছি।

গ) তৃতীয় ধাপঃ
মহান নিয়োগ ও মহান আদেশের বাধ্য হওয়া

সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করার তৃতীয় ধাপ হচ্ছে– মহান আদেশ ও মহান নিয়োগের বাধ্য থাকা। প্রথম দুটি ধাপের ভিত্তিতে এই ধাপ সংযোজন করা হয়েছে, যা আমাদের সক্রিয় বা কার্যকর খ্রীষ্টিয়ান থাকতে সাহায্য করবে। যদি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা অতি সাধারণ জীবন-যাপন করি, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও মানে সঠিক থাকে, তবে আমরা খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে অনন্তকালীন স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রস্তুত হই; আর তখন পবিত্র আত্মা এই তৃতীয় ধাপে আমাদের পরিচালিত করে এবং তা পালনে সাহায্য করে।

১) মহান আদেশ

মোশির মধ্য দিয়ে যে দশটি আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাকে আমরা সবচেয়ে দরকারী আদেশ বা মহান আদেশ বলি। অন্যভাবে, দশটি আজ্ঞার প্রথম চারটিকে আমরা বলি 'উপর-নীচ আদেশ' (যাত্রাপুস্তক ২০:১-১১; মথি ২২:৩৭-৩৮ পদ দ্রষ্টব্য) এবং পরবর্তী ছয়টিকে আমরা বলি, 'সমান্তরাল আদেশ' (যাত্রাপুস্তক ২০:১২-১৭; মথি ২২:৩৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

<table>
<tr><th>মহান আদেশ</th><th colspan="2">পুরাতন নিয়ম</th><th>নতুন নিয়ম</th></tr>
<tr><td rowspan="4">উপর-নীচ আদেশ</td><td>০১</td><td>আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না (যাত্রাপুস্তক ২০:৩ পদ)</td><td rowspan="4">সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারী আদেশ হল, 'তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে' (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫; মথি ২২:৩৭-৩৮; মার্ক ১২:৩০; লূক ১০:২৭ পদ)</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরী করবে না (যাত্রাপুস্তক ২০:৪ পদ)</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম নেবে না (যাত্রাপুস্তক ২০:৭ পদ)</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>বিশ্রামবার আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখবে এবং তা পালন করবে (যাত্রাপুস্তক ২০:৮ পদ)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">সমান্তরাল আদেশ</td><td>০৫</td><td>তোমাদের মা-বাবাকে সম্মান করে চলবে (যাত্রাপুস্তক ২০:১২ পদ)</td><td rowspan="6">তারপরের দরকারী আদেশটা প্রথমটারই মত– 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে' (মথি ২২:৩৯ পদ)</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>খুন কোরো না (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩ পদ)</td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>ব্যভিচার কোরো না (যাত্রাপুস্তক ২০:১৪ পদ)</td></tr>
<tr><td>০৮</td><td>চুরি কোরো না (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫ পদ)</td></tr>
<tr><td>০৯</td><td>কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না (যাত্রাপুস্তক ২০:১৬ পদ)</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, দাস-দাসী, গরু-গাধা কিম্বা আর কিছুর উপর লোভ কোরো না (যাত্রাপুস্তক ২০:১৭ পদ)</td></tr>
</table>

তালিকা ৩-৪: উপর-নীচ ও সমান্তরাল আদেশ

(১) উপর-নীচ আদেশ

প্রথমত, উপর-নীচ আদেশ হচ্ছে ঈশ্বরকে ভালবাসা। ঈশ্বর আমাদের আদেশ দিয়েছেন, "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর (গ্রীক ভাষায়- কার্ডিয়া), সমস্ত প্রাণ (গ্রীক ভাষায়- সুকে), সমস্ত মন (গ্রীক ভাষায়- দিয়ানইয়া) এবং সমস্ত শক্তি (গ্রীক ভাষায়- ইসকুস) দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫; মথি ২২:৩৭-৩৮; মার্ক ১২:৩০; লূক ১০:২৭ পদ)। দশ আজ্ঞার প্রথম থেকে চার পর্যন্ত আজ্ঞা বা আদেশগুলোতে ঈশ্বর এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরকে ভালবাসা মানে অন্য কোন মূর্তির সেবা বা পূজা করা নয় (যাত্রাপুস্তক ২০:৩-৫ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যভাবে, এই আদেশ হচ্ছে– শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপাসনা করা, শুধুমাত্র তাঁর বিশ্বস্ত সন্তান হিসাবে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করা এবং অন্য কোন দেব-দেবতার সেবা, পূজা না করা।

মানুষ হয় ঈশ্বরের অথবা মূর্তির পূজা করবে। আত্মিক রাজ্যে দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে বলেই মানুষ ঈশ্বর ও দেব-দেবতার পূজা করে থাকে। কিন্তু তাই বলে ঈশ্বর ও দেব-দেবতা উভয়েরই পূজা করা যায় না। অন্যভাবে, যদি কেউ ঈশ্বরের চেয়ে অন্য কোন কিছুকে বেশী ভালবাসে, তাহলে ওটাই তার জন্য প্রতিমা। আর প্রতিমা পূজা করা মানেই, একজন ব্যক্তি তার জীবনে কোন বস্তু, টাকা-পয়সা, দর্শন বা মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়, নির্ভর করে ও ভালবাসে; এই সবই তার জন্য প্রতিমা। কারণ সে তো তার জীবনে ঈশ্বরকে স্থান না দিয়ে জগতের ঐসব বস্তুকে ভালবেসে গুরুত্ব দিয়েছে। যারা প্রতিমা পূজা করে তারা সেখান থেকেই আনন্দ পায় এবং সেখান থেকেই তার জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে থাকে।

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এই রকম অন্য যে কোন কিছুর প্রতিমা পূজা করাকে দারুণভাবে ঘৃণা করেন। কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে কোন সৃষ্ট বস্তুর সেবা ও পূজা করা তাঁকে ভীষণভাবে আঘাত করে। ঈশ্বর আমাদের অন্যান্য পাপের জন্য যত না বেশী তিরস্কার করেন, কিন্তু তিনি প্রতিমা পূজাকে কোনভাবেই সহ্য করেন না। তাই, তিনি যখন মোশির কাছে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তখন এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি সদাপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর। আমার পাওনা ভক্তি আমি চাই। যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের পাপের শাস্তি আমি তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকি। কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে এবং আমার সব আদেশ পালন করে, হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত তাদের প্রতি আমার বুক ভরা দয়া থাকবে" (যাত্রাপুস্তক ২০:৫-৬ পদ)।

কোন বিদেশী লোকদের কাছে দশ আজ্ঞা দেওয়া হয় নি, কিন্তু সরাসরি ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলীয়দের কাছে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই আদেশগুলো বিদেশীদের জন্য প্রযোজ্য নয়, তাই তারা এইসব আদেশ পালন করবে কি না তাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে ইস্রায়েলীয়দের জন্য দশ আজ্ঞা পালন করা ঈশ্বরের দেওয়া কঠিন আদেশ। বাস্তবিক দশ আজ্ঞা পালন করা তাদের জন্য সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। তবুও পুরাতন নিয়ম পড়তে পড়তে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের মনোনীত সন্তান ইস্রায়েলীয়েরা দশ আজ্ঞা লংঘন করে প্রতিমা পূজায় আসক্ত হয়ে পাপে লিপ্ত হয়েছে।

মূলত, ইস্রায়েল জাতি একই সময়ে ঈশ্বরের উপাসনা করেছে এবং বাবিলীয় ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবতার উপাসনাও করেছে। তারা সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের, অম্মোনীয়দের জঘন্য দেবতা মিল্‌কম ও মোলকের এবং মোয়াবীয়দের জঘন্য দেবতা কমোশ ও অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা করেছে (১ রাজাবলি ১১:৪-৮ পদ দ্রষ্টব্য)। আবার, নতুন নিয়মের সময়ে অনেক খ্রীষ্টিয়ান না জেনে বুঝেই বাবিলীয় ধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু, লোক ধর্ম ইত্যাদি থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। তারা এই সব বিভিন্ন ধর্ম থেকে ভাগ্য গণনা প্রক্রিয়া, পূর্ব পুরুষদের পূজা করা, শুনে শুনে প্রার্থনা করা, নতুন যুগের আন্দোলনের কার্যকলাপ ইত্যাদি অনেক কিছুই তাদের বিশ্বাসে যুক্ত করেছে।

এটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, যখন কেউ অদৃশ্য দেব-দেবতার উপাসনা করে পাপ করে। প্রেরিত্ পৌল লোভকে প্রতিমা পূজার সাথে তুলনা করেছেন (ইফিষীয় ৫:৫; কলসীয় ৩:৫ পদ দ্রষ্টব্য)। অর্থ, সম্মান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সার্থকতা, পড়াশোনার কৃতিত্ব ইত্যাদি সব কিছুর লোভ প্রতিমা পূজা সমতুল্য। খ্রীষ্টিয়ানেরা যখন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ঐ সবের উপাসনা করে, তখন তারা প্রতিমা পূজা সমতুল্য পাপ করছে।

তাছাড়া, আজকের দিনে মন্ডলীসমূহ ক্রমশ প্রতিমায় আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। একটা মন্ডলী যখন ধনী সদস্য গ্রহণ করে, তখন মন্ডলীর গীর্জাঘর বিরাটকায় হয়। এভাবে খ্রীষ্টিয়ান সমাজ ক্রমশ নিরপেক্ষ হয়ে যায়। মন্ডলীর সদস্যরা তাদের ঈশ্বরের চেয়ে মন্ডলীকে বেশী ভালবাসতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান এ্যাংলিকান ঈশতত্ত্ববিদ রেভা: জন স্টট বলেছেন, "আজকে খ্রীষ্টিয়ানেরা শুধু অর্থ, সম্মান, ক্ষমতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উন্নতি, পড়াশোনায় কৃতিত্ব ইত্যাদির পূজা

করছে তা-ই নয়, তারা তাদের স্থানীয় মন্ডলী, ডিনোমিনেশন, মতবাদ এবং উপাসনার ধরন যীশুর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা বিশ্বাসের নামে ঐ সবই প্রতিমায় রূপান্তরিত করছে (The Message of Acts, Downers Grove: IVP, 1994. IL, p. 291).

একটা মন্ডলী যখন ঈশ্বরের চেয়ে তাদের গীর্জাঘর, তাদের ডিনোমিনেশন, পৌরহিত্যকে বেশী গুরুত্ব দেয়; ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা তাদেরই সবচেয়ে বেশী। সত্যি করেই বিগত ২০০০ বছরের মন্ডলীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, অনেক মন্ডলী তাদের সদস্য বৃদ্ধি করেছে এবং বড় বড় গীর্জাঘর তৈরী করেছে; প্রচুর সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মান অর্জন করেছে, এমন মন্ডলীগুলোর অস্তিত্ব এখন আর নেই। অথবা, গীর্জাঘরগুলো পর্যটকদের আকর্ষণ করতে শূন্য পড়ে আছে মাত্র। এর একমাত্র কারণ, তারা প্রতিমা পূজা করেছে।

ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সন্তানদের বলেছেন যেন তারা তাদের সমস্ত মন, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে শুধুমাত্র তাঁকে ভালবাসে। তার মানে কি? তার মানে এই পৃথিবীর পরিবর্তনশীল সাময়িক কোন কিছুই (প্রতিমা সদৃশ) ঈশ্বরের উপরে স্থান দেওয়া যাবে না। পাহাড়ের উপরে দেওয়া উপদেশে যীশু আদেশ দিয়েছেন এবং প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, "কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও। তাহলে ঐ সব জিনিষও তোমরা পাবে (মথি ৬:৩৩ পদ)। এই পৃথিবীতে যারা যীশুর এই কথার উপরে নির্ভর করে চলে এবং ঈশ্বরের দেওয়া সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মহান আদেশ (উপর-নীচ আদেশ) পালন করে, তারাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করছে।

(২) সমান্তরাল আদেশ

দ্বিতীয়ত, 'সমান্তরাল আদেশ' হচ্ছে ঈশ্বরের সন্তানদের একে অন্যের প্রতি ভালবাসা। মথি ২২ অধ্যায়ে যীশু বলেছেন, 'উপর-নীচ আদেশ' হচ্ছে সর্বোত্তম (গ্রীক ভাষায়- মেগাস) আদেশ এবং সর্ব প্রথম (গ্রীক ভাষায়- প্রটোস) আদেশ (মথি ২২:৩৭-৩৮ পদ দ্রষ্টব্য)। তারপরেই তিনি বলেছেন, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে" (মথি ২২:৩৯ পদ)। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় (গ্রীক ভাষায় ডিউট্রস) আদেশ (সমান্তরাল আদেশ)। এখানে প্রতিবেশী মানে, ঈশ্বরের সন্তানদের বুঝায় যারা আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এই আদেশ ইস্রায়েল জাতির মনোনীত সন্তানদের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তার মানে এই নয় যে, আমাদের আশেপাশে থাকা বিদেশীদের ভালবাসা উচিত। এই আদেশে মূলত ঈশ্বরের সন্তানদের একে অন্যের প্রতি ভালবাসার কথা বলা হয়েছে।

নতুন নিয়মে উপর-নীচ আদেশকে 'নতুন আদেশ' (গ্রীক ভাষায় এন্টোলেন কাইনেন) বলে উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "একটা নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি– তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালবেসো। যদি তোমরা একে অন্যকে ভালবাস তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩:৩৪-৩৫ পদ)। যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হবার কিছু আগে শিষ্যদের কাছে তিনি এই কথা বলেছিলেন। এই সময়টা ছিল শিষ্যদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মাত্র অল্প কিছুদিন পরই তাদেরকে একে অন্যকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে এবং একতাবদ্ধ হয়ে 'মহান নিয়োগ' পালন করতে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু পুরোপুরিভাবে 'সমান্তরাল আদেশ' পালন করতে হলে একজনকে অবশ্যই 'উপর-নীচ আদেশ' পালন করতে হবে। অন্যভাবে, 'উপর-নীচ আদেশ' হচ্ছে- প্রথম ও সর্বোত্তম এবং 'সমান্তরাল আদেশ' হচ্ছে- দ্বিতীয়। সমান্তরাল আদেশকে সর্বোত্তম (গ্রীক ভাষায় মেগাস বা মহান) বলা হয় নি। যে খ্রীষ্টিয়ানেরা উপর-নীচ আদেশ পালন করেন, তাদের সমান্তরাল সম্পর্ক পালনের ক্ষমতায় উদ্বুদ্ধ করা হবে। সুতরাং যে খ্রীষ্টিয়ানেরা বুদ্ধিমান, তারা অবশ্যই উপর-নীচ সম্পর্ক পালনে মনোযোগ দেবে। এই সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা পাথরের উপরে নিজেদের ঘর নির্মাণ করে (মথি ৭:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

যদি এই প্রক্রিয়ার উল্টোটা হয়, তাহলে খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে মন্দ ফল দেখা যায়। সাধারণত তখনই এমনটা হয়, যখন খ্রীষ্টিয়ানেরা সমান্তরাল আদেশকে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নেয় এবং উপর-নীচ আদেশের চেয়ে তা অগ্রগণ্য মনে করে।

এমন অনেকে আছেন যারা মানুষের কাছ থেকে গৌরব পাবার জন্য লোক দেখানো সমান্তরাল আদেশ পালন করছে বলে দেখিয়ে থাকে। আবার, যখন পরিচর্যা ক্ষেত্র প্রতিবেশীদের ভালবাসা দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়, যেমন– খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা কোন কল্যাণমূলক কাজ, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, এতিম খানা, স্কুল ইত্যাদি পরিচালিত হয়; তারা প্রথমত উপর-নীচ আদেশ অগ্রগণ্য মনে করে পালন করে না। তাই, তারা তাদের কাজের শেষে মন্দ ফল দেখতে পায়। যদিও তারা তাদের পরিচর্যা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিশ্রম করে, কিন্তু তাতে ঈশ্বরের অনুমোদন থাকে

না এবং তাদের এই পরিচর্যা ক্ষেত্র শুধুমাত্র মানবিক উন্নয়নের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এভাবে তারা নিজেরা তাদের ভাল কাজের জন্য গৌরব ও সম্মান গ্রহণ করেন। এ ধরনের পরিচর্যা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিপরীতে পরিচালিত হয়।

সুতরাং, আদেশ ও নিয়মানুসারে, সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে দরকারী আদেশ (মহান আদেশ) এবং মহান নিয়োগ উভয়ই পালন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র বাইবেল নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে প্রথমে মহান আদেশ পালন করতে শিক্ষা দেয় এবং পরের ধাপে মহান নিয়োগ পালন করতে বলে। মহান নিয়োগ হচ্ছে যীশুর আদেশ মতই সমস্ত জাতির কাছে তাঁর এই প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া। অনেক মিশনারি এই কাজে খুবই দুর্বল। যদি কোন মিশনারি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই প্রক্রিয়া পালন না করে, তাহলে তার পরিচর্যা ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। যদি তিনি মহান আদেশের চেয়ে আরও বেশী উৎসাহ নিয়ে সার্থকতার সুসমাচার প্রচার, সুখী হবার মতবাদ, ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা, রোগ হতে আরোগ্য করা, পরামর্শদান অথবা মন্ডলী বৃদ্ধির চিন্তা করে, তবে তার পক্ষে সত্যিকার আত্মিক ফল ধারণ করা সম্ভব হবে না।

২) মহান নিয়োগ

সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য যীশু যে আদেশ দিয়েছেন, তা-ই হচ্ছে মহান নিয়োগ (মথি ২৮:১৯-২০; প্রেরিত্ ১:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে সুস্পষ্টভাবে মহান নিয়োগের নিয়ম ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। এখন আমরা যীশুর বলা মহান নিয়োগের কথাগুলো পর্যালোচনা করব।

(১) সমস্ত জাতির কাছে

আমরা কিভাবে মহান আদেশ পালন করতে পারি? যীশু এর ধাপগুলো সম্পর্কে এক এক করে বলেছেন, যেমন– "এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও" (মথি ২৮:১৯ পদ)। এই পদের কাঠামো এভাবে উল্লেখ করা যায়:

এই পদের কেন্দ্রীয় অংশ হচ্ছে কর্তাপদ "তোমরা" ও কর্মপদ হচ্ছে "সমস্ত জাতি" এবং ক্রিয়া পদ হচ্ছে "শিষ্য কর"। এখানে মুখ্য ক্রিয়াপদ "শিষ্য কর" আদেশ হিসাবে বলা হয়েছে। এটা কোন ঐচ্ছিক আদেশ নয় যে আমরা তা পালন করতে পারি বা নাও করতে পারি। এটা বাধ্যতামূলক আদেশ, যা আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। এখানে, কর্মপদ "সমস্ত জাতি" বলতে, যাদের শিষ্য করতে হবে তাদের অযিহূদী বা অন্য সব জাতি বুঝায়। গ্রীক ভাষায় "জাতি" শব্দটা বুঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। প্রথমটা হচ্ছে "লাওয়ি", যার মানে যিহূদী জাতি এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে "এথনি", যার মানে হচ্ছে অযিহূদী বা অন্য সব জাতি। মহান নিয়োগে গ্রীক শব্দ "এথনি" ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ অন্য সব জাতিদের কাছে যাবার কথা বলা হয়েছে।

কর্তাবোধক শব্দ "তোমরা" বলতে যীশুর শিষ্যদের বুঝানো হয়েছে। তারা সেই সময় যিহূদী ছিলেন। যীশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিয়েছেন যেন তারাও অযিহূদী বা অন্য সব জাতির কাছে গিয়ে শিষ্য তৈরী করেন। তিনি ইস্রায়েল জাতির (যিহূদী) কাছে, অর্থাৎ তাদের নিজেদের জাতির কাছে যেতে বলেন নি। এই হিসাবে মহান নিয়োগ যিহূদীদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ প্রচার কাজ নয়, কারণ তারা নিজেদের খুবই গোঁড়া ও শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যীশুর শিষ্যেরা তাঁর আদেশ পালন করেছিলেন।

এই পৃথিবী কিভাবে শেষ হবে, তার চিহ্ন সম্বন্ধে যীশু বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। "সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য স্বর্গ-রাজ্যের সুখবর সারা জগতে প্রচার করা হবে এবং তার পরেই শেষ সময় উপস্থিত হবে" (মথি ২৪:১৪ পদ)। এখানে সমস্ত জাতি বলতে গ্রীক শব্দ "পানটা টা এথনি" বুঝায়, যা মূলত অন্য সব জাতিদের বুঝানো হয়েছে। যীশুর দেওয়া মহান নিয়োগ হচ্ছে সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার (সুখবর) প্রচার করা এবং শিষ্য করার জন্য নির্দিষ্ট আদেশ (প্রেরিত্ ১৩:৪৭ পদ দ্রষ্টব্য)। যখন যীশুর শিষ্যেরা তাঁর এই আদেশ পালন করবে, তখন সমস্ত জাতির মধ্য থেকে পূর্ব নির্ধারিত ঈশ্বরের সন্তানদের সংখ্যা পূর্ণ হবে এবং যীশু আবার ফিরে আসবেন (মথি ২৪:৩০-৩১ পদ দ্রষ্টব্য)।

(২) কিভাবে শিষ্য করতে হবে

মথি ২৮:১৯-২০ পদের মধ্যে যীশু শিষ্য হবার চারটি ধাপের কথা তুলে ধরেছেন। প্রথম ধাপটি হচ্ছে, 'যাওয়া' (ক্রিয়ার গুণযুক্ত পদ), দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে, 'বাপ্তিস্ম দেওয়া' (এটাও ক্রিয়ার গুণযুক্ত পদ), তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে, 'শিক্ষা দেওয়া' (ক্রিয়ার গুণযুক্ত পদ) এবং চতুর্থ ধাপটি হচ্ছে, 'পালন করা' (অসমাপিকা ক্রিয়া পদ)। অন্যান্য জাতির লোকদের শিষ্য করতে হলে যীশুর বলা এই ধাপগুলো আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

১) **যাওয়া**

শিষ্য করতে হলে প্রথমত আমাদের সেই সব স্থানে যেতে হবে, যেখানে অন্য অন্য জাতির লোকেরা আছে। প্রেরিত্ ১:৮ পদে যীশু বলেছেন, "... ... ... আর যিরূশালেম, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।" যীশু কখন এই কথা বলেছেন, "যিরূশালেম, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে"। এখানে 'এবং' শব্দের মূল গ্রীক শব্দ হচ্ছে 'কাই', যার মানে যুগপৎ ঘটনার সংযোজন বুঝায়। যীশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিয়েছেন, তারা যখন সুসমাচার গ্রহণ করবে তখন থেকেই তারা শমরীয়দের কাছে এবং অন্যান্য জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করবে। এভাবেই তারা একই সাথে আরও ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার কাজ শেষ করবে।

খ্রীষ্টিয়ানদের যত শীঘ্র সম্ভব নিজের দেশের লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার কাজ শেষ করে অবশ্যই অন্যান্য দেশের জাতি-গোষ্ঠীর কাছে যেতে হবে। তার মানে, আমরা অবশ্যই আমাদের দেশে থাকা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর কাছে যাব এবং সেই সাথে দেশের বাইরে গিয়েও সরাসরি অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর কাছেও সুসমাচার প্রচার করব। আমরা মথি ২৮:১৯-২০ এবং প্রেরিত্ ১:৮ এই মহান নিয়োগের পদ দুটি এক সাথে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারব যে, শিষ্য তৈরী করতে হলে আমাদের অবশ্যই অন্যান্য জাতির কাছে তথা পরজাতীয়দের কাছে সুসমাচার প্রচারকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটাই শিষ্যদের কাছে দেওয়া ঈশ্বরের আদেশ। কিন্তু তারপরেও খুব কম সংখ্যক শিষ্যেরা এই কাজ করতে পারবে এবং তারা অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশেষ মনোনীত।

একজন অবশ্য প্রশ্ন করতে পারেন, 'তাহলে আমার নিজের জাতির লোকদের কি হবে? এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্ক রেখে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করি। তাঁর প্রতিজ্ঞা এই– যখন সংখ্যালঘু মনোনীত শিষ্যেরা বিশ্বস্তভাবে তাদের জাতি-গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে মহান নিয়োগ কার্যকর করবে, তখন সুসমাচার প্রচার কাজ সেখানে সার্থক হয়ে উঠবে (রোমীয় ১১:২৫-২৬ পদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, আজকের দিনে যীশুর শিষ্য হিসাবে আমাদের অবশ্যই সুসমাচার প্রচার করা হয় নি এমন দল ও গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হবে এবং আমাদের সময়, টাকা-পয়সা, গুণ-যোগ্যতা এবং আমাদের সকল সম্পদ কাজে লাগাতে হবে। এই কাজ অবশ্যই বাধ্যতামূলক– কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়।

২) **বাপ্তিস্ম দেওয়া**

শিষ্যেরা যখন প্রথমবারের মত অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর কাছে যাবে ও তাদের শিষ্য করবে তখন তাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে বাপ্তিস্ম দেওয়া। এটাই হচ্ছে মহান নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপ।

মহান নিয়োগের প্রক্রিয়ায় বাপ্তিস্ম কোন জল ছিটানো বা জলে ডুব দেওয়া নয়। এর মানে হচ্ছে, আমরা এমনভাবে সুসমাচার প্রচার করব যেন তারা যীশুকে প্রভু ও উদ্ধারকর্তা হিসাবে অন্তরে গ্রহণ করে এবং যেন তারা পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে যীশুর আত্মার সাথে যুক্ত হয়। এটাই হচ্ছে আত্মিকভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করা, যাকে আমরা আত্মিক শিশু বলতে পারি (গ্রীক ভাষায়, নেপিয়স)। এই পুরো প্রক্রিয়াকে আমরা সুসমাচার প্রচার এবং মিশন কাজ বলে থাকি।

৩) **শিক্ষা দেওয়া**

সুসমাচার প্রচার করে বিশ্বাসী করে তোলার পর তাদেরকে কেবলমাত্র আত্মিকভাবে শিশু রাখলেই চলবে না। ঠিক যেমন একজন বাচ্চা শিশু বড় হয়ে পূর্ণ বয়স্ক হয়, তেমনি করে একজন আত্মিক শিশুকেও আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে সুযোগ দিতে হবে। আর সেই জন্য আমরা তাদেরকে অবশ্যই আত্মিক খাবার খাওয়াব। মহান নিয়োগে এটাই হচ্ছে তৃতীয় ধাপ, যাকে আমরা বলি 'শিক্ষা দেওয়া'। ঈশ্বরের বাক্যই হচ্ছে আত্মিক খাবার (গীতসংহিতা ১১৯:১০৩; যিরমিয় ১৫:১৬; যিহিষ্কেল ২:৮-৯, ৩:৩; যোহন ৬:৩২-৫৯ পদ দ্রষ্টব্য)। একজন তখনই আত্মিকভাবে বেড়ে ওঠে যখন সে পড়তে শুরু করে, শুনতে অভ্যস্ত হয়, লিখতেও অভ্যস্ত হয়, বুঝতে শুরু করে, মুখস্থ করে, ধ্যান করে এবং তার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করে।

এখানে উল্লেখিত তালিকা ৩-৫ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র বাইবেল ছয়টি মাত্রায় আত্মিক বৃদ্ধির কথা বলেছে। 'শিক্ষা দেওয়া' বলতে যীশু আত্মিকভাবে পুষ্টি প্রদান করার কথা বুঝিয়েছেন। এই কথাটা আবার 'শিষ্য তৈরী' করাও বুঝায়। তার মানে, আত্মিক খাবার দিয়ে একটা আত্মিক বাচ্চা শিশুকে ক্রমশ পুত্রত্বের ধাপে এবং পরবর্তীতে পিতৃত্বের ধাপে পৌঁছে দিতে হবে। সেই কারণে, যদি কোন শিক্ষা আত্মিক বৃদ্ধি দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেটাকে আমরা প্রকৃত শিষ্য তৈরীর প্রশিক্ষণ বলতে পারি না।

ধাপ	নাম	গ্রীক শব্দ	বাইবেলের উদ্ধৃতি
১	আত্মিক দুধের বাচ্চা	নেপিয়াস	১ করিন্থীয় ৩:১; ১৩:১১; ১৪:২০; গালাতীয় ৪:১; ইব্রীয় ৫:১৩
২	আত্মিক শিশু কাল	পেয়ডিয়ন	মথি ১৮:২; লূক ১:৮০; ১ পিতর ২:২
৩	আত্মিক কৈশোর কাল	টেকনন	যোহন ১:১২; ১৩:৩৩
৪	আত্মিক যৌবন কাল	নেয়াভিসকস	প্রেরিত্ ২:১৭; ১ যোহন ২:১৩-১৪
৫	আত্মিক পুত্রত্বের কাল	হুইয়স	মথি ৫:৯ , ৪৫; রোমীয় ৮:১৪-১৫
৬	আত্মিক পিতৃত্বের কাল	পাটের	১ করিন্থীয় ৪:১৫

তালিকা ৩-৫: আত্মিক বৃদ্ধির ছয়টি ধাপ

৪) পালন করা

যীশু যখন মহান এই নিয়োগ তাঁর শিষ্যদের দিয়েছিলেন তখন তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, আত্মিক দুধের বাচ্চাদের কেন শিক্ষা দিতে হবে। যীশু শিষ্যদের যে আদেশ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই তাদেরকেও যীশুর আদেশ মত সবকিছু অন্যদের শিক্ষা দিতে হবে। তিনি তাঁর শিষ্যদের কি আদেশ দিয়েছিলেন? তিনি তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। অন্যভাবে, প্রথম স্তরে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানকে অবশ্যই ঈশ্বরকে বুঝতে হবে, তাঁকে স্বীকার করতে হবে, তাঁর পরিচয় ধ্যান করতে হবে এবং তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করে জীবন কাটাতে হবে। দ্বিতীয় স্তরে, আমাদের অবশ্যই নিজেদের পরিচয় জানতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে এবং তা ধ্যান করতে হবে। তৃতীয় স্তরে, আমাদের অবশ্যই মহান আদেশ ও মহান নিয়োগ পালন করে জীবন-যাপন করতে হবে। যিনি শিষ্য তৈরী করবেন, তিনি অবশ্যই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে চলবার এই তিনটি স্তর তার আত্মিক শিশুদের শিক্ষা দেবেন।

এই তিনটি স্তর পূর্ণভাবে পালন বা অনুসরণ করা সম্ভব, যখন একজন আত্মিক পুত্রত্বের অথবা আত্মিক পিতৃত্বের স্তরে পৌঁছাবে। সুতরাং, যীশুর মহান নিয়োগ হচ্ছে, তাঁরই পূর্ব-নির্দিষ্ট অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর (এথনি) লোকদের কাছে যাওয়া এবং সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে পরিত্রাণ বা উদ্ধার করে তাদের ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার নিশ্চিত করা। অতঃপর, তাদের আত্মিক দুধের বাচ্চা থেকে আত্মিক পুত্রত্বের অথবা আত্মিক পিতৃত্বের স্তরে নিয়ে যাওয়া। অন্যভাবে, তার মানে হচ্ছে, খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য তৈরী করা।

এই শিষ্যেরা যীশুর মহান নিয়োগ একইভাবে পালন করতে তাদের প্রতিবেশী দেশেও যেতে পারে এবং আরও অনেক আত্মিক নাতি-পুতি জন্ম দিতে পারবে। এভাবে শিষ্যেরা সব জাতির কাছে সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে দিতে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে পারবে, সব জাতি সুসমাচার জানতে পারবে এবং তারপরই পৃথিবীর অন্তিম সময় এসে যাবে (মথি ২৪:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, তিনি তাদের সাথে পৃথিবীর অন্তিম সময় পর্যন্ত থাকবেন (মথি ২৮:২০ পদ দ্রষ্টব্য)। যারা মহান নিয়োগ পালন করে, তারাই প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে। ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করার জন্য তারাই সত্যিকার জ্ঞানী ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান।

৩) যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যেকার সম্পর্ক

আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে উল্লেখিত ঈশ্বরের মহা-উদ্ধার-পরিকল্পনা ঘোষণার ফলশ্রুতিতে পুত্র ঈশ্বর যীশু মানব দেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসলেন এবং তাঁর রক্ত ঝরালেন। তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন ও তিন দিনের দিন মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়ে উঠলেন। তারপর, তিনি ৪০ দিন শিষ্যদের সাথে থাকলেন এবং তাঁর স্বর্গে উঠে যাবার আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের এক মহান নিয়োগ দিলেন (মথি ২৮:১৯-২০; প্রেরিত্ ১:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। 'স্ত্রীলোকের মধ্যে দিয়ে আসা

বংশ' যীশু আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে বলা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার লক্ষ্যে ক্রুশীয় মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধে বিজয়ী হলেন। অতঃপর, স্বর্গে যাবার আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁর পক্ষে 'শস্য কাটার' কাজে নিয়োগ দিলেন (যোহন ৪:৩৫-৩৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

মূলত, এই মহান নিয়োগ অযিহূদী সকল জাতির জন্য পরিত্রাণ বা উদ্ধারের লক্ষ্যে দেওয়া হয়েছে। পুরাতন নিয়মে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, যীশু অযিহূদীদের জন্য আলো হিসাবে আসবেন (যিশাইয় ৪২:৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং তিনি এসে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছিলেন (মথি ৪:১৫-১৬; লূক ২:৩২ পদ দ্রষ্টব্য)। পুরাতন নিয়মে অব্রাহামের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর অযিহূদীদের উদ্ধার পরিকল্পনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অব্রাহামের সাথে ঈশ্বর এক চুক্তির মাধ্যমে (আদিপুস্তক ১২:২-৩; ২২:১৭-১৮ পদ দ্রষ্টব্য) প্রকাশ করেছিলেন যে, অব্রাহামের বংশের যীশুর (গালাতীয় ৩:১৬ পদ দ্রষ্টব্য) মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি-গোষ্ঠী (গ্রীক ভাষায় 'গো-ইম' মানে সকল অযিহূদী বা পরজাতীয়রা) পরিত্রাণ বা উদ্ধার পাবে। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, শুধুমাত্র ইস্রায়েল জাতি নয়, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন সকলেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের গৌরব করে (যিশাইয় ৬৬:১৮-১৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

পুরাতন নিয়মের সময়কাল থেকেই সমস্ত জাতির পরিত্রাণ বা উদ্ধারের এই মহা-উদ্ধার-পরিকল্পনার নাটকে (অযিহূদী ও পৃথিবীর সব লোকদের মধ্যে) ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের প্রধান ভূমিকায় মনোনীত করেছিলেন। যদিও ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর বিশেষ সুযোগ প্রদান করেছিলেন, তবু তারা তা ভুলে গিয়ে ঈশ্বরের সবচেয়ে ঘৃণার্হ প্রতিমা পূজা করে যাচ্ছিল। তাই, ঈশ্বর তাদের চোখ অন্ধ করে রেখেছিলেন যেন তারা যিহোবা ঈশ্বর যীশুকে দেখেও চিনতে না পারে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:২০; যিশাইয় ৬:৯-১০ পদ দ্রষ্টব্য)।

ঈশ্বর বলেছিলেন, "আমি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব, শেষে তাদের দশা কি হয় তা দেখব; কারণ এরা উল্টা পথে চলা জাতি, অবিশ্বস্ত সন্তান। ঈশ্বর নয় এমন দেবতার পূজা করে তারা আমার পাওনা ভক্তির আগ্রহে আগুন লাগিয়েছে; অসার প্রতিমার পূজা করে তারা আমার ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছে। জাতিই নয় এমন জাতির হাতে ফেলে আমিও তাদের অন্তরে আগুন জ্বালাব; একটা অবুঝ জাতির হাতে ফেলে তাদের ক্রোধ জাগাব" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:২০-২১ পদ)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। যখন ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন অধিকাংশ ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক তাঁকে গ্রহণ করেছিল। অধিকাংশই বুঝতে পারে নি যে, যীশু নিজেই ঈশ্বর, যিহোবা, মশীহ্ এবং উদ্ধার বা পরিত্রাণ দেবার মালিক। তাই, যীশু যখন বলেছিলেন তিনি পুরাতন নিয়মের যিহোবা ঈশ্বর, তখন ইস্রায়েল জাতির নেতারা তাঁকে ঈশ্বর নিন্দুক বলে দোষী করেছিল (মথি ২৬:৬৫ পদ দ্রষ্টব্য) এবং মোশির আইন-কানুন (লেবীয় ২৪:১৬ পদ দ্রষ্টব্য) মোতাবেক মৃত্যুর শাস্তি দিয়েছিল (মথি ২৭:৫০ পদ দ্রষ্টব্য)।

পরবর্তীতে দেখা যায় যে, মাত্র অল্প সংখ্যক যিহূদী বাদে অধিকাংশ যিহূদীদের চোখে ঠুলি লাগানো ছিল। পুনরুত্থানের পর যীশু তাঁর সুসমাচারের আলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অযিহূদীদের দেখিয়েছিল। অযিহূদীরাই প্রথমে ক্রুশের উপরে প্রকাশিত ঈশ্বরের ভালবাসা ও অনুগ্রহ লাভ করেছিল যেন তারাই ঈশ্বরের গৌরব করে (লূক ১৭:১৮; রোমীয় ১৫:৮-১২; কলসীয় ১:২৭ পদ দ্রষ্টব্য)। পুরাতন নিয়মে বলা ভাববাণী অনুসারে এই আলো অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য অযিহূদীদের কাছে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময় আসলে পর যিহূদীদের চোখ খুলে যাবে। যেহেতু, যীশুর দ্বিতীয় আগমন কাছে এসে গেছে এবং পূর্বনির্দিষ্ট অযিহূদীরা প্রায়ই পরিত্রাণ বা উদ্ধার পেয়ে গেছে; সেহেতু এও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, পরিত্রাণ বা উদ্ধারের আলো যিহূদীদের কাছে প্রকাশিত হবে (রোমীয় ১১:২৫; প্রকাশিত বাক্য ৭:১-৯ পদ দ্রষ্টব্য)। ভাববাণী অনুসারে এখন বেশ কিছু যিহূদী যীশুকে মশীহ বা উদ্ধারকর্তা এবং ঈশ্বর বলে গ্রহণ করছে। তাদের বলা হয় মশীহে বিশ্বাসী যিহূদী। এই যিহূদীদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখে আমরা এও বলতে পারি যে, যীশুর দ্বিতীয় আগমন খুব কাছে এসে গেছে (যিহিষ্কেল ৩৭:৪-৬; মথি ২৩:৩৯; প্রকাশিত বাক্য ৭:১-৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

এভাবেই, অযিহূদীদের কাছে এবং ইস্রায়েলের কাছে সুসমাচার প্রচার কাজের পরিকল্পনা একের পর এক ঘটে যাচ্ছে। সুসমাচার প্রচার কাজের শেষ সময় যখন কাছে এসে যাবে এবং ইস্রায়েলকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ (৭ বছরের মহা কষ্ট) শুরু হবে, তখন অনেক অযিহূদী দেশ প্রভু যীশুর নাম জানতে পারবে (যিহিষ্কেল ৩৮:১৬, ২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়াও, সকল যিহূদীদের চোখ খুলে যাবে এবং প্রভু যীশুকে মশীহ, উদ্ধারকর্তা এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা ও ঈশ্বরের পুত্র বলে চিনতে পারবে, তখন তারাও পরিত্রাণ বা উদ্ধার পাবে (যিহিষ্কেল ৩৯:২১-২৯; রোমীয় ১১:২৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

তাই, যে যিহূদীরা এবং অযিহূদীরা প্রভু যীশুর নাম সত্যিকারভাবে বুঝতে পারে, তারাই উদ্ধার পাবে এবং ঈশ্বরের গৌরব করবে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪৩; মথি ২৪:১৪; রোমীয় ১৫:১০-১১ পদ দ্রষ্টব্য)। ইস্রায়েলীয়েরা ঈশ্বরের মহা-উদ্ধার-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মনোনীত। যদিও তারা পুরাতন নিয়মের সময়ে ব্যাপকভাবে প্রতিমা পূজার দিকে ঝুঁকেছিল এবং এভাবেই চোখে ঠুলি পরেছিল ও প্রভু যীশুকে ঈশ্বর বলে চিনতে অসমর্থ হয়েছিল; তথাপিও অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর তাদের বাঁচিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি দয়া দেখিয়ে যাবেন (যিশাইয় ৬০:২১; যিরমিয় ১৪:২১; ৩৩:৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

এই উদ্দেশ্যে যীশু পৃথিবীতে অধিকাংশ অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেবার এসেছিলেন। পৃথিবীর জনসংখ্যার দিক থেকে যিহূদীরা খুব সামান্য অংশ। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হলে পর তারা যীশুকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করবে। সেই কারণে, আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা অবশ্যই অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেব। যীশুর দেওয়া মহান নিয়োগের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে হারানো আত্মাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া। সুসমাচার হচ্ছে এমনই এক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুনরুদ্ধার এবং যীশুকে প্রভু ও উদ্ধারকর্তা বলে গ্রহণ করতে সাহায্য করা সম্ভব হয়। অতঃপর, যারা যীশুকে প্রভু ও উদ্ধারকর্তা বলে গ্রহণ করবে তাদের সকলকে যীশুর দেওয়া 'মহান আদেশ' ও 'মহান নিয়োগ' পালন করতে শিক্ষা দেওয়া। এই পরিচর্যা কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাসের কার্যকারীতা প্রকাশ পায় এবং ঈশ্বরের গৌরব হয়। যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা এই পরিচর্যার কাজ করে, তারা প্রকৃতই প্রভু যীশুর শিষ্য এবং তারাই ঈশ্বরের গৌরব ঘোষণা করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৪) মহান নিয়োগ পালন করার জন্য শিষ্যদের যোগ্যতা

যে সব লোকেরা যীশুর মহান নিয়োগ পালন করে বিগত ২০০০ বছর ধরে সারা পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার করেছে এবং যার ফলে, যীশুর অনেক অনেক শিষ্য তৈরী হয়েছে। তাই এখন অনেক আত্মিক পুত্র ও আত্মিক পিতা রয়েছেন, যারা এই পৃথিবীর অনেক স্থানে এই সুসমাচার প্রচার কাজ করে যাচ্ছেন। আজকের দিনে, তাদের দ্বারা হারানো আত্মাদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে এবং সার্থক হয়ে উঠছে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের পদ মর্যাদা বলে (যেমন– পালক, প্রচারক, মিশনারি, পুরোহিত, বিশপ ইত্যাদি) আত্মিক পুত্রত্বের ও আত্মিক পিতৃত্বের ধাপে না থেকেও নানা দেশে সুসমাচার প্রচার করে যাচ্ছেন। তারা ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন না করেও হারানো আত্মাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিচ্ছে। অন্যকথায়, আগের আলোচনায় উল্লেখিত তিনটি স্তর ঠিক মত অনুসরণ না করেই সুসমাচার প্রচার করে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, তাদের এইরকম মিশন কাজের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাদের নিজের সম্মানের জন্য, ক্ষমতার জন্য, তাদের পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য এবং যীশুর নামে তাদের স্বপ্ন, লোভ ও উচ্চাশা বাস্তবায়ন করতেই মহান নিয়োগ পালন করে। এইরকম মিশনারিরা তাদের আশে-পাশের অন্যান্য মিশনারিদের দ্বারা তাদের বিপক্ষে কথা বলতে শুনলেই প্রতিযোগী বা বিপক্ষ মনে করে থাকে। যখন তাদের আশে-পাশের কোন মিশনারি তাদের চেয়ে ভাল কাজ করে, তখন তারা তাদের হিংসা করে থাকে এবং তাদের ঘৃণা করে থাকে। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করে সমালোচনা করে ও তাদের খর্ব করতে চায়। তারা তাদের মিশনারিদের নামে মিথ্যা ও মন্দ কথা বলে। ফলে মিশনারি সমাজের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে ও অবিশ্বাসের জন্ম নেয়।

আজকের দিনে, সারা পৃথিবীতে ঠিক এই রকম অনেক বাইবেল বহির্ভূত মিশনারি আছে। এই সব মিশনারিরা অনেক সময় স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের ক্ষতি করে এবং কষ্ট দেয়। মিশনারি হিসাবে যখন তাদের সুসমাচার প্রচার করার কথা, দুর্ভাগ্যবশত তখন তারা সুসমাচার বহির্ভূত বিষ মিশন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়। যীশু এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন যে, এইরকম অনেক পরিচর্যাকারী এ যুগে মন্ডলীর মধ্যে দেখা যাবে (মথি ৭:১৫-২৩ পদ দ্রষ্টব্য)। যেহেতু আমরা মানুষ

হিসাবে দুর্বল প্রাণী, সেহেতু আমাদের কাছে শিক্ষা হচ্ছে– আমরা যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন না করি, তাহলে আমরাও এই রকম পালক, প্রচারক ও মিশনারি।

যীশু এই ধরনের খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের সাবধান করে দিয়েছেন। যীশুর ভাষায় তারা হচ্ছে ভ্রান্ত বা ভাক্ত নবী বা ভাববাদী। "ভন্ড নবীদের বিষয়ে সাবধান হও। তারা তোমাদের কাছে ভেড়ার চেহারায় আসে, অথচ ভিতরে তারা রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘের মত। তাদের জীবনে যে ফল দেখা যায় তা দিয়েই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটাঝোপে কি আংগুর ফল কিম্বা শিয়ালকাঁটায় কি ডুমুর ফল ধরে? ঠিক সেই ভাবে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে আর খারাপ গাছে খারাপ ফলই ধরে। ভাল গাছে খারাপ ফল এবং খারাপ গাছে ভাল ফল ধরতে পারে না। যে গাছে ভাল ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। এইজন্য বলি, ভন্ড নবীদের জীবনে যে ফল দেখা যায় তা দিয়েই তোমরা তাদের চিনতে পারবে" (মথি ৭:১৫-২০ পদ)। আগে থেকেই যীশু আমাদের বলেছেন, "যীশুর সেবাকারী" **(ভেড়ার চেহারায়, মথি ৭:২২ পদ দ্রষ্টব্য)** নিয়ে তথাকথিত অনেকে আসবে, কিন্তু তাদের অন্তর হবে রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘের মত।

"রাক্ষুসে নেকড়ে বাঘ" মানে কি? মূল গ্রীক ভাষায় এর মানে হচ্ছে– 'হারপাক্স লুকস' যার মানে– ভয়ানক, লোলুপ, হিংস্র। তার মানে, ভন্ড নবী বা ভাববাদী এই ধরনের হিংস্র প্রাণ; যারা শুধুমাত্র তাদের লোভ-লালসা, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন এবং নিজেদের প্রশংসা পেতে চায়। যদিও তাদের দায়িত্ব হচ্ছে– সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সেবা, উপাসনা ও গৌরব করতে শিক্ষা দেওয়া; কিন্তু তারা ভেড়ার চেহারায় এসে তাদের নিজেদের লোভ-লালসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন এবং নিজেদের প্রশংসা অর্জনে ব্যস্ত। এটা তো নিঃসন্দেহে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

মূলত তাদের আহ্বান হওয়া উচিত ছিল যীশুর মেষদের দেখাশোনা করা, অর্থাৎ মেষ পালকের কাজ করা (যোহন ২১:১৫-১৭ পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তারা নেকড়ের মত এসে মেষদের ছিন্ন ভিন্ন করছে, চুরি করছে এবং মেরে ফেলছে। তারা সত্যিকার মেষ পালক নয়, বরং বেতনভোগী মেষ পালকের মত মেষদের কথা একেবারেই চিন্তা করে না (যোহন ১০:১-১৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, খ্রীষ্টিয়ান সমাজে এমন অনেক ভ্রান্ত ভাববাদীর উত্থান হবে। আর তাই, বিগত ২০০০ বছরে অনেক নেকড়ে সদৃশ ভ্রান্ত ভাববাদী খ্রীষ্টিয়ান পৃথিবীতে দেখা গেছে এবং তাদের দ্বারা অনেক মেষ চুরি, খুন ও বিনাশ হয়েছে। বিশেষ করে, যীশুর দ্বিতীয় আগমনের আগে এক ধরনের ভ্রান্ত ভাববাদী উঠে আসবে; তারা হচ্ছে মুক্তমনা ঈশতত্ত্ববিদ, পালক, পুরোহিত ও বিশপ। আজকের দিনে এই সব ভ্রান্ত ভাববাদীদের দ্বারা অনেক মেষ ছিনতাই হচ্ছে (মথি ২৩:১৩-১৫; ২৪:২৩-২৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

সামনে যে মহা বিচারের দিন আসছে, তখন যীশু এই সব ভ্রান্ত ভাববাদীদের অবজ্ঞা করবেন। তারা তো আত্মিকভাবে মূর্খ, নিজেরাই জানে না তারা আসলে কে। বিচারের দিনে তারা যীশুকে তাদের ধর্মীয় কাজের কথা বলবে ও তাদের পুরস্কার চাইবে। আর তখন প্রভু যীশু তাদের এভাবেই উত্তর দেবেন:

"সেই দিন অনেকে আমাকে বলবে, 'প্রভু, প্রভু, তোমার নামে কি আমরা নবী হিসাবে কথা বলি নি? তোমার নামে কি মন্দ আত্মা ছাড়াই নি? তোমার নামে কি অনেক আশ্চর্য কাজ করি নি?' তখন আমি সোজাসুজিই তাদের বলব, 'আমি তোমাদের চিনি না। দুষ্টের দল! আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও" (মথি ৭:২২-২৩ পদ)।

এই সব লোকেরা এমন গাছের মত, যে গাছ খারাপ ফল দেয়। এই রকম গাছ কেটে আগুনে ফেলে দিতে হবে (মথি ৭:১৯ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যভাবে, তাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিপক্ষে কাজ করে এবং অন্যদেরও সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে চলতে না দিয়ে মন্দ পথে নিয়ে যায়; তাই তাদের জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে (প্রককাশিত বাক্য ২০:১০, ১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। এটাই হচ্ছে নরক, যা মন্দ লোকদের চিরস্থায়ী জায়গা (গেহেনা, মথি ১০:২৮; মার্ক ৯:৪৩, ৪৮ পদ দ্রষ্টব্য)। এই বইয়ের লেখক হিসাবে আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই রকম লোকদের জন্য কোন পুরস্কার থাকবে না। ঠিক যেমন করে রাজা শলোমনকে সাবধান করা হয়েছিল, যদি তিনি ঈশ্বরকে ভুলে যান তাহলে তাকে যে দেশ ঈশ্বর দিয়েছেন সেখান থেকে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলবেন (২ বংশাবলি ৭:১৯-২০ পদ দ্রষ্টব্য)। তবে বাস্তবে ঈশ্বর তাকে দয়া করেছিলেন এবং তার প্রতি কঠিন হন নাই।

পাহাড়ের উপরে দেওয়া উপদেশেও আমরা একই রকম মতপ্রকাশ দেখতে পাই। যীশু বলেছেন, "যে কেউ আমার এই সমস্ত কথা শুনে তা পালন না করে সে এমন একজন মূর্খ লোকের মত, যে বালির উপরে তার ঘর তৈরী করল। পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা আসল, ঝড় বইল এবং সেই ঘরের উপরে আঘাত করল; তাতে ঘরটা পড়ে গেল। কি ভীষণ ভাবেই না সেই ঘরটা পড়ে গেল" (মথি ৭:২৬-২৭ পদ)! এই লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, তার ঘরটা ভীষণ ভাবে পড়ে গেছে, কিন্তু পুরোপুরি পড়ে যায় নি। তার মানে, তিনি পরিত্রাণ বা উদ্ধার পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার সঞ্চিত স্বর্গীয় পুরস্কার ভীষণ ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল।

যখন একজন ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ পায় ও সেমিনারীতে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং পড়াশোনা শেষ করে মিশনারি বা পালক হয়, তখন আমরা তাকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি বলে থাকি। আমরা তাদের সম্পর্কে প্রায়ই একথা বলি যে, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি ঈশ্বরের দাস হিসাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করছে এবং স্বর্গে গিয়ে সে পুরস্কার এবং উঁচু পদমর্যাদা পাবে। তবুও যাহোক, সত্যিকার ঈশ্বরের দাস হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব-নির্দিষ্ট হতে হবে এবং তার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান থাকতে হবে (রোমীয় ৮:২৮-৩০ পদ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়াও, তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের আহ্বানের যোগ্যভাবে জীবন-যাপন করতে হবে।

তাহলে কিভাবে আমরা প্রকৃত ঈশ্বরের দাসদের চিনতে পারব? উল্লেখিত তিনটি ধাপে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে সঠিক ভাবে জীবন-যাপন করলেই আমরা তাদের চিনতে পারব। ঈশ্বরের এই রকম দাস একজন বুদ্ধিমান দাস (মথি ৭:২৪ পদ দ্রষ্টব্য), যে পাথরের উপরে ঘর তৈরী করেছে (যীশু, ১ করিন্থীয় ১০:৪ পদ দ্রষ্টব্য)। এই বুদ্ধিমান দাস এই পৃথিবীতে বাস করতে করতেই যীশুতে থাকার কারণে সুখভোগ করে এবং নির্দিষ্ট সময় আসলে পর আনন্দপূর্ণ কৃতজ্ঞতার সাথে রোমাঞ্চকর অনুভূতি নিয়ে পরমদেশে প্রবেশ করে (লূক ২৩:৪৩; যোহন ১৪:২; ২ করিন্থীয় ১২:৪; প্রকাশিত বাক্য ২:৭ পদ দ্রষ্টব্য)। সমস্ত সৃষ্টিকে পরিচালনা দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া ও কর্তৃত্ব করার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অংশীদার হয়ে মিশন কাজে তার সার্থকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে (আদিপুস্তক ১:২৮ পদ দ্রষ্টব্য)। এই ব্যক্তি স্বর্গে বা পরমদেশে গিয়ে ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টির সাথে এবং পরিত্রাণ বা উদ্ধার পাওয়া পবিত্র ব্যক্তিদের সাথে একত্রে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের গৌরব, প্রশংসা ও সম্মান করবে (প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১৩ পদ দ্রষ্টব্য)।

চার
যারা সব সৃষ্টিকেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে দেখেছেন

পবিত্র বাইবেল সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে, সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের গৌরব করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। তবে আমরা কিন্তু জানি না, সত্যিই সকল প্রাণীই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে ঈশ্বরের গৌরব করে কি না। আমরা আমাদের জগতের চোখ বা কান দিয়ে তা দেখতে বা শুনতে পাই না যে, সত্যিই সমস্ত প্রাণীই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে গৌরব, সম্মান, প্রশংসা, আরাধনা ও ভক্তি জানাচ্ছে কি না।

যীশু নিজেই বলেছেন যে, শুধুমাত্র যার অন্তর খাঁটি সে-ই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (মথি ৫:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। যে বা যারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপ অনুশীলন করে ও পূর্বে উল্লেখিত বর্ণনা মত প্রতিদিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে এবং তাদের জীবনের তেতো গাছের শিকড়সমূহ ক্রমশ সরিয়ে ফেলে, তাদের আত্মিক চোখ আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। ঠিক তখনই তারা আত্মিক জগত দেখতে পায় ও শুনতেও পায়। বাইবেলে এমন অনেক লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা তাদের আত্মিক চোখ ও কান দিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত প্রাণী ঈশ্বরের প্রশংসা করছে তা দেখতে ও শুনতে পেয়েছে। পুরাতন নিয়মে রাজা দায়ূদ এবং নতুন নিয়মে প্রেরিত্ যোহন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাদেরই লেখা থেকে এখন আমরা জানব কিভাবে সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের গৌরব করেছে।

ক) দায়ূদ

দায়ূদ তার আত্মিক চোখ দিয়ে দেখেছিলেন যে, সমস্ত সৃষ্টি কিভাবে ঈশ্বরের গৌরব করছে। গীতসংহিতা ১৪৮:১-১৪ ও ৮৬:৯ পদে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

"সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক। স্বর্গ থেকে তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর; আকাশে ও মহাকাশে তাঁর প্রশংসা কর। হে তাঁর সমস্ত স্বর্গদূত, তাঁর প্রশংসা কর; হে তাঁর সমস্ত শক্তিদল, তাঁর প্রশংসা কর। হে সূর্য ও চাঁদ, তাঁর প্রশংসা কর; হে উজ্জ্বল সব তারা, তাঁর প্রশংসা কর। হে স্বর্গ, তাঁর প্রশংসা কর; হে আকাশের উপরের জল, তাঁর প্রশংসা কর। এরা সব সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক, কারণ তিনি আদেশ দিলেন আর এদের সৃষ্টি হল। এদের তিনি চিরকালের জন্য ঠিক জায়গায় স্থাপন করেছেন; তিনি একটা নিয়ম দিয়েছেন, কেউ তা ভাঙ্গতে পারবে না। পৃথিবী থেকে তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। হে সাগরের বড় বড় প্রাণী ও সাগরের গভীর তলদেশ, তাঁর প্রশংসা কর। হে বিদ্যুৎ ও শিলা, তুষার ও কুয়াশা আর তাঁর আদেশ পালন-করা ঝোড়ো বাতাস, তাঁর প্রশংসা কর। হে সমস্ত পাহাড়-পর্বত আর ফলের গাছ ও সমস্ত এরস গাছ, তাঁর প্রশংসা কর। হে বুনো জানোয়ার ও সমস্ত পোষ-মানা পশু আর বুকে-হাঁটা প্রাণী ও ডানাযুক্ত প্রাণী, তাঁর প্রশংসা কর। হে পৃথিবীর রাজারা এবং সমস্ত জাতি আর রাজপুরুষেরা ও পৃথিবীর শাসনকর্তারা, তাঁর প্রশংসা কর। হে যুবক ও যুবতীরা আর বৃদ্ধ ও ছেলেমেয়েরা, তাঁর প্রশংসা কর। এরা সবাই সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক, কারণ একমাত্র তিনিই মহান; পৃথিবী ও আকাশের উপরেও তাঁর গৌরব রয়েছে। তাঁর লোকদের তিনি শক্তিশালী করেছেন; তা তাঁর সমস্ত ভক্তদের গৌরব, তাঁর প্রিয় জাতি ইস্রায়েলের গৌরব। সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক" (গীতসংহিতা ১৪৮:১-১৪ পদ)।

"হে প্রভু, তোমার সৃষ্ট সমস্ত জাতি এসে তোমার সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে; তারা তোমার গুণগান করবে " (গীতসংহিতা ৮৬:৯ পদ)।

দায়ূদ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের প্রশংসা করে। এই 'সমস্ত সৃষ্টি' মানে– যা কিছু আছে; পৃথিবীর নীচের গভীর তলদেশ (এ্যাবিস) থেকে শুরু করে তৃতীয় স্বর্গের উপর পর্যন্ত সব কিছুই বুঝায়। এই পৃথিবী, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত, ভূমি, সব রকম গাছ-পালা, ফুল ও ঘাস সবই ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। তাছাড়াও, পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা সব জাতিগুলো, সব বয়সের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে, দ্বিতীয় স্বর্গের সব

তারাগুলো এবং তৃতীয় স্বর্গের সব স্বর্গদূতেরা সব সময় ঈশ্বরের গৌরব ঘোষণা করছে। দায়ূদ নিজে তার আত্মিক চোখ খুলে এই দৃশ্যগুলো দেখতে পেয়েছেন এবং যা দেখেছেন ও শুনেছেন তা তার লেখা গীতসমূহে বর্ণনা করেছেন।

১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ সময়কালে দায়ূদ দেখেছিলেন যে, সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের গৌরব করছে। একইভাবে, এখন পর্যন্ত তা-ই ঘটে চলেছে এবং চিরকাল ধরে ঘটতে থাকবে। অধিকাংশ লোকই এটা দেখতে বা শুনতে পায় না, কারণ তাদের আত্মিক চোখ ও কান বন্ধ, কিন্তু তবুও তা ঘটে যাচ্ছে এবং চিরকাল ঘটতে থাকবে। অবশ্যই এই সবই যিহোবা ঈশ্বরের পরিকল্পনা, কারণ তিনিই তাঁর গৌরবের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

খ) প্রেরিত্ যোহন

রাজা দায়ূদের মত নতুন নিয়মে প্রেরিত্ যোহন তার আত্মিক চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে, সমস্ত সৃষ্টি ত্রিত্ব ঈশ্বরের গৌরব করছে। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে তিনি এই দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। এই সময়ের কথা, যখন সুসমাচার প্রচার করার জন্য তাকে ইফিষ থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে পাটমস্ দ্বীপে নির্বাসনে দেওয়া হয়েছিল (৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)। পাটমস্ দ্বীপে থাকার সময়ে তার আত্মিক চোখ ও কান খুলে গিয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে ২৪ জন প্রাচীন ও স্বর্গদূতদের সুস্পষ্টভাবে দেখেছিলেন; তারা স্বর্গে ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রশংসা, গৌরব, ভক্তি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। ঠিক যেন তিনি ছায়া-ছবি দেখছেন, সেভাবেই তিনি এই সব দৃশ্যগুলো দেখতে পেয়েছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ৪:৮-১১; ৫:১১-১৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

“এই চারজন জীবন্ত প্রাণীর প্রত্যেকের ছয়টা করে ডানা ছিল এবং সব জায়গা চোখে ভরা ছিল। সেই প্রাণীরা দিনরাত এই কথাই বলছিলেন, ‘সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি আসছেন, তিনি পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।’ চিরজীবন্ত প্রভু ঈশ্বর, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, এই জীবন্ত প্রাণীরা যখনই তাঁকে গৌরব, সম্মান ও ধন্যবাদ জানান, তখন সেই চব্বিশজন নেতা সিংহাসনের অধিকারী, অর্থাৎ যিনি চিরকাল ধরে জীবিত আছেন তাঁকে উবুড় হয়ে প্রণাম করেন। এই নেতারা তখন সেই সিংহাসনের সামনে তাদের মুকুট খুলে রেখে বলেন, ‘আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তুমি গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য, কারণ তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ; আর তোমারই ইচ্ছাতে সেই সব সৃষ্ট হয়েছে এবং টিকে আছে” (প্রকাশিত বাক্য ৪:৮-১১ পদ)।

“পরে আমি চেয়ে দেখলাম; আর আমি সেই সিংহাসন, জীবন্ত প্রাণী ও নেতাদের চারদিকে অনেক স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনলাম। সেই স্বর্গদূতেরা ছিলেন সংখ্যায় হাজার হাজার, কোটি কোটি। তারা জোরে জোরে এই কথা বলছিলেন: ‘যে মেষ-শিশুকে মেরে ফেলা হয়েছিল তিনিই ক্ষমতা, ধন, জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, গৌরব ও প্রশংসা পাবার যোগ্য।’ তারপর স্বর্গে, পৃথিবীতে, পৃথিবীর গভীরে ও সমুদ্রে যত প্রাণী আছে, এমন কি, সেগুলোর মধ্যে আর যা কিছু আছে সকলকে আমি এই কথা বলতে শুনলাম: ‘সিংহাসনের উপরে যিনি বসে আছেন তাঁর এবং সেই মেষ-শিশুর প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও ক্ষমতা চিরকাল থাকুক।’ সেই চারজন জীবন্ত প্রাণী বললেন, ‘আমেন।’ তারপর সেই নেতারা উবুড় হয়ে প্রণাম করলেন” (প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১৪ পদ)।

যোহন আরও দেখেছিলেন যে, পাতালের গভীর (অ্যাবিস) থেকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণী ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। বিশেষ করে তিনি তৃতীয় স্বর্গে (পরমদেশ) সমস্ত স্বর্গদূতদের এবং চব্বিশজন প্রাচীনদের যীশুকে প্রশংসা ও উপাসনা করতে দেখেছেন। তাদের সামনে সিংহাসনে বসে পিতা ঈশ্বর ও যীশু, “যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি আসছেন”, “যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন” এবং “মেষ-শিশু, যিনি হত হয়েছিলেন”, এই সবই তিনি আরও সুনির্দিষ্টভাবে দেখেছেন ও শুনেছেন। তারা সকলে মিলে যীশুর ধন্যবাদ, গৌরব ও প্রশংসা করছিলেন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং উদ্ধারকর্তা এবং যার হাতে রয়েছে চিরকালের ক্ষমতা, জ্ঞান ও সম্মান।

প্রেরিত্ যোহনের ঈশ্বরের এই সিংহাসনের দৃশ্য দেখার পরে, তাকে ভবিষ্যতের একটা সময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি আকাশে যীশুর দ্বিতীয়বার ফিরে আসার দৃশ্যপট আগেই চাক্ষুষ করেছিলেন। ঐ দৃশ্যে, তিনি আরও দেখেছিলেন, যে সব পবিত্র লোকদের আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে (র‍্যাপচার), তারা ত্রিত্ব ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁর গৌরব, সম্মান, প্রশংসা, আরাধনা ও ভক্তি জানাচ্ছে। তাছাড়াও, তিনি দেখেছিলেন যে, সকল

স্বর্গদূতেরা এবং প্রাচীনেরা পবিত্র লোকেদের সাথে একত্রে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে আরাধনা করছেন (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

"এর পরে আমি প্রত্যেক জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার মধ্য থেকে এত লোকের ভিড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুণতে পারল না। সাদা পোশাক পরে তারা সেই সিংহাসন ও মেষ-শিশুর সামনে খেজুর পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা জোরে চিৎকার করে বলছিল: 'যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, আমাদের সেই ঈশ্বর এবং মেষ-শিশুর হাতেই পাপ থেকে উদ্ধার রয়েছে।' তারপর স্বর্গদূতেরা সকলেই সেই সিংহাসনের, নেতাদের ও চারজন জীবন্ত প্রাণীর চারপাশে দাঁড়ালেন। তারা সিংহাসনের সামনে উবুড় হয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করে বললেন, 'আমেন। প্রশংসা, গৌরব, জ্ঞান, ধন্যবাদ, সম্মান, ক্ষমতা ও শক্তি চিরকাল ধরে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক। আমেন।' তখন একজন নেতা আমাকে বললেন, 'সাদা পোশাক পরা এই সব লোক কারা? আর কোথা থেকেই বা তারা এসেছে?' আমি তাকে বললাম, 'দেখুন, তা আপনিই জানেন।' তিনি আমাকে বললেন, 'সেই মহাকষ্টের মধ্য থেকে যারা এসেছে এরা তারাই। এরা এদের পোশাক মেষ-শিশুর রক্তে ধুয়ে সাদা করেছে' " (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১৪ পদ)।

যীশু প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে, সারা পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার করা সম্পূর্ণ হলে পর তিনি আবার ফিরে আসবেন (মথি ২৪:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য, "এর পরে আমি প্রত্যেক জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার মধ্য থেকে এত লোকের ভিড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুণতে পারল না।" এটাই যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়ের দৃশ্যপট, যেখানে সারা পৃথিবীর সমস্ত জাতি, সমস্ত বংশের লোকেরা থাকবে। তারা সকলে সাদা পোশাক পরে খেজুর পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়াবে এবং তারা পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও মেষ-শিশু যীশুর প্রশংসা এবং আরাধনা করবে। আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা এই অসংখ্য লোকদের মধ্যে থাকব এবং তাদের মতই বলব, "প্রশংসা, গৌরব, জ্ঞান, ধন্যবাদ, সম্মান, ক্ষমতা ও শক্তি চিরকাল ধরে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক।"

গ) আত্মিক চোখ

বাইবেলে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা 'অন্তরে খাঁটি'। তাই তারা দায়ূদ ও যোহনের মতই আত্মিক জগতের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদী যিশাইয়কে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছিল (যিশাইয় ৬:১-১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও, অধিকাংশ ভাববাদী, এমন কি যিহিষ্কেল ভাববাদীকেও একটা দর্শনের মধ্য দিয়ে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছিল (যিহিষ্কেল ১:৪-১০:২২ পদ দ্রষ্টব্য)। নতুন নিয়মে, পিতর যাকোব ও যোহন প্রভু যীশুর রূপান্তরের সময় আত্মিক জগৎ দেখেছিলেন (মথি ১৭:১-৮ পদ দ্রষ্টব্য)। প্রেরিত্ পৌলও তৃতীয় স্বর্গে যাবার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:২-৪ পদ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীতে, তিনি দর্শনে ম্যাসিডোনিয়ার একজন ব্যক্তিকে দেখেছিলেন ও পশ্চিম ইউরোপে সুসমাচার প্রচার করার আহ্বান পেয়েছিলেন (প্রেরিত্ ১৬:৬-১০ পদ দ্রষ্টব্য)। যাফো শহরে পিতর একটা দর্শনে দেখেছিলেন যে, কেউ তাকে অশুচি খাবার খেতে বলছে (প্রেরিত্ ১০:৯-১৬ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি এভাবেই পবিত্র আত্মার কাছ থেকে সরাসরি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন, যেন তিনি যিহূদী জাতির ধর্মীয় গোঁড়ামীত্ব অতিক্রম করে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে যেতে পারেন।

মানুষ হিসাবে আমাদের তিন রকম চোখ আছে। প্রথমটা হচ্ছে মানুষের আত্মিক চোখ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে মানুষের মনের চোখ এবং তৃতীয়টা হচ্ছে মানুষের দেহের চোখ। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহের চোখ আছে। আবার প্রত্যেকেই তাদের মনের চোখ দিয়ে তাদের শিক্ষা অনুসারে, আবেগ অনুসারে এবং ইচ্ছাশক্তির ব্যবহারে একেক রকম দেখতে পায়। উদাহরণ হিসাবে, যারা এই পৃথিবীতে শিল্পকলার চর্চা করে, গান লেখে ও সুর দেয়, কবিতা ও উপন্যাস লেখে; তারা মূলত তাদের এই সব সৃজনশীল কাজগুলোর জন্য দেহের চোখ ছাড়াও তাদের মনের চোখ ব্যবহার করে থাকে। একইভাবে পন্ডিত, সমালোচক, উকিল ও বিভিন্ন গবেষণার কাজ যারা করে, তারা তাদের বুদ্ধির চোখ ব্যবহার করে। তাছাড়াও, অনেকে তাদের ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নৈতিক শৃঙ্খলা, সামাজিক নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন পালন করার মধ্য দিয়ে কাজ করে। শিক্ষা, জীবনের অভিজ্ঞতা ও নানারকম বাইরের অভিজ্ঞতা মনের চোখকে প্রভাবান্বিত করে। যে মনের এই তিন অংশ, অর্থাৎ বুদ্ধি, আবেগ ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিজেদের উন্নয়ন করতে পারে, সাধারণত তাদের বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ বলা হয়।

যখন কোন লোকের মনের চোখ বৃদ্ধি পায় ও আত্মিক জগতে ভুল করে প্রবেশ করে, তখন তা বেশ ক্ষতিকর ফলের কারণ ঘটতে পারে। অধিকাংশ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের মনের চোখ প্রথম দিকে স্বচ্ছ থাকে; তারপর তারা উঁচু মাত্রার দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় পৌঁছে যায়। এই ধরনের লোকেরা মন্দ আত্মিক মাত্রায় প্রবেশ করে এবং শয়তানের আত্মার সাক্ষাৎ পায়। এভাবে তাদের মনের চোখ শয়তানের শিক্ষায় ভরপুর হয় এবং তারা শয়তানের দাসে পরিণত হয়। যদিও তাদের চরিত্রে ভাল গুণ ছিল, কিন্তু আত্মিক জগতে শয়তানের সাথে সাক্ষাতের পর তারা ভীষণ মন্দ কাজে পরিচালিত হয় ও তাদের আত্মার দূষণ ঘটে।

পাহাড়ের উপরে দেওয়া উপদেশে যীশু বলেছেন, শুধু যাদের অন্তর খাঁটি, তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (মথি ৫:৮ পদ দ্রষ্টব্য)। যখন একজনের অন্তর থেকে তেতো গাছের শিকড় পরিষ্কার করে ফেলা হয় তখন তার অন্তর খাঁটি হয়ে ওঠে এবং তার আত্মিক চোখ ও কান ব্যাপকভাবে খুলে যায় এবং তার পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যের অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠে।

এই বিষয়টা জগতের অন্যান্য ধর্মে বলা 'অন্তর খালি করে ফেলা' থেকে একেবারে আলাদা। জগতের অন্যান্য ধর্ম সংযমের মধ্য দিয়ে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মধ্য দিয়ে এবং কৌমার্য রক্ষা করার মধ্য দিয়ে নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চেষ্টা করে যেন তার অন্তরের নোংরা জিনিষগুলো প্রকাশিত না হয়। তারা পর্বতে বাস করা সন্ন্যাসী হয়, ইচ্ছাকে প্রশিক্ষণ দেয়, তবু অন্তরের গভীরে থাকা মন, আবেগ ও নোংরা চিন্তাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিন্তু এই সব পদ্ধতির মধ্য দিয়েও তেতো গাছের শিকড়গুলো বের করা যায় না, বরং তা আরও গভীরে প্রবেশ করে।

অন্যদিকে, পবিত্র আত্মা এবং ঈশ্বরের বাক্য প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের অন্তরে ঢুকে নোংরা তেতো গাছের শিকড়গুলো ক্রমশ সরিয়ে ফেলতে পারে। এই প্রক্রিয়া হঠাৎ করেই ঘটে যায় না; এ জন্য দীর্ঘ আগুনের প্রশিক্ষণ, বাইবেল পড়াশোনা, ধ্যান করা এবং ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করার দরকার হয়। বাইবেল অনুসারে, শুধুমাত্র এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই একজন 'অন্তরে খাঁটি' হবার উপায় খুঁজে পেতে পারে এবং তার পক্ষে স্বর্গ-রাজ্য দেখা সম্ভব হয়।

আমাদের জীবনের জন্য ও ভবিষ্যতের জন্য আত্মিক চোখ খুলে যাওয়ার প্রকৃত উপকারীতা কি? প্রথম উপকারীতা হচ্ছে, যদি আমাদের আত্মিক চোখ খুলে যায়, তাহলে আমরা এই পৃথিবীতে থাকাকালেই পরমদেশের অভিজ্ঞতা পাই। যদিও আমরা এই পৃথিবীতে বাস করছি, তবুও আমরা আমাদের আত্মিক চোখ দিয়ে এ্যাবিস থেকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত, এমন কি বিশ্বব্রক্ষ্মাণ্ডের অনেক দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে পারি। এইভাবে আমাদের আত্মিক কানও খুলে যাবে এবং আত্মিক জগতের নানাবিধ কথা আমরা শুনতে পারব। ঠিক যেমন করে দায়ূদ ও যোহন দেখেছিলেন, কিভাবে এ্যাবিস থেকে শুরু করে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রশংসা, আরাধনা ও গৌরব করছে। আমরাও এই পৃথিবীতে থেকেই বিশাল একদল উপাসনাকারীদের সাথে মিলে ঈশ্বরের প্রশংসা ও উপাসনা করতে পারি।

দ্বিতীয় উপকারীতা হচ্ছে, আত্মিক চোখ খুলে গেলে পর আমরা এই পৃথিবীতে থেকেও ভিন্ন আংগিকে পৃথিবীকে দেখতে শুরু করি। আমাদের জীবনের প্রেক্ষাপট সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে বলেই আমরা ঈশ্বরের গুপ্ত উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা সঠিকভাবে বুঝতে পারি। এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, আমাদের চারিদিকে ঘটে যাওয়া অসংগতি, যুদ্ধ, ঘৃণা, ধ্বংস, প্রতিযোগীতা, বিরক্তি, উদ্বেগ, অস্থিরতা ইত্যাদি যা সব সময় আমাদের আশে-পাশে ঘটছে; কিন্তু এই সব কিছুর পিছনে থাকা ঈশ্বরের গুপ্ত রহস্য আমরা যখন অল্প অল্প করে বুঝতে পারি, তখন ঐসব আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তখন আমরা সোজাসুজি যীশুকে বিশ্বাস করে পৃথিবীর ওই সব বিষয় থেকে নিজেদের দূর সরিয়ে রাখতে পারি।

যদিও আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন কষ্টকর বিষয়, নৈরাশ্য ও ক্লেশ ভোগ করি, তবুও আমরা সেগুলোকে গুরুত্ব দেই না। কারণ আমরা এই সত্য বিশ্বাস করি যে, এই সবই যীশুর হাতে। ঈশ্বরীয় দৃষ্টিকোণে ঐসব আমাদের কাছে খুবই ছোট বিষয় মনে হবে।

যারা ঈশ্বরীয় দৃষ্টিকোণে দেখে, তাদের মধ্যে অপার্থিব আনন্দ থাকে, যা সব কিছুকে অতিক্রম করতে পারে। সেই সাথে, সব রকম সমস্যার মধ্যেও সত্যিকার সুখ ও শান্তি ধরে রাখতে পারে। আমরা যখন এই মাত্রায় পৌঁছাই, তখন আমরা এমন খ্রীষ্টিয়ান হই, যারা শুধুমাত্র বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা অনুশীলন করে। এভাবে জীবন-যাপন করতে করতে আমরা যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি, আমরা তখন আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আনন্দে পূর্ণ হয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে পরমদেশে প্রবেশ করতে পারি, যা আত্মিক চোখ দিয়ে আগেই দেখেছি। এমন খ্রীষ্টিয়ানেরা দৈহিক মৃত্যুকে

ভয় পায় না, বরং যীশুর জন্য সাক্ষ্যমর হতেও স্থির বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের জন্য স্তিফান (প্রেরিত্ ৭:৬০ পদ দ্রষ্টব্য), যাকোব (প্রেরিত্ ১২:২ পদ দ্রষ্টব্য) আনন্দের সাথে যীশুর জন্য জীবন দিতে পেরেছিল।

আমাদের এই পৃথিবীর জীবন শেষ করে আমরা যখন প্রভু যীশুর দেখা পাব তখন তিনি আমাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে জীবন-যাপন করেছ?' তাঁর প্রশ্নের উত্তরে যদি 'হ্যাঁ' বলি, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঈশ্বরের পরিচয় এবং আমাদের মানবিক পরিচয় ধ্যান করতে হবে এবং সেই সাথে মহান আদেশ ও মহান নিয়োগ পালন করতে হবে।

পাঁচ
ঈশ্বরের গুপ্ত রহস্য

এ পর্যন্ত আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার তিনটি নির্দিষ্ট ধাপ পরীক্ষা করে দেখেছি। প্রথম ধাপটি ছিল, প্রতিদিন ঈশ্বরের বারোটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বোঝা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা। দ্বিতীয় ধাপটি ছিল, সৃষ্ট প্রাণী হিসাবে আমাদের বারোটি মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা ও ধ্যান করা। এই দুটো ভিত্তির উপর তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে, আনন্দের সাথে মহান আদেশ ও মহান নিয়োগ আমাদের অন্তরের গভীরে লালন-পালন করা।

কোন বিতর্ক ছাড়াই, বিনা আপত্তিতে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানকে এই তিনটি ধাপ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে এমন খ্রীষ্টিয়ানের সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। পবিত্র বাইবেল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এই সত্য প্রকাশ করেছে।

ক) বাছাই করা লোকেরা

আমরা যখন বাইবেল পড়ি, আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে যারা প্রতিমা পূজায় আসক্ত, তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। অন্যদিকে, খুব অল্প সংখ্যক শুধুমাত্র ঈশ্বরকে বিশ্বস্তভাবে ভালবেসেছিল। সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু দলের বিষয় পুরাতন ও নতুন নিয়মের সময়ের ক্ষেত্রে একইভাবে দেখা যায় এবং এই ভাগের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সুগভীর দূরদর্শিতা লুকানো রয়েছে। এখন আমরা বাইবেল থেকে কয়েকটি আদর্শ উদাহরণ পর্যালোচনা করি।

খ্রীষ্টিয়ান সমাজের মধ্যে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর যে ভাগ উৎপন্ন হয়েছে, তা মূলত কনান দেশে গুপ্তচর পাঠানোর সময় থেকে শুরু হয়েছে। পারণ মরু এলাকার কাদেশে, ইস্রায়েল জাতি প্রথমবারের মত কনানে প্রবেশ করবার ঠিক আগে, কনান দেশ দেখবার জন্য তারা বারোজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিল। এই বারোজনের মধ্যে মাত্র দু'জন, যিহোশূয় ও কালেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন ইস্রায়েলীয়েরা কনান দেশ জয় করে। এই দু'জন বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর নিজেই তা সম্ভব করে তুলবেন। তাই তারা ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন (গণনাপুস্তক ১৪:৩০ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যভাবে, ১২ জন গুপ্তচরের মধ্যে মাত্র দুইজন, অর্থাৎ মাত্র ১৭% ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিল।

তাছাড়াও, উত্তর রাজ্য ইস্রায়েল এবং দক্ষিণ রাজ্য যিহূদার মাত্র গুটি কয়েক রাজা ঈশ্বরকে ভয় করতেন এবং প্রতিমার সেবা করেন নাই। কনানে ইস্রায়েল জাতি তাদের নিজের দেশ প্রতিষ্ঠা করার অল্পদিন পরে তারা ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল। অথচ এই ঈশ্বর তাঁর মহান ক্ষমতায় মিসর থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং মরু প্রান্তরে ৪০ বছর পরিচালনা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে, প্রতিমা পূজা করার জন্যই ঈশ্বর এই দেশকে দুভাগ করে দুটো রাজ্যে বিভক্ত করেছিলেন। যার একটা হচ্ছে- উত্তর রাজ্য ইস্রায়েল, অন্যটা হচ্ছে- দক্ষিণ রাজ্য যিহূদা। এই দুই রাজ্যের অধিকাংশ রাজা ঈশ্বরকে ভুলে বাবিলীয় ধর্মের দেব-দেবতার উপাসনা করতে শুরু করে। এমনকি তারা তাদের প্রজা ইস্রায়েলীয়েরাও, তাদের ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে প্রতিমা পূজা করতেও অনুমোদন দিয়েছিল।

এই দুটি রাজ্যে বিশ জন করে রাজা ছিলেন, কিন্তু মাত্র দুজন রাজা সমস্ত দেব- দেবতার মূর্তি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারা ছিলেন দক্ষিণ রাজ্য যিহূদার ১৩তম রাজা হিষ্কিয় (শাসনকাল: ৭১৫-৬৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ২ রাজাবলি ১৮:১-২০:২১ পদ দ্রষ্টব্য) এবং ১৬তম রাজা যোশিয় (শাসনকাল: ৬৪০-৬০৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ২ রাজাবলি ২২:১-২৩:৩০ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা দুজনেই যিরূশালেম উপাসনা-ঘরের ভেতরে ও বাইরে সকল দেব-দেবতার মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তারা সারা দেশে সমস্ত পূজার উঁচু স্থান ও মূর্তি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন (৪০ জন রাজার মধ্যে মাত্র ২ জন: ৫%)।

তবে, দক্ষিণ দেশ যিহূদার ৬ জন রাজা এবং উত্তর রাজ্য ইস্রায়েলের একজন রাজা আংশিকভাবে দেব-দেবতার মূর্তি ধ্বংস করেছিল (৪০ জন রাজার মধ্যে ১৭% মাত্র)। তারা হচ্ছেন রাজা আসা (তৃতীয় রাজা, শাসনকাল ৯১০-৮৬৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ১ রাজাবলি ১৫:৯-২৪ পদ দ্রষ্টব্য), রাজা যিহোশাফট, (চতুর্থ রাজা, শাসনকাল ৮৭২-৮৪৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ১ রাজাবলি ২২:৪১-৫০ পদ দ্রষ্টব্য) রাজা যোয়াশ (অষ্টম রাজা, শাসনকাল ৮৩৫-৭৯৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ২ রাজাবলি ১২:১-২১ পদ দ্রষ্টব্য), রাজা অমৎসিয় (নবম রাজা, শাসনকাল ৭৯৬-৭৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ২ রাজাবলি ১৪:১-২২ পদ দ্রষ্টব্য), রাজা অসরিয় (দশম রাজা, শাসনকাল ৭৯২-৭৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ২ রাজাবলি ১৫:১-৭ পদ দ্রষ্টব্য) এবং রাজা যোথম (একাদশ রাজা, শাসনকাল ৭৫০-৭৩২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ২ রাজাবলি ১৫:৩২-৩৮ পদ দ্রষ্টব্য)। এরা সবাই দক্ষিণ দেশ যিহূদার রাজারা। অন্যদিকে, উত্তর রাজ্যের মাত্র একজন রাজা যেহূ (একাদশ রাজা, শাসনকাল ৮৪১-৮১৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, ২ রাজাবলি ৯:৩০-১০:৩৬ পদ দ্রষ্টব্য) আংশিকভাবে মূর্তিগুলো ধ্বংস করেন। তাহলে বলা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের ৪০ জন রাজার মধ্যে মাত্র ২০% প্রতিমা পূজা না করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

এভাবেই দেখা যায়, অধিকাংশ ইস্রায়েলীয়েরা যাত্রাপুস্তকের সময়কাল থেকেই (১৪৪৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) প্রতিমা পূজা করে আসছে। যীশু (যিহোবা ঈশ্বর) ভাববাদীদের পাঠিয়ে তাদের বার বার সাবধান বাণী দিয়েছেন (যিরমিয় ৭:২৫ পদ দ্রষ্টব্য), কিন্তু তারা এই সাবধান বাণীতে কান দেয় নাই এবং প্রতিমা পূজা বন্ধ করে নাই। "যিরূশালেম! হায় যিরূশালেম! তুমি নবীদের খুন করে থাক এবং তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয় তাদের পাথর মেরে থাক। মুরগী যেমন বাচ্চাদের তার ডানার নীচে জড়ো করে তেমনি আমি তোমার লোকদের কতবার আমার কাছে জড়ো করতে চেয়েছি, কিন্তু তারা রাজি হয় নি" (মথি ২৩:৩৭ পদ)। যীশুর বলা এই কথা পড়ে আমরা জানতে পারছি যে, অধিকাংশ ইস্রায়েলীয় তাদের ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে দেব-দেবতার পূজাতে আসক্ত হয়েছিল। তাছাড়াও, তারা সংখ্যালঘু দলের ভাববাদী বা নবী, যারা তাদের প্রতিমা পূজা করতে বারণ করেছিল তাদের পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার মত জঘন্য কাজও করেছিল।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং বিশ্বস্ত সংখ্যালঘিষ্ট দল নতুন নিয়মের সময় পর্যন্ত একে অন্যের বিপক্ষতা করে আসছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, যীশু যখন এই জগতে ছিলেন, তখন মাত্র অল্প কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘু ছিল যারা সত্যিই তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, ভালবেসেছিল এবং তাঁকে অনুসরণও করেছিল। যেমন– প্রায় ৬০০ জন পুনরুত্থিত যীশুকে দেখেছিল ও তাঁকে অনুসরণ করেছিল (১ করিন্থীয় ১৫:৫-৮ পদ দ্রষ্টব্য)। তারা পুনরুত্থান থেকে তাঁর স্বর্গারোহণ পর্যন্ত ৪০ দিন যীশুকে অনুসরণ করেছিল। যীশু স্বর্গে যাবার আগে তাদের বলেছিলেন, "তোমরা যিরূশালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং আমার পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর" (প্রেরিত ১:৪খ পদ)। কিন্তু ঐ ৬০০ জনের মধ্যে মাত্র ১২০ জন তাঁর কথা সত্যিই বিশ্বাস করেছিল এবং অজানা এক ভবিষ্যতের সময়ের জন্য অপেক্ষা করেছিল, কখন প্রতিজ্ঞাত দান নেমে আসবে (প্রেরিত ১:১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। যদিও পুনরুত্থিত যীশুকে প্রায় ৬০০ জন দেখেছিল, তবু মাত্র ২০% লোক যীশুর কথা মান্য করেছিল। এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মাত্র অল্প কিছু সংখ্যক প্রকৃতপক্ষে যীশুর আদেশ পালন করেছিল।

পবিত্র বাইবেল এই অল্প কিছু সংখ্যক লোককেই 'বাছাই করা' বা Remnant বলেছে (১ রাজাবলি ১৯:১৮; যিশাইয় ১০:২০-২২; ২৮:৫; যিরমিয় ২৩:৩; রোমীয় ১১:৪-৫ পদ দ্রষ্টব্য)। এলিয় এবং পৌলের লেখা তথ্য অনুসারে বাছাই করা লোকেরা হচ্ছে, "যারা বাল দেবতার কাছে হাঁটু পাতে নি" (রোমীয় ১১:৪ পদ দ্রষ্টব্য)। যারা দেব-দেবতার পূজা না করে বিশ্বস্তভাবে শুধুমাত্র ঈশ্বরের পূজা করে, নিজেদের লোকদের প্রতিমা পূজা করতে নিষেধ করে এবং অত্যাচার ও লাঞ্ছনার শিকার হয়, তাদের 'বাছাই করা' বলে। অনেক ক্ষেত্রেই 'বাছাই করা' লোকেরা পরজাতীয়দের দ্বারা তাড়িত না হয়ে বরং খ্রীষ্টিয়ান লোকদের দ্বারাই তাড়িত হয়ে থাকে। এটাকেই বাইবেলে 'বাছাই করা' ঈশতাত্ত্বিক মতবাদ বলা হয়।

পুরাতন নিয়ম হচ্ছে নতুন নিয়মের ছায়া, তুলনা এবং নমুনা (ইব্রীয় ৮:৫; ৯:৯, ২৩, ২৪; ১০:১; কলসীয় ২:১৬-১৭ পদ দ্রষ্টব্য)। পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ ইস্রায়েলীয়েরা প্রতিমা পূজায় জড়িত হয়েছিল, যা আবার নতুন নিয়মের খ্রীষ্টিয়ানদের ক্ষেত্রেও সরাসরি তুলনা করা যায়। পুরাতন নিয়মের সময়ে বাবিলীয় ধর্মের দেব-দেবতাদের মূর্তিকে পূজা করা হোত। কিন্তু নতুন নিয়মের সময়ে দেব-দেবীর পূজার সাথে প্রতিমা পূজার অর্থ আরও বিস্তৃত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে, প্রেরিত পৌল বলেছেন যে, লোভ এক ধরনের প্রতিমা পূজা (ইফিষীয় ৫:৫; কলসীয় ৩:৫ পদ দ্রষ্টব্য), যা নতুন নিয়মের খ্রীষ্টিয়ানেরা করে থাকে। লোভ (গ্রীক ভাষায় pleonektees) মানে, 'আমার যা আছে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে অন্যের কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করা'। কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পাবার জন্য আরও বেশী করে ইচ্ছা প্রকাশ করা।

আমাদের জীবনের বিভিন্ন জায়গায় লোভকে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ সম্পদের লোভ, সম্মানের লোভ, ক্ষমতার লোভ, পরিবার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সার্থকতা, পদমর্যাদা, উচ্চশিক্ষা অর্জন, শখ ইত্যাদি আমাদের জীবনকে বিকৃত করে দেয়।

বিশেষ করে, খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সম্পদের লোভ। সম্পদের মূর্তি খুবই বিপদজনক। সেই জন্য বাইবেল আমাদের শিখিয়েছে, টাকা-পয়সা একজনকে ধ্বংস করতে পারে (হিতোপদেশ ১১:২৮ পদ) এবং সাবধান করেছে, "সব রকম মন্দের গোড়াতে রয়েছে টাকা-পয়সার প্রতি ভালবাসা (১ তীমথিয় ৬:১০ পদ)। প্রভু যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন ধনী ব্যক্তি সুসমাচারের জন্য তার টাকা-পয়সা খরচ করে প্রমাণ করে যে, তারা বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী কর্মচারী (লূক ১২:৪২-৪৮ পদ দ্রষ্টব্য)।

প্রতিমা পূজা মানে, ঈশ্বরের চেয়ে অন্য কিছুকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া। প্রতিমা পূজা হচ্ছে মানুষের তৈরী চিন্তা-ভাবনা, উদ্দেশ্য, দর্শন, সংগঠন, মূল্যবোধ ইত্যাদি যা মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের প্রকৃত স্থানকে সরিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে প্রতিমা পূজাকারী ঈশ্বরের চেয়ে অন্য কিছুকে বেশী গুরুত্ব দেয়। মানুষেরা ঈশ্বরের চেয়ে অন্য সব কিছু বেশী গুরুত্ব দিয়ে ভালবাসে এবং তার উপরে নির্ভর করে আরাম আয়েশ উপভোগ করে। সবচেয়ে মন্দ বিষয়, যখন আজকের খ্রীষ্টিয়ানেরা ডিনোমিনেশনকে বেশী মাত্রায় ভালবাসে; ঈশ্বরের চেয়ে তারা ভালবাসে তাদের মতবাদকে, তাদের মন্ডলীকে এবং তাদের পুরোহিতকে। তাদের এই ভালবাসার সাথে বিশ্বাস ও নির্ভরতা জড়িয়ে আছে, যা তাদের জীবনে সুখ, সান্ত্বনা উপভোগের সুযোগ করে দেয়।

তাহলে ঈশ্বর কেন তাঁর সন্তানেরা প্রতিমা পূজা করলে ভীষণ ঘৃণা করেন? কারণ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হিসাবে সৃষ্ট বস্তুর পূজা তাঁর কাছে ভীষণ কষ্টের, যা আবার তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। ঈশ্বরের সন্তানেরা যখন সৃষ্ট বস্তুর উপরে নির্ভর করে (শয়তান সহ) এবং তারা এই সবের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, স্ফূর্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়; এই সবই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আত্মমর্যাদায় ভীষণভাবে আঘাত করে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, অধিকাংশ ঈশ্বরের লোকেরাই প্রতিমা পূজা থেকে পুরোপুরি সরে থাকতে পারে না। শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক বা বাছাই করা লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সুযোগ পেয়েছে এবং তারা প্রতিমা পূজা করে না বরং তারা মহান নিয়োগ পালন করে।

আজকের দিনেও জগতের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈশ্বরের বাছাই করা লোকেরা লুকানো আছে, যারা প্রতিমা পূজা করে না। তারা উল্লেখিত প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপ বোঝে, স্বীকার করে এবং ধ্যান করে, পালন করে ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে। অতঃপর, তারা পরজাতীয়দের (অযিহূদী জাতিদের) কাছে সুসমাচার প্রচার কাজে এগিয়ে যায়। আর যখনই তারা এই কাজে এগিয়ে আসে, তখন তাদেরই খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের প্রতি অত্যাচার করে ও তাদের আলাদা করে দেয়।

এটাই ঈশ্বরের গুপ্ত রহস্য! সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাস জুড়ে কেন ঈশ্বর মাত্র অল্পসংখ্যক লোককে প্রতিমা পূজা না করে তাঁকে ভালবাসতে অনুমোদন দিয়েছিলেন? ঈশ্বর কেন তাঁর অধিকাংশ সন্তানদের অন্ধ করে রেখেছিলেন এবং খুবই অল্পসংখ্যক সন্তানদের তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্য আত্মিক চোখ খুলে দিয়েছিলেন?

যেহেতু ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বজ্ঞ (১ যোহন ৩:২০ পদ দ্রষ্টব্য), সর্বশক্তিমান (আদিপুস্তক ১৭:১ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি আগে থেকেই সব কিছু জানেন (১ পিতর ১:২ পদ দ্রষ্টব্য) এবং আগে থেকেই সব কিছুর পরিকল্পনা করেন (রোমীয় ৮:২৯ পদ দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর আমাদের মাথার চুলও তাঁর হিসাবের মধ্যে রাখেন (মথি ১০:৩০ পদ দ্রষ্টব্য) এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই তিনি একজনের অন্তর শক্ত করেন আবার অন্যদের দয়া করেন (যাত্রাপুস্তক ৭:৩; ৯:১২; ১৪:৪, ১৭; রোমীয় ৯:১৮ পদ দ্রষ্টব্য)। তাই, তাঁর অনুমোদন ছাড়া আমাদের জীবনে কিছুই ঘটে না (মথি ১:২৯ পদ দ্রষ্টব্য)।

তাহলে, মৌলিক সত্যটা হচ্ছে– খুবই কম সংখ্যক খ্রীষ্টিয়ান প্রকৃতভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং তাঁর সৃষ্টির সার্বভৌম উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে সচেষ্ট থাকে (মথি ২০:১৫; রোমীয় ৯:২১ পদ দ্রষ্টব্য)। এইসব বিষয় মানুষের সাধারণ বোধ-বুদ্ধির বাইরে, তাই তা ঈশ্বরের গুপ্ত রহস্য (গুপ্ত সত্য)। সেজন্য, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাওয়া প্রভু যীশুর শিক্ষা পালন করা এবং ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত; যেন তিনি আমাদেরকে অল্পসংখ্যক বাছাই করা লোকদের দলে থাকতে সুযোগ দান করেন, যারা শুধু তাঁকেই প্রকৃতভাবে ভালবাসবে।

খ) শ্রেণীবদ্ধ সমাজ

এই অল্পসংখ্যক বাছাই করা খ্রীষ্টিয়ানেরা, যারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে, তারা স্বর্গে উঁচু পদমর্যাদা পাবে। পবিত্র বাইবেলে এই বিষয়ে নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন- তারা পুরস্কার পাবে, তারা মুকুট পাবে, তারা উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা মহান হবে। এইসব শব্দ প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ-রাজ্যের উঁচু শ্রেণীর সমাজের কথা বলা হয়েছে।

যারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সেবাকাজ করে থাকে, তারাই স্বর্গে মহান। মথি ২০:২৬-২৮ পদে যীশু বলেছেন, "... ... তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায় তাকে তোমাদের সেবাকারী হতে হবে, আর যে প্রথম হতে চায় তাকে তোমাদের দাস হতে হবে। মনে রেখো, মনুষ্যপুত্র সেবা পেতে আসেন নি বরং সেবা করতে এসেছেন এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে তাদের প্রাণের পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন।" অন্যভাবে, অনেক লোকের পরিত্রাণ বা উদ্ধারের জন্য এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য শিক্ষা দেবার জন্য যে কাজ করে, সে-ই স্বর্গ-রাজ্যে মহান। সুতরাং পৃথিবীতে 'মহান' এবং স্বর্গ-রাজ্যে 'মহান' মৌলিকভাবে সম্পূর্ণ আলাদা।

যীশুর উপদেশ অনুসারে, স্বর্গে অনেকে বড় ও অনেকে ছোট থাকবে। এটা আমাদের সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে, স্বর্গ-রাজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির পুরস্কার, শ্রেণী ও পদমর্যাদা একেক রকম। এই প্রসংগে প্রেরিত্ পৌল বলেছেন, "বড় বাড়ীতে কেবল যে সোনা-রূপার বাসন থাকে তা নয়, কিন্তু কাঠের ও মাটির বাসনও থাকে। তার মধ্যে কতগুলো বাসন সম্মানের কাজে আর কতগুলো বাসন নীচু কাজে ব্যবহার করা হয়। যারা এই সব নীচু কাজের বাসনের মত, তাদের থেকে সরে এসে যদি কেউ নিজেকে শুচি করে তবে সে এমন বাসনের মত হবে যা সম্মানের কাজে ব্যবহার করা হয়। পবিত্র উদ্দেশ্যে তাকে আলাদা করে রাখা হবে, সে প্রভুর কাজে লাগবে এবং সব রকম ভাল কাজ করবার জন্য সে প্রস্তুত থাকবে (২ তীমথিয় ২:২০-২১ পদ)। এছাড়াও পৌল আরও বলেছেন যে, স্বর্গ-রাজ্যে খ্রীষ্টিয়ানদের মহিমার উজ্জ্বলতা একেক জনের একেক রকম (১ করিন্থীয় ১৫:৪১ পদ দ্রষ্টব্য)।

যীশু নিজেই আমাদের বলেছেন, স্বর্গে যারা নেতৃত্বের শ্রেণীতে থাকবে, তারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারও পাবে (মথি ৫:৫; ১ করিন্থীয় ৬:৯-১১; ১৫:৫০; গালাতীয় ৫:১৯-২১; প্রকাশিত বাক্য ২১:২৪ পদ দ্রষ্টব্য)। তিনি তাদের পুরস্কার দেবারও প্রতিজ্ঞা করেছেন (মথি ১৬:২৭; ইব্রীয় ১১:৬; প্রকাশিত বাক্য ২২:১২ পদ দ্রষ্টব্য)। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান তাদের স্ব স্ব কাজ অনুসারে মোট সাত রকম মুকুট (মালা) পুরস্কার হিসাবে পাবে, (১ করিন্থীয় ৯:২৫-২৭; ১ থিষলনীকীয় ২:১৯; ২ তীমথিয় ৪:৭-৮; যাকোব ১:১২; ১ পিতর ৫:২-৪; প্রকাশিত বাক্য ৪:৪; ১২:১ ও ১৪:১৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

পবিত্র বাইবেলের অনেক অধ্যায়ে এই সব পুরস্কার, উত্তরাধিকার এবং শ্রেণী সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। কিন্তু এই আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয়ানদের পক্ষে এই সত্য বুঝে ওঠা ও মেনে নেওয়া খুব সহজ নয়। কারণ দীর্ঘদিনের জাগতিক শিক্ষা 'শ্রেণী বিন্যাস' বিষয়টা সম্পর্কে অসম বা সম্মানহানিকর ধারণার জন্ম দেয়। কিন্তু যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের আত্মিক চোখ খুলে যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি এই শব্দ আসলে নিখুঁত ও খাঁটি ঈশ্বরের ইচ্ছারই প্রতিফলন।

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। যেহেতু বাইবেলে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর দাস-দাসীদের মায়ের গর্ভে আকার পাবার আগেই নির্বাচিত করেছিলেন (গীতসংহিতা ১৩৯:১৬; যিরমিয় ১:৫; গালাতীয় ১:১৫ পদ দ্রষ্টব্য), সেহেতু এও বলা যায় যে, স্বর্গ-রাজ্যে তিনি তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট দাস-দাসীদের আগে থেকেই বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে রেখেছেন। ঈশ্বর আগেই মনোনীত করেছেন কারা উদ্ধার পাবে (রোমীয় ৮:২৯ পদ দ্রষ্টব্য) এবং স্বর্গে গিয়ে কে তাদের মধ্যে উঁচু পদমর্যাদা পাবে অথবা নীচু পদমর্যাদা পাবে।

যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা স্বর্গে গিয়ে নীচু পদমর্যাদা পাবার জন্য পূর্ব-নিদিষ্ট, পৃথিবীতে তারাই মূলত প্রতিমা পূজক। অন্যভাবে, প্রতিমা পূজক বলতে তাদেরই বলা হয় যারা টাকা-পয়সা, সম্মান ও ক্ষমতাকে ঈশ্বরের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয় এবং তারা হচ্ছে সেই মানের খ্রীষ্টিয়ান, যারা বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের উপরে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা নিয়ে আসে (মথি ৫:১১; ২৩:২৯-৩৬ পদ দ্রষ্টব্য)। অন্যদিকে, যে সব খ্রীষ্টিয়ানেরা স্বর্গে উঁচু পদমর্যাদা পাবার জন্য পূর্বনির্দিষ্ট, তারা প্রতিমা পূজা করবে না এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করবে। এইরকম লোকদের সাথে দেখা হলে পর আমরা অনায়াসে বুঝতে পারব যে, তারা স্বর্গে উঁচু পদমর্যাদা পাবে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করা সৃষ্ট প্রাণীদের পক্ষে কোন সহজ কাজ নয়। মানুষের ভিতরে শয়তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভরা থাকে। তাদের অন্তর সম্পূর্ণভাবে মন্দ। তাছাড়া, যেহেতু তারা দুর্বল, অযোগ্য, খামখেয়ালি, ক্ষণিক ও সীমাবদ্ধ, তাই তারা তাদের নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে পারে না। সেই জন্য, যদি কেউ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে না চলে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিচার করা বা দোষী করা আমাদের উচিত নয়।

এটা আমাদের নিজেদের সমস্যা, অন্য কারও নয়। ঈশ্বরের পূর্বনির্দিষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহের অধীন হওয়া আমাদের উচিত। সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে শুধুমাত্র তাঁকেই গৌরব দেবার ও ভালবাসবার জন্য এমন খ্রীষ্টিয়ান হওয়া প্রয়োজন, ভবিষ্যতে স্বর্গে যাদের থাকবে উঁচু পদমর্যাদা। আমরা জানি না, আমরা পূর্বনির্দিষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহের অধীন কি না। আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল উপায়, যদি আমরা বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আত্মিকভাবে সংবেদনশীল হই এবং তা পালন করতে আমাদের অন্তরে একান্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে (ফিলিপীয় ২:১৩ পদ দ্রষ্টব্য)। আমরা যদি তেমন খ্রীষ্টিয়ান হই, তাহলে আমরা সম্ভবত আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান, যারা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের পূর্বনির্দিষ্ট এবং অনুগ্রহের অধীন।

ছয়
উপসংহার

ভাববাদী যিশাইয় ও প্রেরিত্ পৌলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেছেন যে, সমস্ত সৃষ্টি এমনকি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিত্ব ঈশ্বরের গৌরব ও তাঁকে খুশী করা। ঈশ্বরকে গৌরব দেওয়া ও তাঁকে খুশী করা মানে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হিসাবে তাঁর পরিচয় বোঝা, স্বীকার করা ও ধ্যান করা। সেই সাথে, নিজেদের পরিচয় জানা, অনুতাপ করা ও পাপ স্বীকার করা এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্য পালন করা। আমাদের বুঝতে হবে, যখন খ্রীষ্টিয়ানেরা এরকম জীবন-যাপন করে, তখন তারা স্বাভাবিকভাবে মহান আদেশ পালন করে এবং মহান নিয়োগ পালন করতে তৎপর হয়। তখন তারা না চাইলেও ঈশ্বর তাদের সন্দেহাতীতভাবেই সত্যিকার সুখী করেন।

তবে অনেক খ্রীষ্টিয়ান আছে যারা সুখী হবার এই প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে এবং প্রতিমা পূজায়, অর্থাৎ টাকা-পয়সা, সম্মান, ক্ষমতা, পরিবার, উচ্চ শিক্ষা, ভাল স্বাস্থ্য, উন্নতি, উচ্চাশা ইত্যাদি থেকে সুখ খুঁজে পেতে চেষ্টা করে এবং নিজেকে প্রতারিত করে। তারা সুখী হয় এবং সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে এই সব প্রতিমার দিকে আকৃষ্ট হয়। যদিও তারা সুখ খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়, কিন্তু সত্যিকার সুখ পায় না, কারণ তা আসলে মরীচিকা সদৃশ। তারপর, তারা প্রকৃত সুখ ব্যতিরেকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এই ধরনের খ্রীষ্টিয়ানদের আমরা বলি বোকা খ্রীষ্টিয়ান।

একজন বুদ্ধিমান খ্রীষ্টিয়ান কোন ক্রমেই এই সব প্রতিমার দিকে আকৃষ্ট হয় না। তারা ঈশ্বরকে গৌরব দেবার তিনটি শর্ত পালন করে। যীশু বলেছেন যে, এই ধরনের ব্যক্তিরা ঈশ্বরের রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয় প্রথমেই চেষ্টা করে (মথি ৬:৩৩ পদ দ্রষ্টব্য)। এই ধরনের আশীর্বাদপ্রাপ্ত লোকদের জীবনে জাগতিক আশীর্বাদগুলো এমনি এমনিই আসে। তাদের জীবনে টাকা-পয়সা, সম্পদ, সম্মান, ক্ষমতা, পরিবার, উচ্চ শিক্ষা, ভাল স্বাস্থ্য ইত্যাদি না চাইলেও তাদের কাছে আসে। আর যখন তারা এই সব আশীর্বাদ পায়, তখন তা সবই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহার করে। এভাবেই খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য ও অনন্তকালীন সুখের স্বাদ অনুভব করে।

এই রকম আশীর্বাদপ্রাপ্ত লোকেরা এই পৃথিবীতে থাকতেই সত্যিকার সুখী জীবন-যাপন করে এবং পরবর্তীতে তারা যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন তাদের সুখ অনন্তকালীন রাজ্যে পৌঁছে যায়। অন্যকথায়, আমরা যখন আমাদের টাকা-পয়সা, ক্ষমতা, সম্মান এবং সময় ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করি, তখন আমরা এই পৃথিবীতে থাকাকালেই ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকৃত সুখ উপভোগ করতে পারি এবং মৃত্যুর পরে নিঃসন্দেহে আমরা সেই প্রকৃত সুখ অনন্ত রাজ্যে উপভোগ করতে পারি।

বিগত যুগে আমাদের যে সব পিতা-মাতারা বিশ্বাসের এই অধিকার নিয়ে চলে গেছেন, তাদের বংশধরেরা আশীর্বাদ পাবে; কারণ তাদের পিতা-মাতারাও ছিলেন আশীর্বাদপ্রাপ্ত। যিহোবা ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন– এইরকম বিশ্বস্ত পিতা-মাতাদের জন্য তিনি তাদের বংশের পর বংশ ধরে আশীর্বাদ করবেন (যাত্রাপুস্তক ২০:৬ পদ দ্রষ্টব্য)। "তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি যদি তোমাদের পূর্ণ বাধ্যতা থাকে এবং আজ আমি তাঁর যে সব আদেশ তোমাদের দিচ্ছি তা যদি তোমরা যত্নের সংগে পালন কর, তবে তিনি পৃথিবীর অন্য সব জাতির উপরে তোমাদের স্থান দেবেন। তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাধ্য হও তবে এই সব আশীর্বাদ তোমরা পাবে আর তা তোমাদের সংগে থাকবে: তোমাদের বাসস্থান ও ক্ষেত-খামারের সব কিছুতে তোমরা আশীর্বাদ পাবে। তোমরা আশীর্বাদ পাবে যার ফলে তোমাদের পরিবারের অনেক সন্তান, ক্ষেতে প্রচুর ফসল এবং পালের গরু-ছাগল-ভেড়ার অনেক বাচ্চা হবে। তোমাদের ফসলের ঝুড়ি ও ময়দা ঠাঁসবার পাত্র আশীর্বাদ পাবে। প্রতিদিনকার জীবনে তোমরা আশীর্বাদ পাবে। যারা শত্রু হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সদাপ্রভু এমন করবেন যাতে তারা তোমাদের কাছে হেরে যায়। তারা একদিক দিয়ে তোমাদের আক্রমণ করতে এসে সাত দিক দিয়ে পালিয়ে যাবে। তোমাদের গোলাঘরের উপর সদাপ্রভুর আশীর্বাদ থাকবে এবং যে কাজে তোমরা হাত দেবে তাতেই তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁর দেওয়া দেশে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। যদি তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আদেশগুলো পালন কর এবং তাঁর পথে চল তবে তিনি তাঁর শপথ করে প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তাঁর আলাদা করা জাতি হিসাবে তোমাদের দাঁড় করাবেন। তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি দেখতে পাবে যে, সদাপ্রভুর নামেই তোমাদের পরিচয়, আর তাতে তারা তোমাদের ভয় করে চলবে। যে দেশটা তোমাদের দেবেন বলে সদাপ্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন সেই দেশে তিনি

তোমাদের প্রচুর দান করবেন, অর্থাৎ তিনি তোমাদের পরিবারে অনেক ছেলেমেয়ে, পশুপালে অনেক বাচ্চা ও ক্ষেতে অনেক ফসল দেবেন। তোমাদের দেশে সময়মত বৃষ্টি দিয়ে তোমাদের হাতের সব কাজে আশীর্বাদ করবার জন্য সদাপ্রভু তাঁর দানের ভান্ডার, অর্থাৎ আকাশ খুলে দেবেন। তোমরা অনেক জাতিকে ঋণ দিতে পারবে, কিন্তু কারও কাছ থেকে তোমাদের ঋণ নিতে হবে না। সদাপ্রভু এমন করবেন যাতে তোমরা সকলের মাথার উপরে থাক, পায়ের তলায় নয়। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর যে সব আদেশ আজ আমি তোমাদের দিচ্ছি তাতে যদি কান দাও এবং যত্নের সংগে তা পালন কর, তবে সব সময় তোমাদের স্থান থাকবে উপরে, নীচে নয়। আজ আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিচ্ছি, দেব-দেবতার পিছনে গিয়ে এবং তাদের পূজা করে তোমরা তা থেকে এদিক ওদিক সরে যাবে না ” (দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১-১৪ পদ)।

যারা যিহোবা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা শোনে ও পালন করে সে সব খ্রীষ্টিয়ান পিতা-মাতা সত্যিই তাদের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন, তারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী। জ্ঞানী পিতা-মাতা হিসাবে যিহোবা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আমাদের উচিত প্রার্থনা করা এবং তাঁর অনুগ্রহ চেয়ে নেওয়া।

এই বইয়ের লেখক হিসাবে আমি প্রার্থনা করি, যেন ঈশ্বর হনোককে (আদিপুস্তক ৫:২৪ পদ দ্রষ্টব্য) যে আশীর্বাদ করেছিলেন, নোহকে (আদিপুস্তক ৬:৮ পদ দ্রষ্টব্য), অব্রাহামকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন (২ বংশাবলি ২০:৭ পদ দ্রষ্টব্য), মোশিকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৬ পদ দ্রষ্টব্য) এবং দায়ূদকে (১ শমূয়েল ১৩:১৪; প্রেরিত্ ৭:৪৬; ১৩:২২ পদ দ্রষ্টব্য) যে আশীর্বাদ করেছিলেন, তা যেন এই বইয়ের পাঠক ও তার পরিবারের প্রতি, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি, তাদের চাকুরির প্রতি ও তারা যা কিছু করে সব কিছুর প্রতি ঘটে।

শেষ কথা

এই বইটিতে তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর কে' এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদ প্রতিষ্ঠা' এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে 'সৃষ্টির উদ্দেশ্য' নিয়ে। আমরা আলোচনা করেছি, খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের পরিচয় ও তাঁর গুরুত্ব নিয়ে ও খ্রীষ্টিয়ানদের পরিচয় নিয়ে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছি কিভাবে এই উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জড়িত।

আজকের দিনে, সারা পৃথিবীতে খুবই দ্রুতগতিতে ঈশতত্ত্ব ও মতবাদ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে খ্রীষ্টতত্ত্বের উপরে আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রচন্ড শক্তিশালী ক্ষমতা চারিদিক থেকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে আক্রমণ করছে। আমাদের খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত এইসব আক্রমণ প্রতিহত করা। সেজন্য আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরকে সঠিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা উচিত। খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় কি তা বুঝে প্রকাশ করতে হবে যে, আমাদের ঈশ্বর একই ঈশ্বর, কিন্তু একই সাথে তিনি ত্রিত্ব ঈশ্বরে বিরাজমান।

খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই ত্রিত্ব ঈশ্বরের মতবাদ জেনে সুসজ্জিভূত হওয়া উচিত। যেমন– আমাদের ত্রিত্ব ঈশ্বর যিহূদী ধর্মের ঈশ্বর এবং ইসলাম ধর্মের ঈশ্বরের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন; যদিও এই উভয় ধর্মই দাবী করে তাদের ধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম। অন্যদিকে, মানবিক যুক্তি-তর্কের সীমাবদ্ধতায় খ্রীষ্টিয়ানদের ত্রিত্ব ঈশ্বর পুরোপুরি বোঝা যায় না, সে কারণে বিগত ২০০০ বছরের ইতিহাসে ত্রিত্ব মতবাদের উপরে আক্রমণ চলে আসছে এবং এখনও এই আক্রমণ হচ্ছে।

খ্রীষ্টিয়ানদের ত্রিত্ব ঈশ্বর মূলত হিব্রু ভাষায় "এলোহিম" বা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এক সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে সমস্ত সৃষ্টি এমনকি মানুষও সৃষ্টি করেছেন। যিশাইয় ও পৌলকে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাদের কাছে বলেছেন, তিনি এই সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন যেন সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করে, সম্মান করে, উপাসনা করে, তাঁর গৌরব করে এবং চিরকাল ধরে করে। প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান জীবনে তা কিভাবে প্রতিফলিত হতে পারে? সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করতে আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা কি করতে পারি?

এই কারণে, লেখক হিসাবে আমি খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য তিনটি ধাপের নির্দেশিকা প্রদান করেছি। প্রথম ধাপটি হচ্ছে– ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পারা, স্বীকার করা, ধ্যান করা এবং তাঁর আরাধনা ও গৌরব করা। দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে– মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় বুঝতে পারা, স্বীকার করা এবং অন্তরে উপলব্ধি করা। তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে– মহান আদেশ (সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মহান আদেশ) এবং মহান নিয়োগ পালন করা। পুরাতন ও নতুন নিয়মের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ঈশ্বর বিশ্বাসী (খ্রীষ্টিয়ানেরা) সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে নি; কিন্তু শুধুমাত্র অল্প কিছু সংখ্যক তা পালন করেছে।

এই বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা সংখ্যায় খুবই কম ছিল। বাইবেলে তাদের বলা হোত 'বাছাই করা' বা Remnant. পুরাতন নিয়মে এলিয় ভাববাদী এবং নতুন নিয়মে পৌলের মধ্য দিয়ে বাছাই করার মতবাদ বা Remnant Theology (১ রাজাবলি ১৯:১৮; যিশাইয় ১০:২০-২২; ২৮:৫; যিরমিয় ২৩:৩; রোমীয় ১১:৪-৫ পদ দ্রষ্টব্য)। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বাছাই করার প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। যদিও ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের মনোনীত, তবু অধিকাংশই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বাবিলীয় ধর্মের দেব-দেবতার পূজায় আসক্ত হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক ইস্রায়েলীয়েরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আরাধনা ও গৌরব করেছিল।

পুরাতন নিয়ম হচ্ছে নতুন নিয়মের ছায়াস্বরূপ, উপমাস্বরূপ বা মডেল বলা যেতে পারে। সেই জন্য পুরাতন নিয়মের নানাবিধ ঘটনাবলী, উপমা ও প্রকৃতি বাছাই করার প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেয়, যা একইভাবে নতুন নিয়মে প্রয়োগ করা যায়। খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের ২০০০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাছাই করা একটি দল এই পৃথিবীতে সব সময়ই থাকছে।

সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসে ঈশ্বর কেন এই অল্পসংখ্যক লোককে তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের অনুমোদন দিয়েছেন? আবার, কেন তিনি তাঁর অধিকাংশ সন্তানদের তাঁকে ও দেব-দেবতাদের পূজা করার সুযোগ দিয়েছেন? আমাদের মানবিক বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়ে এই বিষয় যথাযথ বুঝতে পারা সত্যিই বড় কঠিন, কারণ এই রহস্য স্বয়ং ঈশ্বরের নিজের কর্তৃত্বে রয়েছে। তবে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনুগ্রহে মানুষ তা বুঝতে চেষ্টা করতে পারে।

লেখক হিসাবে, আমি আশা করব যে, এই বইয়ের পাঠক এবং তাদের সন্তানেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঈশ্বরের মনোনীত হতে পারেন; যেন তারা ঐ অল্পসংখ্যক বাছাই করা লোকদের মধ্যে থাকতে পারেন, যারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন-যাপন করে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি সরলভাবে প্রার্থনা করি, তারা যেন সেই আশীর্বাদপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান হয়, যারা ঈশ্বরের স্বর্গ-রাজ্যে প্রস্তুত করা মুকুট (মালা) পায় এবং স্বর্গ-রাজ্যে প্রজাদের নেতৃত্ব দিতে পারে। তারা যেন সমগ্র সৃষ্টিকে শিক্ষা দিতে পারে, দিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁর গৌরব, প্রশংসা ও আরাধনা করতে তাদের শিক্ষা দিতে পারে।

নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা (Selected Bibliography)

Archer, Gleason L.1964. A Survey of Old Testament Introduction.

Baille, John. 1939. Our Knowledge of God. New York: Schibner.

Baker, Charles F. 1971. A Dispensational Theology. Grand Rapids: Grace Bible College Publications.

Bancroft, Emery H., ed.. 1949. Christian Theology. Grand Rapids: Zondervan Publishing House.

Barth, Karl. 1959. God, Grace, and Gospel. Edinburgh: Oliver and Boyd.

Bavinck, Herman. 1977. The Doctrine of God. trans. William Hendriksen. Grand Rapids: Baker Book House.

Beardslee, John W., ed..1965. Reformed Dogmatics. New York: Oxford University Press.

BerKhof, Louis. 1939. The Assurance of Faith. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

______.1965. Systematic Theology. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..
______.1976. The History of Christian Doctrines. Grand Rapids: Baker Book House.

Berkouwer, G. C. 1962. Man: The Image of God. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Bloesh, Donald G. 1978. Essentials of Evangelical Theology. San Francisco: Harper and Row.

Bloesch, Donald G. 1998. Essentials of Evangelical Theology: God, Authority and salvation. Peabody: Prince Press.

Boettner, Loraine. 1963. The Reformed Doctrine of Predestination. Philadelphia: the Presbyterian and Reformed Publishing Co..

Boettner, Loraine. 1964. The Millennium. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co..

Boice, James Montagomery. 1978. The Sovereign God. Downers Grove: InterVarsity Press.

Bonhoeffer, Dietrich. 1963. The Cost of Discipleship. New York: Macmillan Press.

Brunner, Email. 1943. The Divine – Human Encounter, trans. Amandus W. Loos. Philadelphia: Westminster Press.

______. 1946. Revelation and Reason, trans. Olive Wyon. Philadelphia: Westminster Press.

______. 1947. Man in Revolt. Philadelphia: Westminster Press.

Bruner, Frederick Dale. 1970. A Theology of the Holy Spirit. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Buswell, James Oliver. 1978. A Systematic Theology of the Christian Religion. Grand Rapids: Zondervan Publishing House.

Cairns, David. 1953. The Image of God in Man. New York: Philosophycal Library.

Carnell, Edward John. 1964. An Introduction to Christian Apologetics. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Chafer, Lewis Sperry. 1948. 8 Vols. Systematic Theology. Dallas: Dalls Theology Seminary Press.

Darwin, charles. 1988. The Origin of Species. Chicago: Thompson and Thomas.

Davidheiser, Bolton. 1969. Evolution and Christian Faith. Grand Rapids: Baker Book House.

Dewart, Lelie. 1966. The Future of Belief. New York: Herder and Herder Co..

Dickason, C. Fred. 1976. Angels, Elect and Evil. Chicago: Moody press.

Durnbaugh, Donald F. 1968. The Believers' Church. New York: Macmillan Church.

Erickson, Millard J. 1985. Christian Theology. Grand Rapids: Baker Book House.

Eusebius, Pamphilus. 1962. Ecclesiastical History. trans. Isaac Boyle. Grand Rapids: Baker Book House.

Feinberg, Charles L. 1961. Premillennialism or Amillennialism? New York: American Board of Missions to the Jews, 2nd and Enlarged Edition.

Flannery, Austin P., ed.. 1975. Documents of Vatican II. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Fortman, Edmund J. 1972. The Trine God. Philadelphia? Westminster Press.

Gundry, Robert H. 1973. The Church and the Tribulation. Grand Rapids: Zondervan Publishing House.

Hammond, T. C. 1952. In Understanding Be Man. London: Inter varsity Fellowship, 4th Edition.

Harrison, Everett F., ed.. 1978. Baker's Dictionary of Theology. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Heard, Gerala. 1940. The Creed of Christ. New York: Harper and Row.

Hendry, George S. 1956. The Holy Spirit in Christian Theology.Philadelphia: Westminster Press.

Henry, Carl F. H., ed.. 1979. Basic Christian Doctrines. Grand Rapids: Baker Book House.

Herskovits, Melville F. 1955. Cultural Anthropology. New York: Alfred A. Knopf.

Hiebert, Paul. 1985. Anthropological Insights for Missions. Grand Rapids:Baker Book House.

Hiebert, Paul. 1994. Anthropological Reflections on Missiological Issues, Grand Rapids: Baker Book House.

Hodge, Charles. 1952. Systemetic Theology. Grand Rapids: Eerdmans Publishing House.

Hoekema, Anthony. 1979. The Bible and the Future. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Josephus, Flavius. 1982. The Works of Flavius Josephus. trans. William Whiston. Edinburgh: William P. Nimmo and Co..

Kuyper, Abraham, 1956. The Work of the Holy Spirit. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Ladd, George Eldon. 1974. A Theology of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Lewis, C. S. 1952. Mere Christianity. New York: Macmillan Press.

______. 1974. Modern Theology and Biblical Criticism. Grand Rapids; Eerdmans Publishing Co..

Lindstrom, Harold. 1988. Wesley and Sanctification. London: Epworth Press.

Luther, Martin. 1963. The Righteousness of God. London: Hodder and Stoughton

Machen, J. Gresham. 1947. The Christian View of Man. Grand Rapids: Eerdmans Publication Co..

Mueller, Jhon Theodore. 1955. Christian Dogmatics. St. Louis: Concordia.

Ott, Heinrich. 1974. God. Richmond, Jhon Knox Press.

Outer, Albert C., ed.. 1964. Jhon Wesley. New York: Oxford University Press.

Pache, Rene. 1969. The Inspiration and Authority of Scripture. trans. Helen I. Needham. Chicago: Moody Press.

Packer, James Innell. 1967. Evangelism and Sovereignty of God. Chicago: Inter Varsity Press.

Packer, James Innell. 1973. Knowing God. Downers Grove: Inter Varsity Press.

Pelikan, Jaroslav. 1964. Luther and Aquinas on Salvation. New York: Sheed and Ward.

Pinnock, Clark H. 1976. Biblical Revelation. Chicago: Moddy Press.

Pinnock, Clark H., ed.. 1975. Grace Unlimited. Minneapolis: Bethany Fellowship.

Schaeffer, Francis. 1968. The God Who Is Three. Donners Grove: Inter Varsity Press.

Smith, Charles Ryder. 1956. The Bible Doctrine of Man. London: Epworth.

Smith, Hannah whifall. 1952. The Christian's Secrete of a Happy Life. Westwood: Fleming H. Revell.

Stoeffler, F. Ernest, ed.. Continental Pietism and Early American Christian. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Strong, Augustus Hopkins. 1969. Systematic theology. Old Tappan: Fleming H. Revell Co..

Tillich, Paul. ed.. Carl E. Braaten. 1968. A History of Christian Theology. New York: Harper and Row.

Tillich, Paul. 1951. Systematic Theology. Chicago: University of Chicago.

_____. 1958. Courage to Be. New Haven: Yale University Press.

The Heidelberg Catechism with Commentary. 1963. Allen Miller and M. Eugene Osterhaven, eds. Philadelphia: United Church Press.

Thiessen, Henry C. 1979. Lectures in Systematic Theology. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Turnbull, Ralph, eds.. 1959. Devotions of Jonathan Edwards. Grand Rapids: Baker Book House.

Verduin, Leonard. 1970. Somewhat Less than God: The Biblical View of Man. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co..

Wainwright, Arthur W. 1962. The Trinity in the New Testament. London: S.P.C.K.

Walvoord, Jhon F. 1971. Jesus Christ Our Lord. Chicago: Moody Press.

এমি সেন্টার সম্পর্কে কিছু কথা

এমি ইংরেজিতে ANITOCH MISSIONS INTERNATIONAL, সংক্ষেপে AMI নামে পরিচিত একটি খ্রীষ্টিয়ান মিশন সংস্থা। প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত আন্তিয়খিয়া মন্ডলীর (প্রেরিত্ ১৩:১ পদ দ্রষ্টব্য) পদাংক অনুসরণ করে এই নামকরণ করা হয়েছে। এমি মিশন সংস্থা মূলত হারানো আত্মাদের কাছে সুসমাচার দেবার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমি মিশন সংস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, হারানো আত্মাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই এমি কোরিয়া এবং বিশ্বের ২৫ টি দেশে এমি কলেজ ও সেমিনারী, ডাকযোগে বাইবেল স্কুল, এমি ভিশন স্কুল- কোরিয়া এবং এমি ভিশন স্কুল- ইন্টারন্যাশনাল, এমি ভিশন ক্যাম্প- কোরিয়া, এমি ভিশন ক্যাম্প- ইন্টারন্যাশনাল, মিডিয়া মিনিস্ট্রি ও পাবলিকেশন মিনিস্ট্রির মাধ্যমে খ্রীষ্টিয়ান নেতা তৈরী করা।

পাবলিকেশন মিনিস্ট্রির মধ্য দিয়ে ১৫ টি ইশতাত্ত্বিক বই প্রায় ৬০০,০০০ কপি বিশ্বের প্রধান প্রধান আর্ন্তজাতিক ভাষায় অনুবাদ করে বিনা পয়সায় বিতরণ করা হয়েছে। এমি পাবলিকেশন মিনিস্ট্রি মথি ২৪:১৪ পদের আলোকে সারা পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার করতে এবং প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের প্রস্তুতি নিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।